বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলা: বিষয় ও শৈলী

গবেষক

এস এম সাইফুল ইসলাম

রেজিস্ট্রেশন নং: ৮৮

সেশন: ২০১২-২০১৩

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. নাজমা বেগম

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল- ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **"বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলাঃ বিষয় ও শৈলী"** শিরোনামের এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য প্রণীত। আমার জানামতে, পূর্বে এ শিরোনামে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়া হয়নি, অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এর কোনো অংশবিশেষ প্রকাশ করা হয়নি।

এস এম সাইফুল ইসলাম
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং: ৮৮
সেশন: ২০১২-২০১৩
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এস এম সাইফুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসাবে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য আমার তত্ত্বাবধানে **"বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলাঃ বিষয় ও শৈলী"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছেন। গবেষণাটি মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচিত। আমি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছি এবং পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

ড. নাজমা বেগম

অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
অঙ্গীকারপত্র			I
প্রত্যয়নপত্র			II
মুখবন্ধ			IV– VI
আলোকচিত্রের তালিকা			VII– X
মানচিত্র			XII– XV
প্রথম অধ্যায়	:	ভূমিকা	১- ১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং মুঘল চিত্রকলার স্বরূপ	১৩- ৮০
তৃতীয় অধ্যায়	:	বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের পরিচিতি	৮১- ১২১
চতুর্থ অধ্যায়	:	বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ	১২২- ১৯৪
পঞ্চম অধ্যায়	:	মুঘল চিত্রকলার করণকৌশল ও শৈলী বিশ্লেষণ	১৯৫- ২২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	উপসংহার	২২৮- ২৩২
পরিভাষা	:		২৩৩- ২৩৭
পরিশিষ্ট- ১	:	মুঘল বংশলতিকা	২৩৮- ২৩৯
পরিশিষ্ট- ২	:	গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর্ম	২৪০- ২৪৫
পরিশিষ্ট- ৩	:	গুরুত্বপূর্ণ রেখাচিত্র	২৪৬- ২৫১
পরিশিষ্ট- ৪	:	গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র	২৫২
গ্রন্থপঞ্জি	:		২৫৩- ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

উপমহাদেশের ইতিহাসে মুঘল রাজত্বকাল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লঙের বংশধর জহির-উদ-দ্বীন মুহম্মদ বাবুর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল লোদী বংশের শেষ শাসক ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। তারপর থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের রাজত্বকাল পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য নানা মাত্রায় অব্যাহত থাকে। বাবুর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত প্রথম ছয় মুঘল বাদশাহ (The Great Mughals) সত্যিকার অর্থেই ক্ষমতাধর ছিলেন। তারপরের বাদশাহগণের (The Later Mughals) অবস্থান ক্রমাগত শিথিল হতে থাকে। মুঘল শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, তাঁরা পুরো সমাজকে তাদের সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিলেন। তাঁদের শাসন পদ্ধতি ছিল মূলত ভারতীয় কাঠামোতে ফারসি-আরবীয় পদ্ধতির সাবলীল সংমিশ্রণ। স্থানীয় প্রয়োজন বিবেচনা করে তাঁরা তাঁদের শাসনব্যবস্থা রূপান্তরিত করেছিলেন। জীবনদর্শন, খানাদানা, স্থাপত্যকলা, চিত্রকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে মুঘলগণ স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন।

পারসিক শিল্প-শৈলীর অনুসরণে ভারতবর্ষে মুঘলদের যে চিত্ররীতি গড়ে ওঠে তা এই উপমহাদেশে তথা বিশ্ব চিত্রকলার ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র চিত্রশৈলীর জন্ম দেয়। মুঘল চিত্রকলা প্রকৃতঅর্থে মুঘলদের এক অসামান্য অবদান। মুঘল চিত্রকলার সংগৃহীত নিদর্শন নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহ নিয়ে বিশদ কোনো গবেষণা হয়নি। এমনকি এই অমূল্য নিদর্শনসমূহের বেশিরভাগই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। বিশ্বঐতিহ্যের অংশ এবং রাষ্ট্রীয় অমূল্য সম্পদ হিসাবে বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলা নিয়ে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন ছিল। মুঘল চিত্রকলা অনুধাবনের জন্য মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পাঠ আবশ্যক।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি দীর্ঘ চার বছরের নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও অধ্যয়নের ফল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. নাজমা বেগমের সদয় নির্দেশনাধীনে এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। মুঘল চিত্রকর্ম অনুসন্ধানের কাজ এবং সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে তার বিশ্লেষণ পর্যন্ত গবেষণার প্রতিটি স্তরে তিনি আমাকে অসামান্য দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বইপত্র সংগ্রহ করার জন্য তিনি আমাকে সর্বদা

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা করেছেন। তাঁর উৎসাহ, উপদেশ ও অনুপ্রেরণা ব্যতীত এ সুদীর্ঘ এবং জটিল গবেষণা সঠিকভাবে সমাপন করা আমার পক্ষে দুরূহ ছিল। বিনম্র শ্রদ্ধায় এবং কৃতজ্ঞচিত্তে আমি তাঁর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্মরণ করছি।

মুঘল চিত্রকলা বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত দুরূহ। কেননা শুধু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নয়, এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞানের। এ কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান অর্জনের লক্ষে আমাকে যেতে হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাদুঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেসব প্রতিষ্ঠানে আমাকে দীর্ঘদিন আকর মুঘল চিত্রকলা অনুসন্ধান করতে হয়েছে। আর এ দুঃসাধ্য কাজ সম্পাদন করার জন্য আমাকে কয়েকজন সুহৃদ সহায়তা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আলোকচিত্রী জনাব তৌহিদুন নবী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কীপার ড. স্বপন কুমার, ড. মো. শরিফুল ইসলাম, বরেন্দ্র জাদুঘরের মহাপরিচালক ড. সুলতান আহমদ, সরকারি সা'দত কলেজের অধ্যক্ষ মো. রেজাউল করিম, বাংলা বিভাগের শিক্ষক মো. আল-মামুন কোরায়শী ও গ্রন্থাগারিক নাসরিন আকতার এবং মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহফুজুল ইসলামসহ বিভাগের সকল শিক্ষক, বিশেষত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. মো. তৌফিকুল হায়দার, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, মিসেস নুসরাত ফাতেমা, জনাব এ কে এম খাদেমুল হক ও জনাব মো. আবদুর রহিম বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার জন্য যেসকল গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তজার্তিক কেন্দ্রের গ্রন্থাগার। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বাধিক ব্যবহার করেছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার, এম আর তরফদার স্মৃতি জাদুঘরের সংগ্রহশালা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। উক্ত গ্রন্থাগারের কর্মচারীরা আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সকল কর্মচারী বিশেষত জনাব কবির আহমেদ, জনাব ছরোয়ার আহমেদ ও মিসেস সাজেদা সবসময় আমাকে সহযোগিতা দিয়েছেন। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমি গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস) গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভাস গ্রন্থাগার থেকেও সহযোগিতা নিয়েছি। এ ছাড়া অন্তর্জালের (internet) বস্তুনিষ্ঠ সূত্র থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় আলোকচিত্র ব্যবহার করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমাকে সর্বদা অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জনাব মুহাম্মদ মাসুম আলী খান মজলিস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, কবি হুমায়ূন কবির, সরকার নূরুল মোমেন, শারাফত খানের ভূমিকা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এছাড়াও অত্যন্ত প্রিয় তিন অগ্রজ আমাকে উদারচিত্তে সহযোগিতা করেছেন। জনাব আশরাফুল কবির হেলাল, ড. মো. মাসুদ রানা খান ও মিসেস নাজলী চৌধুরীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া সুহৃদ আলো আরজুমান বানু, মাহ্মুদা খানম ও কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. দেবরাজ চক্রবর্তী ও মো. নাসিরুল ইসলামকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার প্রিয় বন্ধু মাহফুজুল হক খন্দকার স্বপন, চিত্রশিল্পী তারিক ফেরদৌস খান ও মাহাবুব রাহমানের কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আরেকজন প্রিয় সুহৃদ আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি আমালিজা লোহানী, তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার প্রিয় অনুজ মো. সোহাগ আলী, এই পুরো অভিসন্দর্ভের বর্ণবিন্যাস থেকে শুরু করে নানাক্ষেত্রে আমাকে উদারচিত্তে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এক্ষেত্রে আবু বক্কর ছিদ্দিককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমার পিতা জনাব এস এম নূরুল আবছার আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন (১০ অক্টোবর ২০১৬)। পিতৃবিয়োগে আমি গভীর শোকে মূহ্যমান হলেও তাঁরই অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমার আম্মা চেমন আরা বেগম শুরু থেকেই প্রতিটি কাজে অতুলনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। এ জীবনের সবটুকুই তাঁদের জন্য।

আরো দু'জন পিতৃ-মাতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব জনাব আবু সাঈদ ফিরোজ ও মিসেস রেবেকা সুলতানা, আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, এ দুজন ব্যক্তিত্বের উদার সমর্থন ও সহযোগিতার কথা আমি সবসময় কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

আরেকজনের নাম উল্লেখ প্রয়োজন, তিনি আমার সহধর্মিণী আনন্দময়ী ফিরোজ প্রমা। প্রকৃতঅর্থে তিনি সহযোদ্ধা হিসেবে আমাকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। এটি ব্যাখ্যাতীত। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ভাষা আমার জানা নেই।

এস এম সাইফুল ইসলাম
পিএইচ. ডি গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্রের তালিকা

আলোকচিত্র ২.১: বাদশাহ বাবুরের প্রতিকৃতি (দারাশিকোর অ্যালব্যাম থেকে)

আলোকচিত্র ২.২: প্রথম ছয় মুঘল বাদশাহ ও শেষ মুঘল বাদশাহের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ২.৩: শাহ্ তাহ্মাস্পের দরবারে হুমায়ূন

আলোকচিত্র ২.৪: শাহজাহান সিংহাসনে উপবিষ্ট

আলোকচিত্র ২.৫: হরিণ শিকাররত নবাব আলিবর্দী খান (মুর্শিদাবাদ শৈলী)

আলোকচিত্র ২.৬: দরবারে উপবিষ্ট নবাব আলিবর্দী খান

আলোকচিত্র ৩.১: লালবাগ দুর্গ জাদুঘর

আলোকচিত্র ৩.২: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

আলোকচিত্র ৩.৩: বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

আলোকচিত্র ৩.৪: সরকারি সা'দত কলেজ

আলোকচিত্র ৩.৫: মাদ্রাসা-ই-আলিয়া

আলোকচিত্র ৪.১: সিংহাসনে বসা সম্রাট আওরঙ্গজেব

আলোকচিত্র ৪.২: আসফ জাহ বাহাদুরের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৩: শাহজাদা আজম শাহের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৪: দূরদানার প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৫: সিংহাসনে বসা জনৈক রাজার প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৬: মধুমতি অঙ্কিত একটি চিত্র

আলোকচিত্র ৪.৭: বন্যজন্তু

আলোকচিত্র ৪.৮: উটের নাচ

আলোকচিত্র ৪.৯: যুবরাজ ও রাজ-তনয়ার অশ্ব-চালনা

আলোকচিত্র ৪.১০: অমাত্যদের আঘাতে রক্তাক্ত দুটি মানুষকে অবলোকন

আলোকচিত্র ৪.১১: বৃক্ষছায়ায় চিন্তামগ্ন খাজা হাফিজ সিরাজ

আলোকচিত্র ৪.১২: বাহার-ই-দানিশ (চিত্রিত মুঘল পাণ্ডুলিপি)

আলোকচিত্র ৪.১৩: একজন দরবেশের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.১৪: হেরেমের দৃশ্য

আলোকচিত্র ৪.১৫: মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্-এর প্রতিকৃতি (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)

আলোকচিত্র ৪.১৬: দরবার দৃশ্য

আলোকচিত্র ৪.১৭: একজন সভাসদ-এর প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.১৮: পরিচারকসহ একজন অভিজাত ব্যক্তি

আলোকচিত্র ৪.১৯: পাণ্ডুলিপি- *শাহনামা*

আলোকচিত্র ৪.২০: পাণ্ডুলিপি-*শাহনামা*

আলোকচিত্র ৪.২১: চিত্রিত শাহনামা-১

আলোকচিত্র ৪.২২: চিত্রিত শাহনামা- ২

আলোকচিত্র ৪.২৩: চিত্রিত শাহনামা-৩

আলোকচিত্র ৪.২৪: চিত্রিত শাহনামা- ৪

আলোকচিত্র ৪.২৫: চিত্রিত শাহনামা- ৫

আলোকচিত্র ৪.২৬: চিত্রিত শাহনামা- ৬

আলোকচিত্র ৪.২৭: চিত্রিত শাহনামা- ৭

আলোকচিত্র ৪.২৮: চিত্রিত শাহনামা- ৮

আলোকচিত্র ৪.২৯: ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম গাজী-উদ-দ্বীন হায়দারের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৩০: ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নুসরত জঙ্গ বাহাদুরের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৩১: তৈমুরের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৩২: মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৩৩: একজন শ্মশ্রুধারী অভিজাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৩৪: হারেম দৃশ্য (সংগৃহীত নম্বর: ২১৯২)

আলোকচিত্র ৪.৩৫: হারেম দৃশ্য (সংগৃহীত নম্বর: ২১৯৬)

আলোকচিত্র ৪.৩৬: ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম হাসমত জঙ্গের প্রতিকৃতি (১৭৭৮-১৭৮৫ খ্রি.)

আলোকচিত্র ৪.৩৭: ঢাকার নওয়াব-ই-নাজিম নুসরত জঙ্গের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৩৮: একজন শাহজাদার প্রতিকৃতি (অজ্ঞাত)

আলোকচিত্র ৪.৩৯: ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম কমর-উদ-দৌলাহর প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৪০: নাদির শাহের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৪১: ঢাকার জলরং- ১

আলোকচিত্র ৪.৪২: ঢাকার জলরং- ২

আলোকচিত্র ৪.৪৩: ঢাকার জলরং- ৩

আলোকচিত্র ৪.৪৪: ঢাকার জলরং- ৪

আলোকচিত্র ৪.৪৫: ঢাকার জলরং- ৫

আলোকচিত্র ৪.৪৬: ঢাকার জলরং- ৬

আলোকচিত্র ৪.৪৭: মুঘল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের আবক্ষ প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৪৮: ইতিমাদ উদ-দৌলার প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৪৯: বাদশাহ শাহজাহানের (দ্বিতীয়) প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৫০: একজন অজ্ঞাত মুঘল অমাত্যের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৫১: *শাহনামা চিত্র-১*

আলোকচিত্র ৪.৫২: *শাহনামা চিত্র-২*

আলোকচিত্র ৪.৫৩: *শাহনামা চিত্র-৩*

আলোকচিত্র ৪.৫৪: *শাহনামা* (চিত্রিত পান্ডুলিপি)- ১

আলোকচিত্র ৪.৫৫: *শাহনামা* (চিত্রিত পান্ডুলিপি)- ২

আলোকচিত্র ৪.৫৬: *শাহনামা* (চিত্রিত পান্ডুলিপি)- ৩

আলোকচিত্র ৪.৫৭: *শাহনামা* (চিত্রিত পান্ডুলিপি)- ৪

আলোকচিত্র ৪.৫৮: *শাহনামা* (চিত্রিত পান্ডুলিপি)- ৫

আলোকচিত্র ৪.৫৯: বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতি

আলোকচিত্র ৪.৬০: বাদশাহ ফখরুখ সিয়র (অশ্বারোহী)

আলোকচিত্র ৪.৬১: *শাহনামা* পাণ্ডুলিপি চিত্র- ১ (মুদ্রিত)

আলোকচিত্র ৪.৬২: *শাহনামা* পাণ্ডুলিপি চিত্র- ২ (মুদ্রিত)

আলোকচিত্র ৪.৬৩: *শাহনামা* পাণ্ডুলিপি চিত্র- ৩ (মুদ্রিত)

আলোকচিত্র ৪.৬৪: *শাহনামা* পাণ্ডুলিপি চিত্র- ৪ (মুদ্রিত)

আলোকচিত্র ৫.১: মুঘল চিত্রকলায় ব্যবহৃত কাগজ

আলোকচিত্র ৫.২: সাদা রং (White Pigments)

আলোকচিত্র ৫.৩: ভুসাকালি বা কালো রং (Lamp Black)

আলোকচিত্র ৫.৪: লাল রং (Red pigments)

আলোকচিত্র ৫.৫: লাপিস লাজুলি (*Lapis Lazuli*) পাথর

আলোকচিত্র ৫.৬: লাপিস লাজুলি থেকে উৎপন্ন নীল (Blue Pigments)

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ৫.৭: তাজমহলে লাপিস লাজুলি পাথরের Pietra-dura নকশা

আলোকচিত্র ৫.৮: হলুদ রং (Yellow Pigments)

আলোকচিত্র ৫.৯: গিরিমাটি থেকে তৈরিকৃত বাদামী হলুদ (Yellow Ochre)

আলোকচিত্র ৫.১০: ম্যালাকাইট পাথর

আলোকচিত্র ৫.১১: সবুজ রং (Green Pigments)

আলোকচিত্র ৫.১২: স্বর্ণচূর্ণের রং (Gold powder)

আলোকচিত্র ৫.১৩: রৌপ্যচূর্ণের রং (Silver powder)

আলোকচিত্র ৫.১৪: রৌপ্যচূর্ণের তবক

আলোকচিত্র ৫.১৫: বাবলা গাছের গঁদ বা আঠা (Gum arabic)

আলোকচিত্র ৫.১৬: মুঘল চিত্রকরদের কর্মপদ্ধতি

আলোকচিত্র ৫.১৭: *শাহনামা'য়* ব্যবহৃত লিপিকলা

আলোকচিত্র ৫.১৮: জাহাঙ্গীর পিতা আকবরের প্রতিকৃতি ধরে আছেন (শিল্পী আবুল হাসান অঙ্কিত)

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র

মুঘল সাম্রাজ্য ১৫২৬-১৭০৭

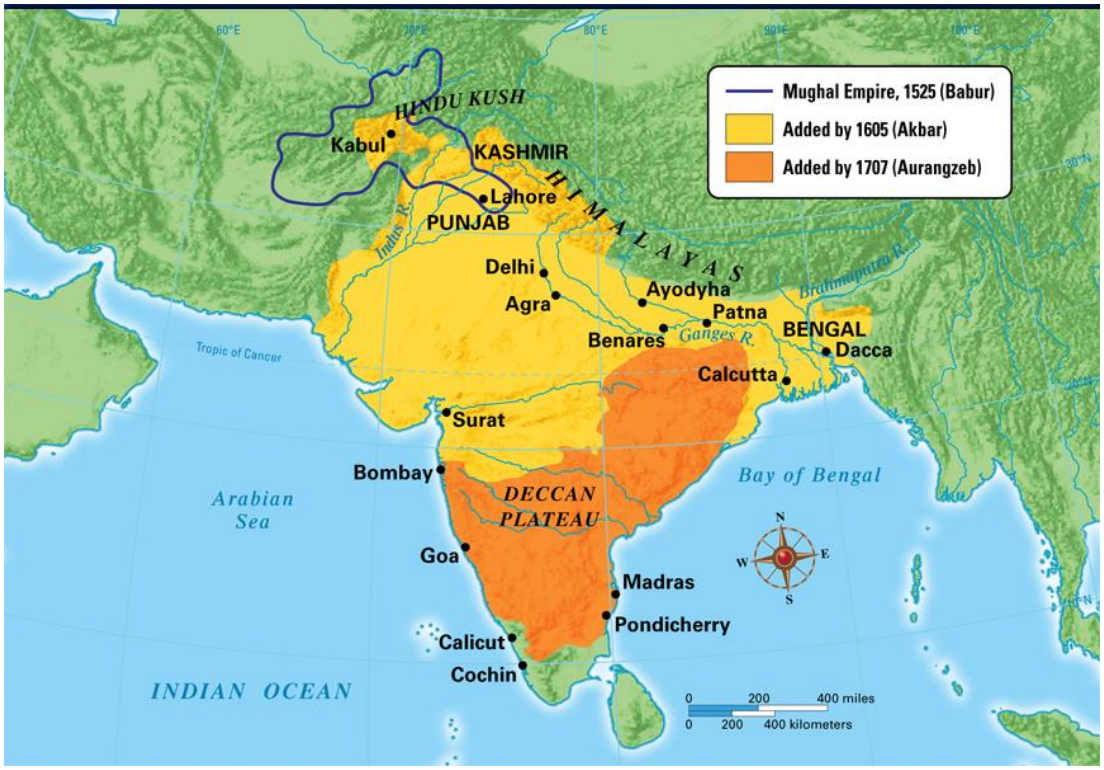

সূত্রঃ www.mughalempire.com

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মুঘল শাসনামল

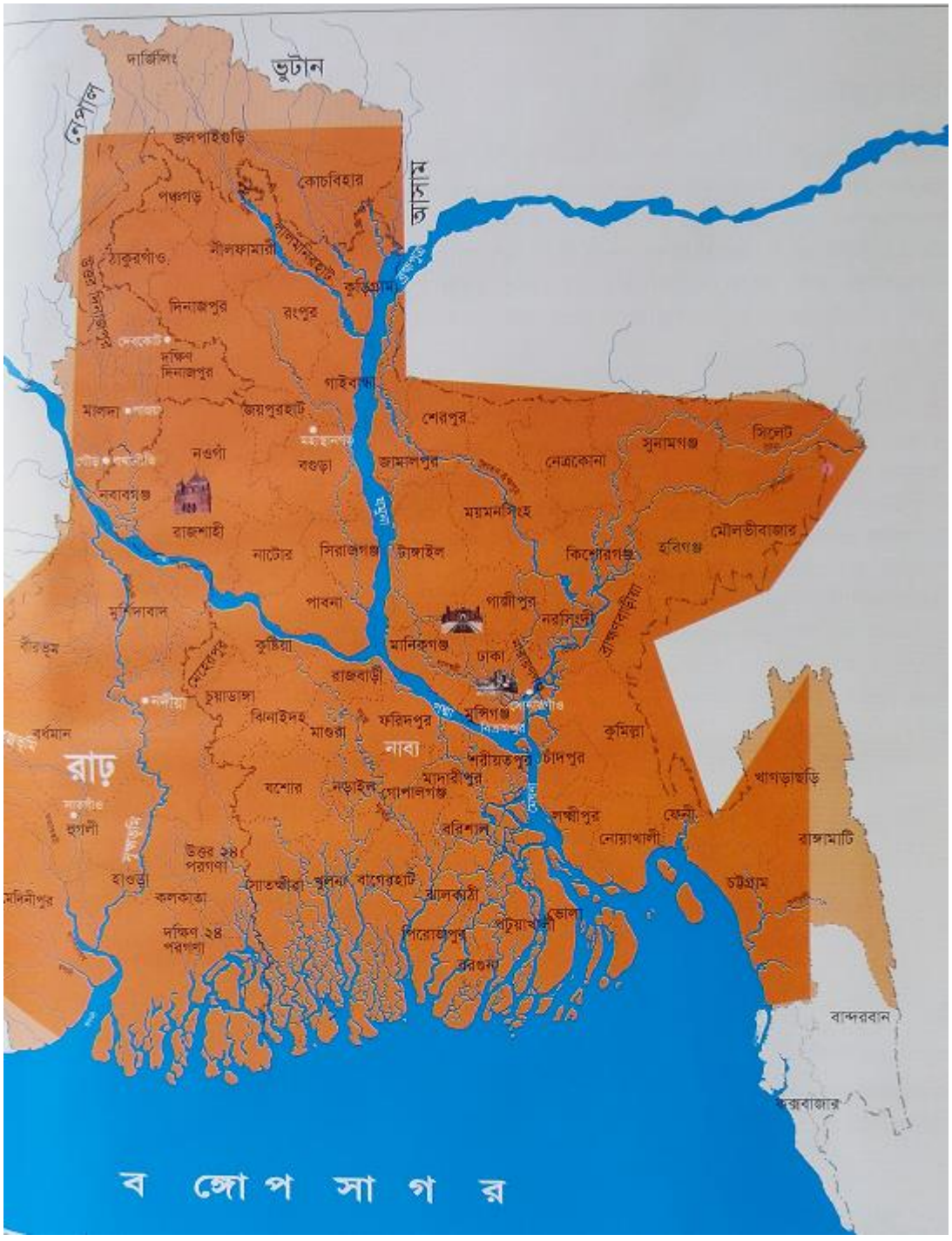

সূত্র: এ কে এম শাহনাওয়াজ, মাসউদ ইমরান, *মানচিত্রে বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

নবাবী আমলে বাংলা

সূত্র: এ কে এম শাহনাওয়াজ, মাসউদ ইমরান, *মানচিত্রে বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-মুঘল ও মুঘল আমলের ঢাকার মানচিত্র

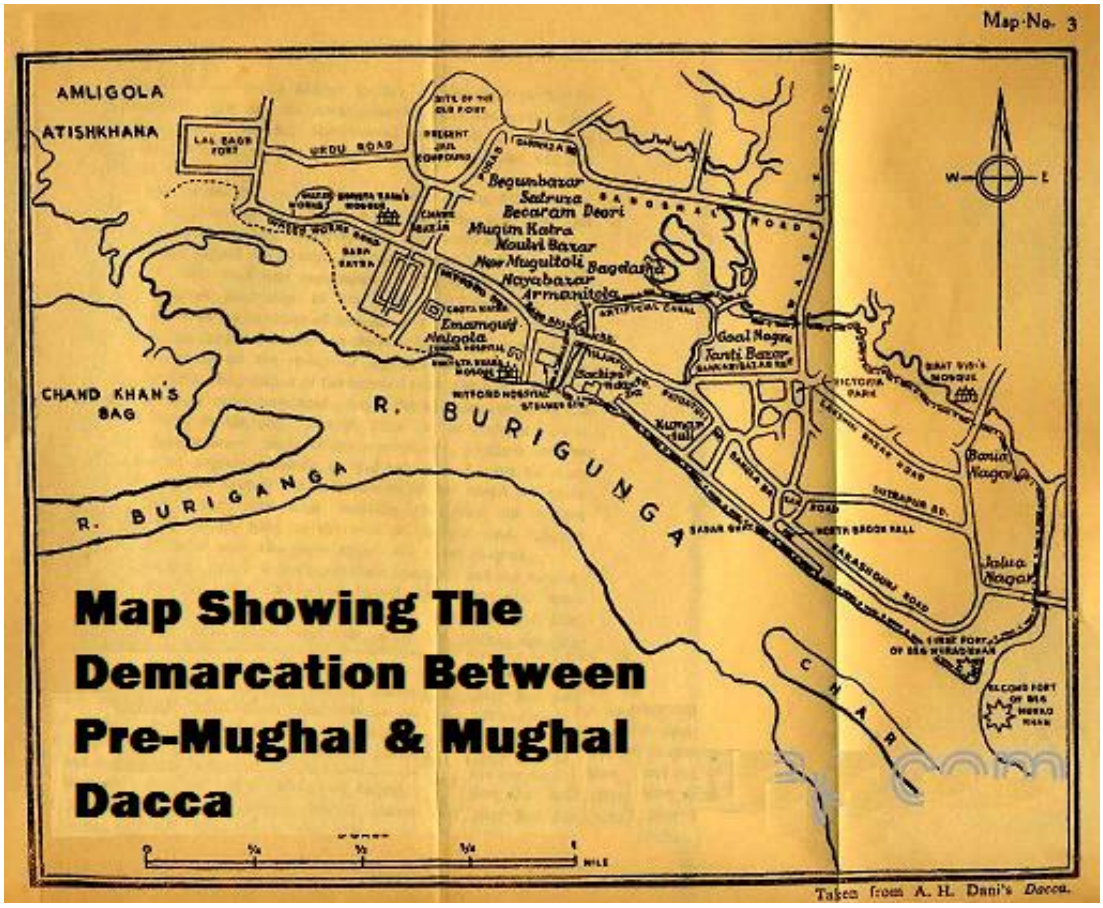

সূত্রঃ A. H. Dani, *Dacca: A Record of its Changing Fortunes,* Dhaka Asiatic Press, 1962

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মানচিত্র

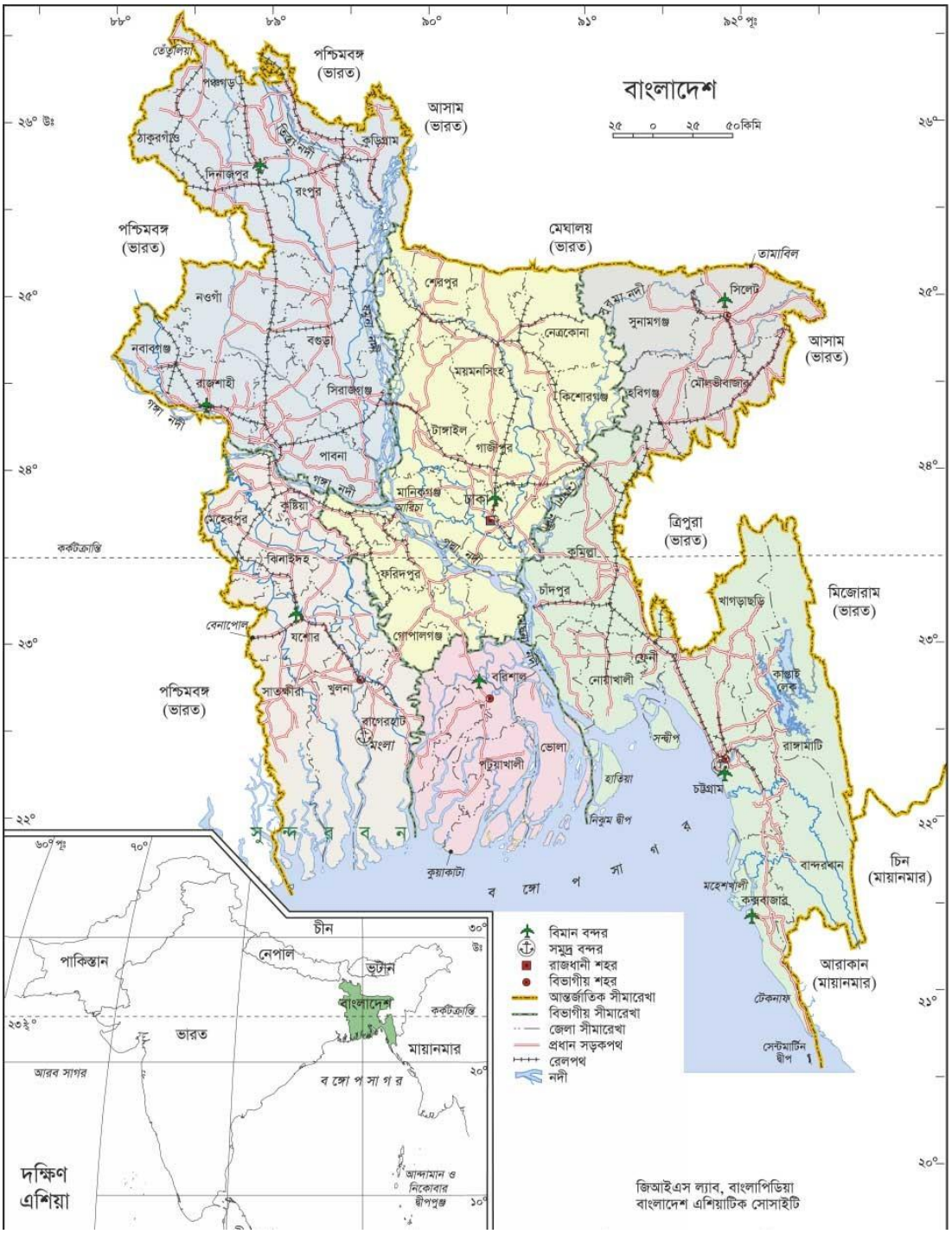

সূত্র: *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। মুঘল শাসনামলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষসাধন হয়েছিল। প্রকৃতঅর্থে, ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণিল ও মনোমুগ্ধকর। এই সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় মুসলমানদের হাতে। 'মুঘল' শব্দটির উৎপত্তি মূলত পারসিক শব্দ 'মঙ্গোল' থেকে।[১] ফারগানার অধিপতি জহির উদ-দ্বীন মুহম্মদ বাবুর (শাসনকাল: ১৫২৬-১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য ও মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বাবুর তাঁর পিতা মির্জা উমর শেখের দিক দিয়ে ছিলেন তৈমুর লঙের (জীবনকাল: ১৩৩৬-১৪০৫ খ্রিষ্টাব্দ) পঞ্চম বংশধর এবং মাতা কুতলুফ নিগার খানমের দিক দিয়ে চেঙ্গিস খানের (জীবনকাল: ১১৬২-১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ) পঞ্চদশতম বংশধর।[২] অর্থাৎ বাদশাহ বাবুর পৈত্রিক দিক থেকে চেঙ্গিস খানের সরাসরি বংশধর ছিলেন না। এ জন্যই তাঁরা নিজেদের 'মুঘল' বা 'মঙ্গোল' কিংবা 'খান' হিসাবে অভিহিত করতেন না। বাবুর নিজেকে তুর্কি বলতেন, মুঘল নয়। এই বিষয়ে তাঁর আত্মজীবনী *বাবুরনামা*[৩] থেকে স্পষ্ট জানা যায়।

মোঙ্গলরা তাতার নামে পরিচিত ছিল। চেঙ্গিস খান নিজে 'মোঙ্গল' বা 'বিজয়ী' নামধারণ করেছিলেন। পারস্যে মোঙ্গলদের 'মুঘল' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেই সূত্র ধরে বস্তুত ইউরোপীয়রা তাঁদের 'মুঘল' (Mughal) হিসাবে চিত্রিত করেছেন। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের মানুষ আফগান ব্যতীত সকল আক্রমণকারীকে 'মোঙ্গল' হিসাবে গণ্য করতো। মুঘলরা নিজেদের 'আলোকের সন্তান' অর্থাৎ চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লঙের বংশধর হিসাবে গর্ববোধ করতেন। অবশ্য প্রধানত তৈমুরের প্রতি মুঘল বাদশাহগণ বিশেষ ভক্তি অনুভব করতেন। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে বাবুরকে সম্বোধন করা হতো মির্জা বাবুর বলে। তখন তাঁর গোত্রের সবাইকে মির্জা বলা হতো। হুমায়ূনের জন্মের বছর (১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দ) বাবুর তাঁকে 'পাদশাহ' (রাজাধিরাজ) হিসাবে অভিহিত করার নির্দেশ দেন।[৪]

---

[১] Annemarie Schimmel, *The Empire of the Great Mughals* (trans.by Corinne Attwood), London: Reaktion Books, 2004, p. 15

[২] Stuart Cary Welch, *Imperial Mughal Painting*, London: Chatto & Windus, 1978, p. 11

[৩] Zahiruddin Muhammad Babur, *Babur-Nama*, (Eng tr. by Annette Susannah Beveridge), New Delhi: Penguin Books, 2014, p.8

[৪] হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, ঢাকা: অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১০, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

১.২

বাবুর ফারগানা থেকে নিকটবর্তী উজবেকদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ভাগ্যন্বেষণের জন্য আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে। লোদী বংশের শেষ শাসক দিল্লির সুলতান ইব্রাহীম লোদীকে পাঞ্জাবের পানিপথ নামক স্থানে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করে বাবুর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক কালজয়ী অধ্যায়ের সূচনা করেন।[১] ইব্রাহীম লোদী প্রায় এক লক্ষ সৈন্য এবং ১৫০০ হাতিসহ বাবুরের দিকে অগ্রসর হন। তখন বাবুরের সৈন্যসংখ্যা লোদীর অর্ধেকেরও কম ছিল। যা সর্বসাকুল্যে প্রায় ২৫,০০০ এর মতো। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিলে সংঘটিত এই যুদ্ধটি পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে খ্যাত এবং বাবুর ও লোদীর মধ্যে প্রধান সংঘাত। যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদী নিহত হন এবং তাঁর বাহিনীকে পরাজিত করে বিতাড়িত করা হয়। বাবুর দ্রুত দিল্লি এবং আগ্রা উভয়ের দখল নেন।

ঐ দিনই বাবুর শাহজাদা হুমায়ূনকে আগ্রা যাওয়ার আদেশ দেন এবং জাতীয় ধন-সম্পদ লুটপাটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। হুমায়ূন সেখানে পৌঁছে গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিতের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাজা বিক্রমজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রত্যাশায় হুমায়ূনকে একটি বৃহদাকার হীরা উপহার দেন। এই হীরাটিকে বলা হতো 'কোহিনূর'। বাংলায় এর অর্থ 'আলোর পর্বত'।

বাবুর বিজয়ের তৃতীয় দিন দিল্লি পৌঁছেন। তিনি তাঁর উপস্থিতি উদ্‌যাপিত করেন যমুনা নদীর তীরে। সেখানে শুক্রবার পর্যন্ত উৎসব স্থায়ী করা হয়। মসজিদে মুসলমানগণ শোকরানা নামায আদায় করেন এবং বাবুরের নামে খুতবা শোনেন। তারপর বাবুর তাঁর পুত্র হুমায়ূনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগ্রার পথে অগ্রসর হন। বাবুরকে সেখানে 'কোহিনূর' রত্নটি প্রদানের মাধ্যমে অভিবাদন জানানো হয়। বাবুর পরে তা আবার হুমায়ূনকে ফিরিয়ে দেন। একজন বিশিষ্ট রত্ন বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, এই কোহিনূরের মূল্য দিয়ে দুনিয়ার সকল মানুষকে আড়াইদিন খানা-দানা খাওয়ানো সম্ভব। এর পরবর্তী দু'শো বছর কোহিনূরটি 'বাবুর হীরা' নামে পরিচিত ছিল।[২]

পানিপথের যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে বাবুর দিল্লির শাসক হন। কিন্তু তখনো ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকা ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ভারতবর্ষের বাদশাহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে তাঁকে আরও অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে চিতোরের রানা সংঘের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত রাজপুত

---

[১] এ বি এম হোসেন, *ইসলামী চিত্রকলা*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৪, পৃ. ১৭৫

[২] Valerie Berinstain, *Mughal India: Splendours of the Peacock Throne*, London: Thames and Hudson Ltd., 2009, p. 24-26

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনীকে পরাজিত করার পরই তিনি ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত বাদশাহ হিসাবে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হন।

১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য নানা মাত্রায় অব্যাহত থাকে। বাবুর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত প্রথম ছয় মুঘল শাসক প্রকৃতঅর্থেই বাদশাহ ছিলেন। তার পরবর্তী বাদশাহগণের অবস্থান বিবিধ কারণে শিথিল হতে থাকে।[১] মধ্যযুগের বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিতে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল অন্যতম বৃহত্তম কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র সমন্বয়। সতের শতকের শেষপর্বে লক্ষ করা যায়, ভারতবর্ষে মুঘল বাদশাহগণের নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা ছিল ১০০ থেকে ১৫০ মিলিয়ন।[২]

সেই সময়ের মুসলিম বিশ্বের দুই প্রতাপশালী সাম্রাজ্য- পারস্যের সাফাভী সাম্রাজ্য এবং অটোমান (উসমানীয়) তুর্কি সাম্রাজ্য। এই দুই সাম্রাজ্যের চেয়েও আকার ও সম্পদের দিক থেকে ভারতবর্ষে মুঘলদের সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধি ছিল বেশি।[৩] মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ জহির-উদ-দ্বীন-মুহম্মদ বাবুর থেকে শুরু করে শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর (শাসনকাল: ১৮৩৭-১৮৫৭) পর্যন্ত প্রতিটি বাদশাহের আমলেই রয়েছে বিপুল বিস্ময় ও চমকপ্রদ ইতিহাস। অধিকাংশ মুঘল বাদশাহ নিজেকে 'আল্লাহর ছায়া' বা 'আল্লাহর প্রতিনিধি' ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করলেও ধর্মীয় নেতৃত্ব দাবি করতেন না। তাঁরা সিংহাসনের ওপর কোনো ঐশ্বরিক প্রভাবের কথাও জানাননি। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে মুঘলদের অবস্থানটি ছিল ভিন্ন ধরনের। পারস্য, মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি সাম্রাজ্যে প্রজাগণ অধিকাংশ ছিল মুসলমান। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজা ছিল অমুসলিম। মুঘল শাসকগণ অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম ধর্মে উজ্জীবিত করার জন্য কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি। বরং ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করেছেন।[৪]

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ।[৫] মুঘল শাসনের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা পুরো সমাজকে তাঁদের সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিলেন। তাঁদের শাসনপদ্ধতি ছিল মূলত ভারতীয় কাঠামোতে

---

[১] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

[২] এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ: মোগলপর্ব)*, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০২, পৃ. ১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[৪] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৫] এস. এ. কিউ হুসাইনি, *অ্যাডমিনিস্ট্রেশন: আন্ডার দি মোগল্স*, ঢাকা-১২৫২, পৃ. ২-৩

ফারসি-আরবীয় পদ্ধতির সাবলীল সংমিশ্রণ। স্থানীয় সমাজ জীবনের প্রেক্ষিতে তাঁদের শাসনব্যবস্থায় এই সংমিশ্রণের প্রয়োজন ছিল।[১]

১.৩

মুঘলদের ঐশ্বর্য ও ঔজ্জ্বল্য ছিল প্রবাদতুল্য। তাঁদের জীবনদর্শন, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, খানা-দানা, ভাষা, আনন্দ-উৎসবের প্রাচুর্য, সঙ্গীত, কাব্য, স্থাপত্যকলা, চিত্রকলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুপম উজ্জ্বল বিকাশ সেই যুগের অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও উঁচুদরের সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে। ফলে মুঘল সংস্কৃতি এই সাম্রাজ্য পতনের অনেককাল পরেও সময়, পরিপার্শ্ব ও মানুষের জীবনাচরণকে প্রভাবিত করেছে।[২]

মুঘল শাসনামলে স্থিতিশীলতা ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিতে নতুন গতিসঞ্চার করে। স্থাপত্য ও উদ্যানশিল্পে অসামান্য অগ্রগতি হয়। উদাহরণ হিসাবে তাজমহল ও লালকেল্লা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে আগ্রার তাজমহল ও দিল্লির লালকেল্লা অতুলনীয়।

শালিমারবাগ এখনও সগৌরবে মুঘলদের কথা বলছে। উর্দু ভাষাও মুঘলদের একটি অবদান। ফারসি, আরবি, তুর্কি ও স্থানীয় অন্যান্য ভাষার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে উর্দু ভাষা। হিন্দির আত্মপ্রকাশ ঘটে একই সূত্রে। তবে হিন্দিতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য লক্ষণীয়।[৩]

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য তার পূর্ণ শক্তি ও প্রভা নিয়ে প্রায় দেড় শতাব্দীকাল (১৫৫৬-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। এই সময়ের মুঘল বাদশাহগণ তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা একটি গতিশীল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশ বা সুবাহসমূহের ওপর বাদশাহদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ও জনশক্তির কোনো অভাববোধ করেননি বাদশাহগণ। সকল আনুকূল্য গ্রহণ করে বাদশাহ্গণ যোগ্যতা ও হিম্মতের সঙ্গে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। ফলে এই যুগে ব্যাপক সামরিক বিজয় সাধিত হয়েছে। বিস্তৃত হয়েছে সাম্রাজ্যের সীমানা। প্রদেশগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম হয়েছে।[৪]

---

[১] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[২] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[৩] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৪] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

বাদশাহ বাবুর মাত্র চার বছর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ) ক্ষমতাসীন ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব, আধুনিক যুক্তপ্রদেশ, উত্তর বিহার এবং প্রধান রাজপুত রাষ্ট্র মেবার করায়ত্ত করেন। কিন্তু বিজয় অর্জন ব্যতীত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সম্পন্ন করতে পারেননি। কারণ বিজিত দেশগুলোকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১] প্রথম পর্যায়ে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় বাবুর এবং হুমায়ূনের নেতৃত্বে। অর্থাৎ ১৫২৬ থেকে ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।[২] বাবুর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র হুমায়ূনকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পিতার মৃত্যুর পর হুমায়ূন ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ভারতের অধিকর্তা হয়ে বাবুর সময় স্বল্পতার কারণে মুত্যুর পূর্বে সাম্রাজ্যকে স্থিতিশীল করে যেতে পারেননি। ফলে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার সুবিশাল দায়িত্ব প্রকৃতঅর্থে হুমায়ূনের ওপর অর্পিত হয়েছিল। এই দায়িত্ব হুমায়ূন সুচারূরূপে সম্পন্ন করতে পারেননি।[৩] কারণ সিংহাসনে আরোহণের সময় রাজত্বের অবস্থা ছিল দুর্যোগপূর্ণ।[৪] রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, ষড়যন্ত্র ও ভাইদের নিরন্তর অসহযোগিতার ফলে হুমায়ূন ক্ষমতায় ঠিকমতো অধিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সাম্রাজ্যচ্যুত হন (১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ)।[৫] 'হুমায়ূন' নামের অর্থ হচ্ছে 'ভাগ্যবান'। কিন্তু অমোঘ নিয়তির কারণে এই অর্থ হুমায়ূনের জীবনে বাস্তবায়িত হয়নি। ইতিহাসে তিনি দুর্ভাগা বাদশাহ হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করলেও হুমায়ূনের জন্য সিংহাসন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না।[৬] হুমায়ূনের জীবনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ লক্ষ করা যায়।[৭] যথা-

(ক)১৫৩০-১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ধাপে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁকে অবিরাম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়।

(খ) ১৫৪০-১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দের পাঁচ বছর যাবৎ তাঁর জীবনে আসে চরম দুর্দশা। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে আফগান নেতা শেরশাহ সূর-এর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ূন রাজ্যহারা হন।

---

[১] মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ১৪৭

[২] ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগের ভারত: একটি সভ্যতার পাঠ* (বাংলা অনুবাদ: শৌভিক মুখোপাধ্যায়), নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ১০১

[৩] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[৪] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[৫] হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৬] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

রাজ্যহারা হয়ে এ সময় তিনি নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। দ্বিতীয় ধাপের এই সময়কালে তিনি সিন্ধু, রাজস্থান ও পারস্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন সাহায্যের প্রত্যাশায়।

(গ) ১৫৪৫-১৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দের তৃতীয় ধাপে হুমায়ূন কান্দাহার ও কাবুলকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় মনোযোগী হন।

(ঘ) ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী এই শেষ ধাপে তিনি সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

১.৪

মুঘল সাম্রাজ্যের 'The Great Mughals' হিসাবে খ্যাত প্রথম ছয়জন বাদশাহের শাসনকাল ছিল নিম্নরূপ।[১] যথা:

জহির-উদ-দ্বীন মুহম্মদ বাবুর (১৫২৬- ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ)
নাসির-উদ-দ্বীন মুহম্মদ হুমায়ূন (১৫৩০- ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং (১৫৫৫- ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)
জালাল-উদ-দ্বীন মুহম্মদ আকবর (১৫৫৬- ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ)
নূর-উদ-দ্বীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫- ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
শাহাব-উদ-দ্বীন মুহম্মদ শাহজাহান (১৬২৮- ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)
মুহি-উদ-দ্বীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ)

বস্তুত উল্লিখিত প্রথম ছয়জন মহান মুঘল বাদশাহের (The Great Mughals) শাসনামলে সাম্রাজ্য পূর্ণ প্রভা ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে সক্রিয় ছিল। মুঘল আমলের চিত্রশিল্পের ইতিহাস সেই আমলের স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ যতদিন সাম্রাজ্য সমৃদ্ধিশালী ছিল, ততদিন চিত্রশিল্পও সমৃদ্ধিশালী হয়। সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পও অস্তিত্ব হারাতে থাকে।[২]

মুঘল সাম্রাজ্য ও মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জহির-উদ-দ্বীন মুহম্মদ বাবুর একাধারে কবি, যোদ্ধা, দার্শনিক এবং আত্মচরিত রচয়িতা হলেও মুঘল চিত্রশিল্পের উন্মেষে কোনো প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে পারেননি। কিন্তু তাঁর উদার মনোবৃত্তি, মার্জিত রুচি এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রভাবান্বিত করেছে।[৩] বাবুর পারসিক শিল্পী বিহ্যাদের অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজের রোজনামচায় লিখেছেন 'বিহ্যাদ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়'।[৪]

---

[১] Stuart Cary Welch, *Ibid*, p. 11-29

[২] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

[৩] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩, পৃ. ২৯১-২৯২

[৪] অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০ (পঞ্চম মুদ্রণ), পৃ.১০৯

উল্লেখ্য কামাল-উদ-দ্বীন বিহযাদ পারস্যের কিংবদন্তি শিল্পী। ধারণা করা হয়, বিহযাদ সম্ভবত ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই ক্ষণজন্মা ও অনন্য প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাবে পারস্যের চিত্রশিল্প এই সময় অভাবনীয় সমৃদ্ধি লাভ করে। চিত্রাঙ্কনে রঙের স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা এবং অসাধারণ দক্ষতা ও সূক্ষ্মতা প্রতিভাত হয়। তাঁর শিল্পকৌশল ও শৈলীতে যুগপৎ কমনীয়তা ও বলিষ্ঠতা ছিলো। বিহযাদের স্বকীয় চিত্রভাষায় পারসিক চিত্রকলা সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছিল।[১]

শিল্পের প্রতি বাবুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাবুরের পুত্র দ্বিতীয় মুঘল বাদশাহ হুমায়ূনের চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণের কারণ অনুমান করা যায়। পিতৃসূত্রেই সম্ভবত তিনি এই জ্ঞান এবং আকর্ষণের অধিকারী হয়েছিলেন। জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়- বাবুর যেমন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, হুমায়ূন তেমনই মুঘল চিত্রকলার সংস্থাপক।[২] মুঘল চিত্রকলাকে সাধারণত বলা হয় মিনিয়েচর বা অণুচিত্র (Mughal Miniature)। এছাড়া ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রও বলা হয়ে থাকে। এর কারণ মুঘল চিত্রগুলো মূলত পুঁথিচিত্রণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৩] মুঘল চিত্রকলার জন্ম রাজ দরবারে। এই বিশেষ শৈলীর অন্তর্গত প্রতিটি ছবিই নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের নিদর্শন। কারণ প্রতিটি ছবির রচনার বা উৎপাদনের একদিকে ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি রং-তুলি ও কাগজের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। যাঁদের বলা হয় পৃষ্ঠপোষক (Patron)। অন্যদিকে ছিলেন শিল্পী। তিনি তাঁর শ্রম বিনিয়োগ করে সৃষ্টি করেছেন মূল্যবান ছবি।

মুঘল প্রাসাদের যে নির্দিষ্ট স্থানে শিল্পীদের কাজের জায়গা করে দেওয়া হতো, তাকে বলা হতো ‘সুরৎখানা’। এর অর্থ কারখানা বা চিত্রশালা। রাজোচিত জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু যেমন- পোশাক, রত্ন, অলংকার ও অস্ত্রের মতো ছবিও একই উপায়ে প্রস্তুত হতো বাদশাহের নিজস্ব কারখানায়। ফলে অন্যান্য উৎপন্ন বস্তুর মতো স্বাভাবিকভাবে ছবিতেও প্রতিফলিত হতো পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পীর যুগ্ম চাহিদা। এই ছবিগুলো তাই ‘দরবারি মুঘল চিত্র’ বলে পরিচিত।[৪]

১.৫

মুঘল চিত্রকলা উন্মেষের একটি প্রধান কারণ শনাক্ত করা যায়। তা হলো- পারস্যের সাফাভী সুলতান শাহ্ তাহ্মাস্পের (১৫২৪-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) সান্নিধ্যে এসে হুমায়ূন চিত্রকলার প্রতি সবিশেষ আকর্ষণ

---

[১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

[২] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[৩] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরূপ: মুঘল চিত্রকলা*, কলকাতা: থীমা, ১৯৯৯, পৃ. ৯

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

বোধ করেন। উল্লেখ্য, শাহ্ তাহ্মাস্প ছিলেন পারসিক চিত্রকলার একজন উল্লেখ্যযোগ্য পৃষ্ঠপোষক। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আফগান নেতা শেরশাহ্ সূর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে হুমায়ূন শাহ তাহ্মাস্পের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি শিল্পানুরাগী শাহ্ তাহ্মাস্প এবং তাঁর দরবারের চিত্রশিল্পীদের নৈকট্য লাভ করেন। অনুমান করা যায়, কর্মবিহীন একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন অতিথি এই সান্নিধ্যের সুযোগ যথাযথ গ্রহণ করেছিলেন। শাহের দরবারে প্রথিতযশা চিত্রকর মীর মুসাব্বির এবং তাঁর পুত্র মীর সৈয়দ আলী হুমায়ূনের প্রিয় শিল্পী ছিলেন। ১৫৪৫ সালে হুমায়ূন শাহের সহায়তায় কাবুলে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। একই বছরে হুমায়ূন মীর মুসাব্বিরকে কাবুলে আসার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি আসেননি। তবে সেই বছর হুমায়ূন চিত্রকলায় স্বাধীনভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। যা ছিল একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে। উক্ত বছরে শাহ্ তাহ্মাস্প তাঁর মানসিক চিন্তাধারা পরিবর্তনের ফলে চিত্রকলায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। আর তারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন ভবিষ্যত মুঘল বাদশাহ হুমায়ূন। শাহ্ তাহ্মাস্প চিত্রকলায় উৎসাহ হারানোর ফলে তাঁর চিত্রশিল্পীদের মাঝে নৈরাশ্য ও বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।[১] এর ফলশ্রুতিতে শিল্পীদের মাঝে এক অভিবাসন স্পৃহা জেগে উঠে। এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনেক শিল্পী উসমানীয় দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেউ চলে যান প্রাদেশিক শহর মাশহাদে। কেউ সদ্য প্রতিষ্ঠিত উজবেক রাজধানী বোখারায়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, কেউ এসেছিলেন হুমায়ূনের দরবার কাবুলে। শাহ তাহ্মাস্পের রাজধানী তাব্রিজ থেকে কাবুলে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মীর মুসাব্বিরের পুত্র মীর সৈয়দ আলী অন্যতম (পদবী সংযোগে মীর সৈয়দ আলী তাব্রিজী)। 'তাব্রিজী' পদবীটা মর্যাদা বাড়ানোর যে উৎকৃষ্টতম একটি পন্থা ছিল তা অনুমেয়।[২] তাঁর সাথে যোগ দেন শিরাজ থেকে আগত অন্য এক খ্যাতিমান শিল্পী খাজা আবদুস সামাদ। তাঁর যোগদানের সম্ভাব্য সময়কাল ১৫৪৯-১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ ধরা হয়।

তিনি মুঘল চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচিত।[৩] পদবী সহযোগে খাজা আব্দুস সামাদ শিরাজী। তাব্রিজ এবং শিরাজ ঘরানার এই দুই চিত্রশিল্পী মুঘল চিত্রকলার প্রারম্ভিক শিল্পী। বস্তুত, এই দুই শিল্পীই মুঘল চিত্রশিল্পের রূপকার।[৪]

মুঘল বাদশাহগণ কর্মদক্ষতা ও প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পীদের অনুপম অভিধায় ভূষিত করতেন।[১] আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'তে চিত্রশিল্পের ধারা-বর্ণনায় বিশিষ্ট চিত্রকরদের নাম উল্লেখ

---

[১] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬

[২] Percy Brown, *Indian Painting Under The Mughals*, New Delhi: Cosmo Publications, 2007, p. 51-54
এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬

[৩] Som Prakash Verma, *Mughal Painting*, New Delhi: Oxford University Press, 2014, p. 1ii

[৪] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

করেছেন। তাঁদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছেন তাব্রিজের প্রখ্যাত সাফাভী স্কুলের শিল্পী মীর সৈয়দ আলীকে। তিনি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশিল্পের চর্চায় নিমগ্ন থাকেন এবং এক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন।[২] হুমায়ূন মীর সৈয়দ আলীকে 'নাদির-উল-মলূক' এবং খাজা আবদুস সামাদকে 'শিরিন কলম' (সুমিষ্ট কলমধারী) অভিধায় ভূষিত করেন। এই অভিধা দু'টি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ।[৩]

শের শাহ্ সূরের আকস্মিক মৃত্যুর পর হুমায়ূন ভারতবর্ষে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে। এই সময়ে উল্লিখিত দুই শিল্পী হুমায়ূনের দরবারে চলে আসেন। পরবর্তীকালে মীর সৈয়দ আলীর পিতা মীর মুসাব্বিরও ভারতবর্ষে চলে আসেন বলে জানা যায়। এই তিন চিত্রশিল্পীর আপ্রাণ প্রয়াসে এবং হুমায়ূনের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলা ভিন্নতর একটি ঘরানা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৬

মুঘল চিত্রকলার ইতিহাসকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) প্রাথমিক যুগ অর্থাৎ ইন্দো-পারস্য পর্যায় (১৫৩০-১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ);

(খ) স্বর্ণযুগ অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ মুঘল চিত্রশিল্পের পর্যায় (১৬০৫- ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ) এবং

(গ) অবক্ষয়ের যুগ

ঐতিহাসিক পটভূমির আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মুঘল চিত্রকলার প্রাথমিক যুগের সূচনা করেন বাদশাহ হুমায়ূন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করে পারস্য হতে শিল্পী খাজা আবদুস সামাদ এবং শিল্পী মীর সৈয়দ আলীকে সাথে নিয়ে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে মুঘল চিত্রকলার প্রাথমিক পর্যায়ের সূচনা হুমায়ূনের রাজত্বে হলেও, মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় বাদশাহ্ আকবরের দূরদর্শিতা এবং একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রশিল্পের উন্মেষ হয়। বলাই বাহুল্য যে, এই সময় মুঘল চিত্রকলায় প্রধান উৎস পারস্য চিত্রশিল্পের প্রকট প্রভাব ছিল। স্বভাবত এই ঘরানাকে ইন্দো-পারস্য স্কুল বা চিত্রপীঠ বলা হয়ে থাকে। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ) অবসানে তাঁর পুত্র নূর-উদ্-দ্বীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট হলে চিত্রশিল্পে এক আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। শিল্পানুরাগী জাহাঙ্গীর প্রকৃতঅর্থেই একটি অত্যুৎকৃষ্ট এবং অসামান্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারতীয় ও পারস্য প্রভাব এবং উপাদানের সংমিশ্রণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্ররীতির পৃষ্ঠপোষক। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ) মুঘল চিত্রকলার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। ফলে এই কালপর্বকে মুঘল চিত্রকলার স্বর্ণযুগ

---

[১] Som Prakash Verma, *Ibid*, p. XXX

[২] Abu'L-Fazl Allami, *Ain-I-Akbari*, (Tr. by H. Blochmann), Kolkata: The Asiatic Society, 2010 (3 reprint), p. 108

[৩] Som Prakash Verma, *Ibid*, p. XXX

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। চিত্রকলা অপেক্ষা স্থাপত্যশিল্পে বাদশাহ শাহজাহান অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ফলে তাঁর রাজত্বে মুঘল চিত্রকলার অবক্ষয় হতে থাকে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব প্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। মুঘল চিত্রশিল্পের অধঃপতনের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় কারণ বলে মনে করা হয়। অবশ্য মুঘল চিত্রকলায় অবক্ষয় ও অধঃপতনের একাধিক কারণ রয়েছে।[১] ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল চিত্রকলার যুগ প্রায় শেষ হয়ে আসে। তাঁর পরবর্তীকালে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে যাঁরা এলেন, তাঁরা এক অর্থে পুত্তলিকা-সদৃশ। দরবারের ষড়যন্ত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই তিনজন বাদশাহ নিহত হন। দিল্লির সিংহাসনের তখন অস্থির অবস্থা। অবশেষে বাদশাহ্ মুহম্মদ শাহ্ ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দিল্লিতে কিছু ক্ষমতা স্থাপন করতে পেরেছিলেন। আওরঙ্গজেবের শাসনের আরম্ভ হতে ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী কাল হবে। কাজেই ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল চিত্রের গৌরবময় যুগ। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ হতে এর অধোগতি এবং মৃত্যুর কাল।[২]

মুঘল যুগের অস্তরাগে দিল্লি শহরে এবং আশেপাশের রাজ্যে প্রাদেশিক মুঘল রীতির প্রচলন হয়। তখন শিল্পীরা কাজের জন্য বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েন। আঠারো শতকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে প্রাদেশিক মুঘলরীতির স্কুল গড়ে ওঠে।[৩] যথা:

১) ফৈজাবাদ বা লক্ষ্ণৌ কলম
২) ফররুখাবাদ শৈলী
৩) মুর্শিদাবাদ শৈলী
৪) বাংলা কলম ও
৫) পাটনা (আজিমাবাদ) শৈলী

নাদির শাহ্ ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি আক্রমণের মধ্য দিয়ে দিল্লির সকল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করেন। মুঘল গ্রন্থাগার লুণ্ঠন করে অমূল্য মুঘল চিত্রকর্ম এবং চিত্রিত পুস্তক তেহরানে নিয়ে যান। এর মধ্যে অনেক চিত্রে শাহজাহানের নামের সীলমোহর ছিল। প্যারিস, বার্লিন, পেট্রোগ্রাড এবং ভিয়েনার সংগ্রহশালায় এইসব অমূল্য সম্পদ স্থান পায়। এরপর আক্রমণ হয় মারাঠাদের। তাঁরাও চিত্র অপহরণ করে সাতারার রাজা এবং পুনার পেশোয়ারদের জন্য। সর্বশেষ লুণ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়। তাঁরা দিল্লির ভাণ্ডার তছনছ করে দেন। সিপাহীরা চিত্রের শেষ চিহ্ন লুপ্ত করে দেয়।

---

[১] Percy Brown, *Ibid*, p. 49-56; সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

[২] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ১১১

[৩] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৬

সমগ্র চিত্রকর্ম অপসারিত হয়। এমনকি, অনেক অমূল্য চিত্রকর্ম ও পুস্তক তাঁরা এক টাকাতেও বিক্রি করে। দুইশত বছরের গৌরবময় মুঘল চিত্রকলার এভাবেই অবসান হল।[১]

১.৭

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি জাদুঘরে সংরক্ষিত কিছু আকর (original) মুঘল চিত্রকর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান এই সব মুঘল চিত্রকর্মসমূহ। এই চিত্রকর্মগুলোর শিল্পমূল্য বিশ্লেষণ ওই সময়ের ইতিহাস অন্বেষণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে মুঘল সুবা বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থারও পরিচয় পাওয়া যাবে।

পরিধি (Scope)

প্রধানত লালবাগ দুর্গ জাদুঘর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে (রাজশাহী) সংরক্ষিত আকর মুঘল চিত্রকলাসমূহের সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি ও শৈল্পিক বিশ্লেষণই এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। এছাড়া বাংলা একাডেমি, সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, সরকারি সা'দত কলেজ এবং মাদ্রাসা-ই-আলিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলাসমূহ গবেষণার আওতায় থাকবে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ জন্য এই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গবেষণার পরিধি সীমিত রাখা হয়েছে।

উদ্দেশ্য (Purpose)

বাংলাদেশে মুঘল চিত্রকলা নিয়ে প্রকৃতঅর্থে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলা নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুবই সামান্য। সুনির্দিষ্ট এই বিষয় নিয়ে কোনো গ্রন্থও রচিত হয়নি। মুঘল চিত্রকলা বিষয়ে তথ্যের জন্য এদেশে দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে- এ বি এম হোসেনের *ইসলামী চিত্রকলা* ও সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের *মুসলিম চিত্রকলা*। এছাড়া মুঘল চিত্রকলায় নারী প্রতিকৃতি বিষয়ে নাজমা বেগমের পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। তাঁর গবেষণার শিরোনাম- *Portryal of Women in Mughal Painting: A Study Based on Illustrated Manuscripts and Album Drawing* (অপ্রকাশিত)। সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও যৌক্তিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলার বিষয় ও শৈলী নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

---

[১] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

মুঘল সাম্রাজ্য ও মুঘল সুবা বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মুঘল চিত্রকলা চর্চা ও সংরক্ষণের ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচন এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া নবাবী আমলে মুঘল চিত্রকলা চর্চা ও এর প্রভাবের ধারাবাহিকতা চিহ্নিতকরণ। মুঘল সুবাহ বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা। ফলে সেই সময়ের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বস্তুত বাংলাদেশের সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ারই ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

বর্তমান গবেষণায় প্রধানত বাস্তব ও সরেজমিন পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এছাড়া ঐতিহাসিক পদ্ধতিও অনুসরণ করা হবে। গবেষণার পরিধির মধ্যে যে সকল মুঘল চিত্রকর্মসমূহ খুঁজে পাওয়া যায়, সেগুলো বাস্তব পর্যবেক্ষণ করে তার সঙ্গে সেই সময়ের চিত্রশিল্প ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটি উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। তবে একই সঙ্গে গ্রন্থাগারভিত্তিক তথ্য-উপাত্তকেও এই গবেষণায় সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

এই গবেষণার প্রাথমিক উপকরণ হিসাবে মূলত ব্যবহৃত হবে বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত আকর (Original) মুঘল চিত্রকলা সমূহের বিশ্লেষণ। এছাড়া উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভ এবং জাদুঘরের উপকরণ ব্যবহার করা হবে। প্রয়োজনে মুঘল চিত্রকলা বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Sources)

পূর্বে উল্লিখিত প্রাথমিক উৎসসমূহের বাইরেও সংশ্লিষ্ট কালপর্বের ইতিহাস ও মুঘল চিত্রকলা বিষয়ক বই-পুস্তক এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই গবেষণায় দ্বৈতীয়িক তথ্য-উপাত্তের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং মুঘল চিত্রকলার স্বরূপ

২.১ মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশের বাদশাহ্‌গণ ১৫২৬ হতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এই তিনশত একত্রিশ বছর সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। মুঘল বাদশাহগণ স্ব-প্রতিভা ও ক্ষমতার দ্বারা শুধু সাম্রাজ্য গঠন করে থেমে থাকেননি। নেতৃত্বগুণ ও সংগঠনী প্রতিভার মাধ্যমে তাঁরা মুঘল সাম্রাজ্যকে মজবুত ভিত্তিতে স্থাপন করেছিলেন। মুঘলরা একপক্ষে যেমন ছিলেন অসাধারণ যোদ্ধা, সাহসী রাষ্ট্রনায়ক এবং বিচক্ষণ শাসক, অন্যপক্ষে ছিলেন শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক।[১]

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার কাবুলের আমির জহির-উদ-দ্বীন-মুহম্মদ বাবুর (শাসনকাল: ১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.) পানিপথের প্রথম যুদ্ধে তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীকে (শাসনকাল: ১৫১৭-১৫২৬) পরাজিত করার মধ্য দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।[২] মুঘলরা প্রয়োজন সাপেক্ষে দুশমনকে যেমন কঠোরভাবে দমন করতেন তেমনি পরাজিত শত্রুর শৌর্য-বীর্যের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রকাশের মাধ্যমে উদারতার দৃষ্টান্তও রাখতেন। মুঘল যুগের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিসমূহ আমাদের কাছে অধিক পরিচিতি লাভ করেছে। কারণ সেসবের অস্তিত্ব সেই যুগকে অতিক্রম করেছে এবং বর্তমানেও কিছু কিছু টিকে আছে।[৩]

ভারতবর্ষে মুঘলগণ আগমন করেছিলেন অন্য দেশ থেকে। কোথা থেকে তাঁরা ভারতবর্ষে এসে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং কেনই বা দীর্ঘকাল এই ভূখণ্ডকে আপন করে সাজিয়েছেন, সেসব ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য মুঘল আমলের পূর্বের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া প্রয়োজন বোধ করি। মুঘল চিত্রকলা বিশ্লেষণের পূর্বে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতবর্ষের সীমান্তে এসে মধ্য এশিয়ার যাযাবর স্বভাবের তুর্কি দলপতিরা প্রায়শ ঝড়ের বেগে লুটপাট করে প্রচুর ধনরত্নসহ ফিরে যেতেন।

---

[১] শাহ্‌রিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ১৫

[২] Jeremiah, P. Losty, *The Art of the Book in India,* India: British Library Cataloguing in Publication Data, 1982, p. 74

[৩] শাহ্‌রিয়ার ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

আলপ্তিগিন নামে এক তুর্কি দলপতি ৯৬২ সালে গজনী দখল করে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম মুসলিম শাসন ব্যবস্থার সূচনা করেন। তাঁর পৌত্র সুলতান মাহমুদ ১০১০ সালে ভারত আক্রমণ করেন। এরপর ঘোরী সুলতানদের রাজত্ব আরম্ভ হয়। কুতুব-উদ-দ্বীন আইবক ১২০৬ সালে দিল্লির সিংহাসনে আসীন হন। তারপর আসেন শামসুদ্দিন ইলতুত্‌মিশ। তিনি একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। এ সময়ে মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল দলপতি চেঙ্গিস খান ভারতবর্ষের সীমান্তে উপস্থিত হলে ইলতুত্‌মিশ তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বিদায় দিতেন। ইলতুত্‌মিশের মৃত্যুকালে অর্থাৎ ১২৩৬ সালে দিল্লির মুসলিম শাসন বিহার ও বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তিনি ১২৩১ সালে গোয়ালিয়র ও ১২৩৫ সালে উজ্জয়নী দখল করেছিলেন। এরপর খিলজী বংশীয় সুলতানেরা ১৩২০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁদের পর ১৪১৩ সাল পর্যন্ত তুঘলক বংশীয় রাজত্ব অব্যাহত থাকে।[১] বস্তুত খিলজী বংশের রাজত্বের অবসানের পর দিল্লির সুলতানী শাসনে এক সঙ্কটময় সময় আসে। ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে কাজী মালিক গিয়াস-উদ-দ্বীন তুঘলক নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বীয় প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মেধার ফলে কাজী মালিক নিম্নতর সামাজিক অবস্থা থেকে খিলজীদের অধীনে উচ্চ পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[২]

তুঘলক শাসনকালে ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা হয়। এই তুঘলক সুলতানদের সময়কালে ১৩৯৮ সালে মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের তুর্কি বীর তৈমুর লঙ দিল্লিতে তুমুল আক্রমণ করেন এবং তিনি প্রচুর ধনদৌলতসহ মধ্য এশিয়ায় ফিরে যান। দুর্দান্ত বীর তৈমুরের ধ্বংসলীলার পর দিল্লির কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় আঞ্চলিক শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন।[৩]

তুঘলকদের পর ১৪১৪ থেকে ১৪৫১ সাল পর্যন্ত সৈয়দ বংশ রাজত্ব করেছিল। খিজির খান (শাসনকাল: ১৪১৪-১৪২১ খ্রি.) তৈমুর লঙের ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি দিল্লির সিংহাসন লাভ করা সত্ত্বেও তৈমুর বংশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। খিজির খান নিজেকে সৈয়দ বংশোদ্ভূত বলে দাবী করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ 'সৈয়দ বংশ' নামে ভারতীয় ইতিহাসে পরিচিত।[৪] দিল্লিতে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন গোত্রীয় শাসনের পালাবদল ঘটেছে অর্থাৎ দিল্লির সিংহাসনে যখন বিবিধ শাসকের পালাবদল চলেছিল, সেসময় দিল্লি আফগান বংশীয় দলপতিদের কর্তৃত্বে ছিল। তুর্কি বংশোদ্ভব সুলতানগণ যখন উত্তর ভারতে রাজত্ব করছিলেন এবং তৈমুরের আক্রমণে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল, সে সময় একদল কর্মহীন আফগান যুবক ভাগ্য

---

[১] শাহ্‌রিয়ার ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[২] এ কে এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫ (নবম মুদ্রণ), পৃ. ৭৩

[৩] শাহরিয়ার ইকবাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৪] এ কে এম আবদুল আলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

উন্নয়নের লক্ষ্যে দিল্লির দরবারে এসেছিলেন। ক্ষমতাসীন সম্রাটদের অধীনে তাঁরা জায়গীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অসামান্য বুদ্ধিমত্তার ফলে এঁদের মধ্যে একজন আফগান দলপতি দিল্লির অধিপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি বাহলুল খান লোদী (শাসনকাল: ১৪৫১-১৫৮৯ খ্রি.) বাহলুল ও তাঁর পুত্র সিকান্দার লোদী (শাসনকাল: ১৪৮৯-১৫১৭ খ্রি.) তাঁদের রাজ্যসীমা দিল্লি, আগ্রা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

ভারতবর্ষে এই সময়ে কয়েকজন কিংবদন্তিতুল্য ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। এঁরা হলেন কবির (জীবনকাল: ১৪৪০-১৫১৮ খ্রি.), নানক (জীবনকাল: ১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রি.) এবং চৈতন্য (জীবনকাল: ১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রি.)।[১]

১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে পিতা সিকান্দার লোদীর মৃত্যুর পর পুত্র ইব্রাহীম লোদী (শাসনকাল: ১৫১৭-১৫২৬ খ্রি.) ২১ নভেম্বর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভিজাতবর্গের একাংশ সাম্রাজ্য বিভক্ত করবার জন্য দাবী জানালেন এবং ইব্রাহীম লোদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল খান লোদীকে জৌনপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা দিলেন।[২] ইব্রাহীম লোদীর সামরিক দক্ষতা ঠিকই ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে অভাব ছিল সুবুদ্ধি ও সংযমের। এই দুই গুণের অভাব তাঁর পতনের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[৩] কেন্দ্রের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ইব্রাহীম লোদী কিছুটা কঠোর ও অত্যাচারী ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা অনুধাবন করেছেন যে, ইব্রাহীম অধিককাল দিল্লির সিংহাসনে আসীন থাকলে সম্পূর্ণরূপেই কেন্দ্রের অধীনে তাঁদের থাকতে হবে। এসব বিবেচনা থেকে কোনো কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিদ্রোহী হলেন।[৪] ইব্রাহিম লোদীর উদ্ধত ব্যবহার এবং উগ্র মস্তিষ্কপ্রসূত কঠোর রীতি-নীতি আফগান অভিজাতদের বিরক্তির কারণ হলো। লাহোরের (পাঞ্জাব) শাসনকর্তা দৌলত খান লোদীর পুত্র দিলওয়ার খানের প্রতি ইব্রাহীম লোদীর দুর্ব্যবহারে অভিজাতদের অসন্তুষ্টি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলো।[৫] দরিয়া খানের নেতৃত্বে বিহার স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। একপর্যায়ে দৌলত খান লোদী সিংহাসন থেকে ইব্রাহীম লোদীকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে চুঘতাই-তুর্কি বংশীয় কাবুলের (আফগানিস্তান) আমির জহির-উদ-দ্বীন-মুহম্মদ বাবুরের কাছে সাহায্য প্রার্থনাপূর্বক তাঁকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আহ্বান জানালেন।[৬]

---

[১] শাহরিয়ার ইকবাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[২] এ কে এম আবদুল আলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[৪] শাহরিয়ার ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৫] এ কে এম আবদুল আলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[৬] শাহরিয়ার ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

এই পর্যায়ে বাবুরের বংশ-পরিচয় ও তাঁর ভারতবর্ষ বিজয় সম্পর্কে সম্যক আলোচনা প্রয়োজন। আনুমানিক ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল গোত্রীয় দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীরা চীন দেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। চেঙ্গিস খান নামের একজন বিচক্ষণ দলনেতা ওই বিশৃঙ্খল অশ্বারোহীদের একত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১২২৭ সালে চেঙ্গিসের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী চীন দখলের পর মোঙ্গলরা পারস্য ও রাশিয়ার কিছু অংশ দখল করে নেয়। এর ফলে তাঁরা মধ্য এশিয়ার এক বিশাল যাযাবর সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চেঙ্গিস খান ও তাঁর বংশধরেরা শাসম্উদ্দীন ইলতুত্মিশ (জীবনকাল: ১২১১-১২৩৬ খ্রি.), আলাউদ্দিন খিলজি (জীবনকাল: ১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) ও ফিরোজ শাহ তুঘলকের (জীবনকাল: ১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) রাজত্বকালে দিল্লি আক্রমণ করেন এবং প্রচুর ধনদৌলত লুট করে নিয়ে যান। প্রতিবারই লুট করার পর মোঙ্গলেরা মধ্য এশিয়ার শীতল আবহাওয়ায় ফিরে গেছেন। কারণ দিল্লির উত্তপ্ত আবহাওয়া তাদের ভালো লাগেনি।[১]

বাবুরের উত্তরপুরুষ তৈমুর লঙ (জীবনকাল: ১৩৩৬-১৪০৫ খ্রি.) ভারতবর্ষ নিয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনিও বহুকাল আগেই ভারতবর্ষে ভবিষ্যৎ মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ নির্মাণ করেছিলেন।[২] তৈমুর লঙ ছিলেন একজন তুর্কি আমিরের পুত্র। তিনি ১৩৩৬ সালে সমরখন্দের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজ্য জয়ের জন্য তীব্র নেশা ছিল তাঁর। ১৪০৫ সালে অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি রাজ্য জয়ের প্রবল বাসনায় তাঁর দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী দল নিয়ে পারস্য, আফগানিস্তান ও মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) জয় করেন। মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষে আক্রমণ করে যে পরিমাণ ধনরত্ন লুট করেছিলেন, সে সম্পর্কে তৈমুর লঙ ওয়াকিবহাল ছিলেন। মধ্য এশিয়ার যাযাবরদের কাছে ভারতবর্ষের ধনরত্ন সম্পর্কে তথ্য ছিল। তৈমুর লঙের সৈন্যদল ১৩৯৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হাজির হয়ে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। তারপর তাঁরা রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশের পর সবকিছুই লুট করে নেন। এতে ভয়ানক ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষ হতে প্রায় এক লক্ষ সুদক্ষ কারিগরকে বন্দী করে নিয়ে যায় তৈমুরের সেনাদল। সমরখন্দের বিখ্যাত মসজিদটি আজও তৈমুর লঙের ভারতবর্ষ হতে লুট করা পাথরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তৈমুর পুনরায় ১৩৯৯ সালে তাঁর পৌত্র পীর মহম্মদকে মুলতান আক্রমণে পাঠিয়েছিলেন। তৈমুরের সেনাদল এবারও ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। এরপর বিস্তর ধনদৌলত নিয়ে তৈমুর লঙ খোশমেজাজে মর্মর নগরী সমরখন্দ নির্মাণ করলেন।[৩]

জহির-উদ-দ্বীন বাবুর কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'মুঘল বংশ' নামে সাধারণভাবে পরিচিত। তবে ঐতিহাসিক সত্যের যৌক্তিক বিবেচনায় বাবুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশটির নামকরণ মুঘল বংশ

---

[১] শাহ্রিয়ার ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[২] এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ: মোগল পর্ব)*, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭, পৃ. ১৭

[৩] শাহরিয়ার ইকবাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

হওয়া সমীচীন নয়। কারণ মুঘল শব্দটি এসেছে 'মোঙ্গল' শব্দ থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে বাবুর মোঙ্গল বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি ছিলেন বস্তুত তুর্কি।[১]

আলোকচিত্র ২.১: বাদশাহ বাবুরের প্রতিকৃতি (দারাশিকোর অ্যালবাম থেকে)

সূত্র: Annemarie Schimmel, *The Empire of the Great Mughals* (trans.by Corinne Attwood), London: Reaktion Books, 2004

জহির-উদ-দ্বীন মুহম্মদ বাবুর ১৪৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্ষুদ্র রাজ্য ফারগানার আমির, মির্জা ওমর শেখ ছিলেন তৈমুর লঙের অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ। ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন ওমর শেখ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তখন বাবুরের বয়স মাত্র এগারো বছর।[২] বাবুরের মা কুতলুগ নিগার খানম ছিলেন চেঙ্গিস খানের দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই খানের পুত্র ইউনুস খানের কন্যা। এই চাঘতাই-তুর্কি রাজপুত্র বাবুরের ধমনিতে তৈমুর ও চেঙ্গিসের রক্ত প্রবাহিত ছিল।[৩] পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে মাত্র এগারো বছর চার মাস বয়সে অভিজাতগণ বাবুরকে

[১] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[২] Bamber Gascoigne, *A Brief History of The Great Mughals*, London: Constable & Robinson Ltd., 2002, p. 3

[৩] শাহরিয়ার ইকবাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

ফারগানার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।[১] কিন্তু জ্ঞাতি শত্রুরা তাঁকে কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যচ্যুত করেন। তারপর বাবুর বিভিন্ন সময় সমরখন্দ, আন্দিজাম, হেরাত ও কাবুল জয় করেন। চাঘতাই ও মোঙ্গল রীতি, রেওয়াজ ও যাযাবর জীবন ভারতবর্ষের রাজপ্রাসাদের স্থায়ী জীবনধারার সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। তা সত্ত্বেও বাবুর ভারতবর্ষের সুশৃঙ্খল জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাবুর তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ *তুজুক-ই-বাবুরী'*তে লিখেছেন যে, আফগানিস্তান আক্রমণের পর হতেই তিনি ভারতবর্ষ জয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁর এই অসামান্য স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ হলো, যখন ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল পাঞ্জাবের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, দৌলত খান লোদী তাঁকে দিল্লি আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।[২] বাবুর ফারগানা থেকে নিকটবর্তী উজবেকদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ভাগ্যান্বেষণের জন্য আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে। লোদী বংশের শেষ শাসক দিল্লির সুলতান ইব্রাহীম লোদীকে পাঞ্জাবের পানিপথ নামক স্থানে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করে বাবুর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক কালজয়ী অধ্যায়ের সূচনা করেন।[৩] ইব্রাহীম লোদী প্রায় এক লক্ষ সৈনিক এবং ১৫০০ হাতিসহ বাবুরের দিকে অগ্রসর হন। তখন বাবুরের সৈন্যসংখ্যা লোদীর অর্ধেকেরও কম ছিল। যা সর্বসাকুল্যে প্রায় ২৫,০০০ এর মতো। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিলে সংঘটিত এই যুদ্ধটি পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে খ্যাত এবং বাবুর ও লোদীর মধ্যে প্রধান সংঘাত। যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদী নিহত হন এবং তাঁর বাহিনীকে পরাজিত করে বাবুর দ্রুত দিল্লি ও আগ্রা উভয়ের দখল নেন।[৪]

এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের রাজপুতানা অঞ্চল বত্রিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মেবারের রাজা রানা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন এসব রাজ্যের শাসকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তিনিও লোদী বংশের পতনের আশায় ছিলেন। ওই দুরভিসন্ধি থেকে রানা সংগ্রামও আফগানিস্তানের তুর্কি মোঙ্গল অধিপতি বাবুরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। দিল্লি আক্রমণের জন্য যাঁরা বাবুরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন যে বাবুর তাঁর পূর্ববর্তী মোঙ্গল ও তিমুরি যাযাবর লুণ্ঠনকারীদের মতো দিল্লির ধনরত্ন লুণ্ঠনের পর অসহনীয় উষ্ণ আবহাওয়া ত্যাগ করে শীতল আবহাওয়ার মধ্য-এশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু বাবুরের মনোবাসনা ছিল ভিন্ন। ফলে রানা সংগ্রামের হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা ভঙ্গ হলো। তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আগ্রার কাছে খানওয়া অঞ্চলে বাবুরের সেনাদলকে প্রবল আক্রমণ করলেন। ভাগ্যের পরিহাস হলো এই যে, বাবুরের ক্ষুদ্র, সুশৃঙ্খল বাহিনী কেবল দৃঢ় মনোবল ও উন্নত রণকৌশল অবলম্বন করে রানা সংগ্রামের

---

[১] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[২] শাহরিয়ার ইকবাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৩] এ বি এম হোসেন, *ইসলামী চিত্রকলা*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৪, পৃ. ১৭৫

[৪] Valerie Berinstain, *Mughal India: Splendours of the Peacock Throne*, London: Thames and Hudson Ltd., 2009, p. 24-26.

বাহিনীকে পরাজয় বরণে বাধ্য করলেন। ভঙ্গ হলো রানা সংগ্রামের রাজপুত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। অপরদিকে বিজয়ী বীর বাবুরের ভারতবর্ষে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সাম্রাজ্য 'চাঘতাই-তুর্কি' সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হতো। কিন্তু যেহেতু তুর্কিভাষী বাবুর ধমনিতে মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস ও চাঘতাই বীর তৈমুরের রক্ত ধারণ করেছিলেন, সেজন্য সমসাময়িককালের ইতিহাসবিদগণ তাঁর বংশকে 'মুঘল বংশ' নামে পরিচিতি দিলেন।[১] 'মুঘল' শব্দটি এসেছে পারসিক শব্দ 'মোঙ্গল' থেকে।[২] ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশ তিন শতাব্দী রাজত্ব করেছিল। যা কিছু বিশাল বা মহান কালক্রমে তারই আভিধানিক পরিচয় হলো 'মুঘল' নামে।[৩]

সমসাময়িক যুগের অন্যতম প্রধান বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিবান মানুষ হিসাবে ইতিহাস বাবুরকে অনন্য উচ্চতায় স্থান দিয়েছে। বাবুরের আত্মজীবনী গ্রন্থ *তুজুক-ই-বাবুরি* প্রতীয়মান হয়েছে তুর্কি ভাষায় সাহিত্য রচনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও প্রতিভা। পারসিক ও তুর্কি ভাষায় তিনি অনেক শিল্পোত্তীর্ণ গীতিকবিতাও রচনা করেছিলেন। কবি হিসাবেও বাবুরের খ্যাতি ছিল। তুর্কি ভাষায় রচিত তাঁর কাব্য সংকলন *দিওয়ান* বিপুল প্রশংসা লাভ করেছিল। বাবুর পদ্যছন্দের বিষয়ে নিজস্ব একটি ধারা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই ধারাটি 'নূবাইয়ান' নামে পরিচিতি লাভ করে। কাব্য ছাড়াও আইনশাস্ত্র বিষয়ে তিনি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাবুর *রিজালা-ই-উরাজ* নামে অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষ লিপিশৈলী *খাৎ-ই-বাবুরি*'র লিপিশিল্পী ছিলেন বাবুর নিজেই। সামগ্রিকভাবে একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব হিসাবে বাবুর খ্যাতিমান ছিলেন। সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই বাবুরকে মধ্যযুগের এশিয়ার রাজ্য শাসকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মেধাবী বলে মন্তব্য করেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ, ই.ভি. হ্যাভেল, রাসব্রুক উইলিয়াম প্রমূখ ঐতিহাসিকগণ বাবুরের বহুমুখী প্রতিভা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের আটটি গুণের উল্লেখ করেছেন। এই গুণগুলো হচ্ছে: বিচক্ষণতা, উচ্চাভিলাষ, যুদ্ধনৈপূণ্য, সুদক্ষ শাসনকৌশল, প্রজাহিতৈষণা, উদার প্রশাসনিক আদর্শ, সৈন্যদের মন জয় করার ক্ষমতা এবং ন্যায়বিচারের প্রবণতা।[৪] ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর মহান মুঘল বাদশাহ বাবুর মৃত্যুবরণ করেন। হিসাব মতে তিনি মাত্র চার বছর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ) ক্ষমতাসীন ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব, আধুনিক যুক্তপ্রদেশ, উত্তর বিহার এবং প্রধান রাজপুত রাষ্ট্র মেবার করায়ত্ত করেন। কিন্তু বিজয় অর্জন ব্যতীত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সম্পন্ন করতে পারেননি। কারণ বিজিত দেশগুলোকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বে

---

[১] শাহরিয়ার ইকবাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[২] Bamber Gascoigne, *ibid,* p. 1

[৩] শাহরিয়ার ইকবাল প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[৪] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

তাঁর অকালমৃত্যু হয়।[১] মৃত্যুর পূর্বেই বাবুর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূনকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পিতার মৃত্যুর পর হুমায়ূন ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।[২]

বাদশাহ বাবুরের মৃত্যু (২৬ ডিসেম্বর) এবং শাহজাদা হুমায়ূনের সিংহাসনারোহণের (৩০ ডিসেম্বর) মধ্যবর্তী চারদিন মুঘল সিংহাসন শূন্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে বাবুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে। প্রধান উজির নাজিমউদ্দিন আলী খলিদ ধারণা করতেন, মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনার মতো হুমায়ূনের যথেষ্ট দক্ষতা নেই। এ কারণেই তিনি বাবুরের নির্বাচিত পরবর্তী বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও, হুমায়ূনকে সরিয়ে বাবুরের শ্যালক মাহদী খাজাকে সিংহাসনে বসাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাহদী খাজা শুধু বাবুরের শ্যালকই নন, তিনি বাবুরের বোন খানজাদা বেগমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মাহদী একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে প্রশাসক হিসেবে হুমায়ূনের কিছু দুর্বলতা এবং বাদাকশানের শাসক হিসাবেও উল্লেখযোগ্য কোনো কর্মকান্ডে স্বাক্ষর রাখতে না পারা প্রভৃতি কারণে প্রধান উজির হুমায়ূনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে নারাজ ছিলেন। অন্যদিকে হুমায়ূনের ভাই কামরান, আসকারি এবং হিন্দালের দাবি অস্বীকার করা হয় অল্প বয়সের দোহাই দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্র অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছিল। প্রধান উজির নাজিমউদ্দিন আলী নিজের সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনেন এবং হুমায়ূনের সিংহাসনে বসার পথ প্রশস্ত করে দেন। হুমায়ূন ৩০ ডিসেম্বর আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩]

নাসির-উদ-দ্বীন মুহম্মদ হুমায়ূন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় মুঘল বাদশাহ হলেন। তাঁর জীবন সংক্ষিপ্ত এবং রাজত্বকাল দুর্যোগময় ছিল। তথাপি বাদশাহ হুমায়ূন অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন । বলা হয়, আফিমে আসক্তির কারণে হুমায়ূনের চরিত্রে উত্তেজনা ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ছিল না। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষ আফগান বীর শের শাহ (জীবনকাল: ১৪৭২-১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) হুমায়ূনকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে স্বল্পদীর্ঘ আফগান সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।[৪] শের শাহ আফগানদের সূর বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে শের খান বা শের শাহ সূর নামেও অভিহিত করা হয়।[৫] শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খান 'ইসলাম শাহ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন

---

[১] মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ১৪৭

[২] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৪] শাহরিয়ার ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[৫] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

(শাসনকাল: ১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ)।[১] এরপর ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের তিনদিন পরেই শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ খান ফিরোজ শাহকে হত্যা করেন এবং 'আদিল শাহ' (শাসনকাল: ১৫৫৩-১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২]

অতঃপর হুমায়ূন ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে দিল্লির সিংহাসন ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু এক বছর পর ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি বাদশাহ হুমায়ূন দিল্লিতে তাঁর কুতুবখানার সিঁড়ি থেকে পদস্খলিত হয়ে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেন।[৩] তারপর হুমায়ূনের বংশধরেরা ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার মুঘল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে মোট পনের জন মুঘল বাদশাহ রাজত্ব করেছিলেন।[৪] অবশ্য বাবুর থেকে শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত মোট সতেরো জন ক্রমান্বয়ে সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, প্রথম ছয়জন 'গ্রেট মুঘল' (The Great Mughal) হিসাবে ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন, বাকী এগারোজন 'লেটার মুঘল' (The Later Mughal) হিসাবে অভিহিত হয়েছেন।

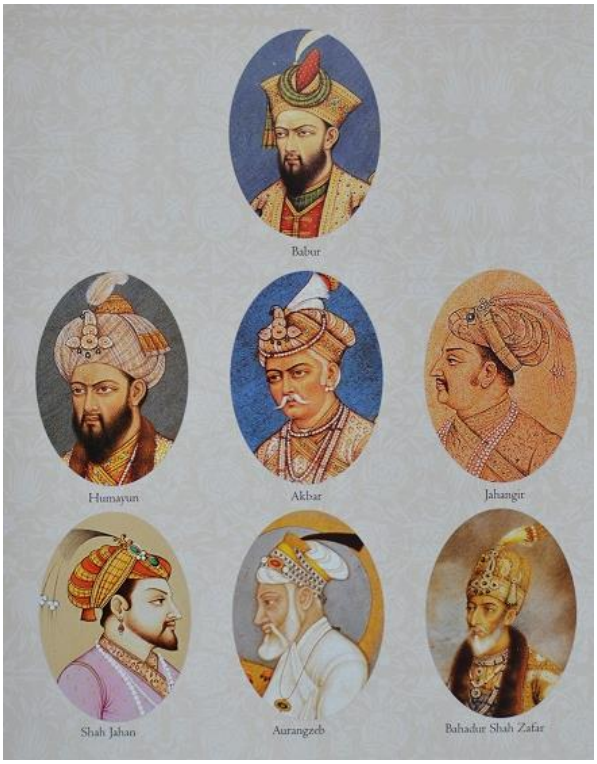

আলোকচিত্র ২.২: প্রথম ছয় মুঘল বাদশাহ ও শেষ মুঘল বাদশাহের প্রতিকৃতি

সূত্র: www.mughalemperors.com

[১] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[৩] এ কে এম আবদুল আলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

[৪] শাহরিয়ার ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২.২ মুঘল সাম্রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

মুঘল যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের সামাজিক অবস্থার বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমাজ দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা- শাসক গোষ্ঠী ও অভিজাত সম্প্রদায় অর্থাৎ বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এবং দরিদ্র বা সাধারণ শ্রেণির মানুষ। সামাজিক ক্ষেত্রে এই শ্রেণি বিভাগে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। তুর্কি-আফগান যুগের মতো মুঘল যুগেও ভারতীয় সমাজে কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। প্রথমোক্ত শ্রেণি অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী এবং অভিজাতবর্গ বিলাস-ব্যসনে জীবনযাপন করার সুযোগ লাভ করতেন। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত শৌখিন এবং স্বল্পস্থায়ী জীবনকে কর্মমুখর কিন্তু চরম বিলাসী করে তোলার জন্য তাঁরা সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মুসলমান শাসকদের অনুকরণে রাজা, মহারাজা প্রভৃতি হিন্দু নেতৃবর্গও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তেন। দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি নিম্ন আয়ের জনগণ, তাঁরা কোনো প্রকারে দু'বেলা অন্ন-সংস্থান করতেই ব্যস্ত থাকতেন। এই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের কাছে বিলাস, আরাম প্রভৃতি শব্দসমূহ একেবারেই অপরিচিত ছিল। মুঘলদের শাসনকালে ভারতবর্ষের জনসমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর পার্থক্য ছিল। সমসাময়িক রচনা থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।[১]

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসের মতো ভারতবর্ষের ইতিহাসেও জনসাধারণ সম্পর্কে বিশদ-বিবরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুল ফজলের[২] রচনায়, ইউরোপীয় পর্যটকগণের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ এবং ইউরোপীয়দের বাণিজ্য কুঠিরের নথিপত্রে সমকালীন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।[৩] আধুনিক ইতিহাসবিদদের সংজ্ঞা অনুযায়ী মুঘল আমলের সমাজ ব্যবস্থায় কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণি নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিজাত শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণির মাঝামাঝি একটি আলাদা শ্রেণির অস্তিত্ব পাওয়া যায়।[৪] ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত *Travels in the Mogul Empire (1656-1668 A.D.)* গ্রন্থে এই বিষয়ে লিখেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লি শহরে কোনো মধ্যবর্তী স্তরের বা অবস্থার লোকের অস্তিত্ব নেই। দুই শ্রেণির মানুষ দিল্লিতে সাধারণত অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে

---

[১] এস. ঘোষ, *ইসলাম ইন ইন্ডিয়া: মোগল যুগ*, কলিকাতা: জে. এস. ঘোষ এ্যান্ড সন্স, ১৯৯৮, পৃ. ৬২

[২] বাদশাহ আকবরের 'নবরত্ন'র প্রধান একজন, বাদশাহ আকবরের মূখ্য সচিব এবং আরও নানা গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আবুল ফজল। সে সময়ের রাজনীতিতে এবং বাদশাহ আকবরের দরবারে আবুল ফজল প্রভাবশালী ছিলেন। অবশ্য সে কারণে আমরা আবুল ফজলকে যতোটা স্মরণ করি, তার চেয়ে অধিক স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি তাঁর রচিত *আকবরনামা* ও *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থের জন্য। (এ কে এম ইয়াকুব আলী, রুহুল কুদ্দুস মো. সালেহ, *মুসলমানদের ইতিহাস চর্চা*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮, পৃ. ২২০-২২২)

[৩] এ কে এম আবদুল আলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

[৪] মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১১ (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৬৩-২৬৪

উচ্চশ্রেণির ধনী লোক এবং নিম্নশ্রেণির দরিদ্র লোক। মধ্যশ্রেণির বা মধ্যবর্তী স্তর বলতে বস্তুত কিছু নেই। ভারতীয় সমাজের গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি' বলতে আমরা যা বুঝি, তার বিকাশ হয়েছে আধুনিক শিল্পযুগে, মধ্যযুগে 'মধ্যশ্রেণি' বলে বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য কোনো সামাজিক শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না।[১] মুঘল আমলে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন বাদশাহ। বিশ্বজয়ী মহাবীর চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লঙের গর্বিত বংশধর, মুঘল বাদশাহগণ পৃথিবীতে অন্য কাউকেই তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচনা করতেন না। তৈমুর লঙ বলতেন- "যেহেতু সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই, ফলত তাঁর সৃষ্ট বিশ্বে তাঁরই প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন মাত্র একজন।"[২]

সাম্রাজ্যের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করবেন শাসনকর্তা বা বাদশাহের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এবং তাঁরা স্পষ্টভাবেই অনুভব করবেন, তাঁদের শাসনকর্তা কারো প্রভাবাধীন নয়। বস্তুত এই দর্শনে বিশ্বাসী হয়েই মুঘলগণ পূর্ববর্তী শাসকদের একটি প্রথা বাদ দিয়েছিলেন। তা হচ্ছে, দিল্লির সম্পূর্ণ স্বাধীন সুলতানদের নামমাত্র আব্বাসীয় খলিফাদের আনুগত্য স্বীকারের প্রথা। তুর্কি সুলতানদের চেয়েও মুঘলগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতেন এবং এ কারণেই তাঁরা উসমানীয় তুর্কিদেরও স্বীকৃতি দেননি।[৩] মুঘল বাদশাহগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কারো প্রভূত্ব স্বীকার করেননি।[৪] মুঘল সমাজে শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ শক্তি বাদশাহের মধ্যেই কেন্দ্রিভূত ছিল। তাঁর সহমত ও স্বীকৃতি ব্যতীত এবং তাঁর অজান্তে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো না। বাদশাহগণ ছিলেন সৈন্যদের প্রধান সেনাপতি, রাজ্যের প্রধান বিচারক এবং কার্যনির্বাহকদের প্রধান। রাজ্যের শাহী মহল, বিত্ত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়, প্রান্তীয় শাসনব্যবস্থা, কৃষকদের অবস্থা, পণ্য-সামগ্রীর মূল্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত, বিচার-ব্যবস্থা, পণ্ডিত ও শিল্প-সাহিত্যিকদের বন্দোবস্ত, পররাষ্ট্রনীতি, নিযুক্তি ইত্যাদি বিষয় বাদশাহের নির্দেশনায় পরিচালিত হতো। রাজ্যের সকল সরকারি কর্মচারি এবং মনসবদারগণ[৫] নিজেদের নিযুক্তি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাদশাহের প্রতি নির্ভরশীল থাকতেন।[৬]

মুঘল সাম্রাজ্যে বাদশাহের পরেই ছিল অভিজাতদের অবস্থান। তাঁরা বাদশাহের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করতেন। সমাজে এই অভিজাত শ্রেণির বিপুল মর্যাদা ও সম্মান ছিল। বিভিন্ন দেশের নাগরিকগণ এই

---

[১] বিনয় ঘোষ, *বাদশাহী আমল* (ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত *Travels in the Mogul Empire 1656-1668 A.D.* অবলম্বনে), কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৪০৬, পৃ. ১২৩

[২] হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০০, পৃ. ১৩

[৩] হাসান শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

[৪] হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব, *মোগল শাসন ব্যবস্থা* (বাংলা অনুবাদ: মুহম্মদ জালালউদ্দিন বিশ্বাস), ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৭, পৃ. ৫৮

[৫] মুঘল প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল 'মনসবদারি'। 'মনসব' শব্দের অর্থ 'মর্যাদা' বা 'সম্মান'। যাকে এই পদবি ও ক্ষমতা প্রদান করা হতো, তাকে 'মনসবদার' এবং পদ্ধতিকে 'মনসবদারি' বলা হতো।

[৬] হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

শ্রেণিতে সামিল হতেন। আমিরদেরকে মুঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ বিবেচনা করা হয়। তাঁরা রাজদরবারে জাঁকজমকপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতেন। রাস্তাঘাটে জনসম্মুখে বা আমজনতার মধ্যে তাঁদের চলাফেরা ছিল না। প্রায় সব সময় তাঁরা রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদে নিজেদের সুসজ্জিত রাখতেন। চোখ ধাঁধানো থাকতো তাঁদের জমকালো পোশাক। সাধারণত হাতি বা অশ্বারোহণ করেই তাঁরা চলাফেরা করতেন। তবে বাহন হিসেবে মাঝেমধ্যে পালকিও ব্যবহৃত হতো। তাঁরা বাইরে কোথাও গেলে সঙ্গে একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়োজিত রাখতেন। সাধারণত দরবারের বাইরে গমনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে একদল অনুচর পথের লোকজন সরিয়ে দিতে দিতে এবং ময়ূরপুচ্ছ সহযোগে মশা-মাছি-ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতেন। দুই পাশে নিয়োজিত থাকতো দুই দল ভৃত্য। এদের কেউ পিকদানি, কেউ পানীয় জল, কেউ হিসাবের খাতা ইত্যাদি বহন করতো। প্রত্যেক আমিরকে প্রতিদিন দু'বার রাজদরবারে হাজিরা দিতে হতো। প্রথমবার বেলা দশটা-এগারোটায় অর্থাৎ বাদশাহ যখন বিচারকার্য পরিচালনার জন্য *দিওয়ান-ই-আম* -এর সিংহাসনে উপবিষ্ট হতেন। আর দ্বিতীয়বার সন্ধ্যাকালে। প্রত্যেক আমিরকে সপ্তাহে অন্তত পূর্ণ একদিন (২৪ ঘন্টা) পালাক্রমে দুর্গ পাহারার কাজে নিয়োজিত থাকতে হতো।[১]

মুঘল বাদশাহগণের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্ভাবিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম হলো অভিজাত শ্রেণির সংগঠন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার রূপায়ন, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তব্য সম্পাদন, সামাজিক মান ও মাপকাঠি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা এবং সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত অনেকাংশে এই প্রতিষ্ঠানটির যথাযোগ্য কর্তব্য সম্পাদনের ওপর নির্ভর করতো।[২]

অভিজাত শ্রেণিতে যথেষ্ট আয়ের পাশাপাশি ব্যয়ও ছিল অধিক, জায়গিরভোগীদের বাড়তি উপার্জনের সুযোগ থাকায় তাঁর প্রচুর উপার্জন করতেন। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের লেখা থেকে আরও জানা যায়, তিনি লিখেছেন-

> অধিক আয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমিরদের মধ্যে ধনী ব্যক্তি খুব অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অধিকংশই দেনার দায়ে জর্জরিত। ইউরোপীয় লর্ড বা ডিউকদের মতো তাঁরা যে নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য এরূপ দুরাবস্থায় উপনীত হন, তা নয়। অধিকাংশ আমীরের শোচনীয় দুর্দশার কারণ হলো, বছরে একাধিক উৎসব-পার্বণে বাদশাহকে তাঁদের উপঢৌকন দিতে হয়। এতে বেশ মোটা অংকের টাকা ব্যয় হতো, তাছাড়া অধিকাংশ আমিরের একাধিক স্ত্রী, সহচর-ভৃত্য এবং গৃহপালিত প্রাণি উট, ঘোড়া ইত্যাদি প্রতিপালন বাবদ ব্যাপক খরচ সামলাতে হয়। উল্লিখিত এই দুটি

---

[১] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[২] সতীশ চন্দ্র, *মোগল দরবারে দল ও রাজনীতি ১৭০৭-১৭৪০*, কলকাতা: কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৮, পৃ. ১

কারণে তাঁরা বেকায়দায় পড়েন। আমিরদের মৃত্যুর পর বাদশাহগণ তাঁদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতেন। এই কারণে জীবদ্দশায় খরচের ব্যাপারে আমিরগণ উদার ছিলেন।[১]

মুঘল সমাজে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্রপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়; ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ-ত্রুটি সাধারণত অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল।[২] মধ্যবিত্ত সমাজে চিকিৎসক, বণিক, মহাজন, ব্যাংকার প্রভৃতি পেশাজীবীদের অবস্থান ছিল। তবে তাঁদের সংখ্যা ছিল অল্প এবং জীবনযাত্রার মানও ছিল সাধারণ।[৩] এছাড়া সাধারণ বা নিম্নশ্রেণিতে ছিল কৃষক, কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ভৃত্য, ক্রীতদাস প্রভৃতি পেশার মানুষ। দরিদ্ররা সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল খুবই দুর্দশাপূর্ণ। তবে এ কথা সত্য যে, ব্রিটিশ আমলের মতো অসহনীয় অবস্থায় তাঁরা ছিলেন না।[৪]

সাধারণ শ্রেণির লোকজন মিতাচারী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করবার পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। বাল্য-বিবাহ, পণ-প্রথা, কৌলিন্য-প্রথা, সতীদাহ প্রথা মুঘল আমলের সমাজজীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমকালীন ইউরোপীয় লেখকগণ তাঁদের লেখায় সমাজের কুসংস্কারগুলো উল্লেখ করেছেন। মুঘল সমাজে আমোদ-প্রমোদ, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, শিকার, দাবা (শতরঞ্জ), পোলো প্রভৃতির চর্চা ছিল। এছাড়া নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, তাঁদের শিল্প ও সাহিত্যচর্চা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণও বিরল নয়।[৫]

মুঘল সাম্রাজ্যের বিধানে বাদশাহের সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো। ফলে সকল আমির-ওমরাহগণ নিজেদের অবস্থানের উন্নতির জন্য বাদশাহের নেকনজরের প্রত্যাশী ছিলেন। বাদশাহ তাঁর অনুগতদের সম্মান ও অনুগ্রহ প্রদান করতেন।

মুঘলদের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা ছিল না। এ কারণে প্রায় সকল বাদশাহকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। সাবেক বাদশাহের পুত্রদের সঙ্গে কন্যাদের স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়ের সিংহাসন দাবি নিয়ে ষড়যন্ত্র

---

[১] বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[২] এ কে এম আবদুল আলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

[৪] বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

[৫] এ কে এম আবদুল আলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

করার অনেক নজির রয়েছে। তবে একবার সিংহাসন নিশ্চিত হওয়ার পর আর মুশকিল থাকে না। সবাই 'বাদশাহ সালামত' বলে নতুন বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করে নেন।[১]

মুঘল সাম্রাজ্যের আয়ের বিবিধ উৎস ছিল। এর মধ্যে খম্‌স, জিজিয়া ও জাকাত রয়েছে। এর অতিরিক্ত সাম্রাজ্যের পেশকশ[২], নজর, জরিমাস-শুল্ক, সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত, উত্তরাধিকার, খাদ্য, সামগ্রিক নির্মাণ কার্য ও বাগিচা, মৎস্যপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি, টাকশাল প্রভৃতি উৎস থেকেও আয় হতো। কিন্তু সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ও তার অস্তিত্বের ভিত্তি ভূ-রাজস্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল।[৩]

মুঘল শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, তাঁরা পুরো সমাজকে তাঁদের সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিলেন। মুঘল শাসন পদ্ধতি ছিল বস্তুত ভারতীয় কাঠামোতে ফারসি-আরবীয় শাসনপদ্ধতির সাবলীল সংমিশ্রণ।[৪] স্থানীয় জনগণ ও পরিবেশের প্রয়োজন বিবেচনাপ্রসূত মুঘলগণ তাঁদের শাসনব্যবস্থা রূপান্তরিত করেছিলেন। জীবনদর্শন, খানা-দানা, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদিতে মুঘলগণ স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করেছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল উন্নতি ও অভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থার কারণে মুঘলযুগের অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। ধর্মীয় সহিষ্ণুতাও মুঘলদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।[৫] মুঘল সরকারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ। মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালীতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বাদশাহগণ জনসাধারণের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কার্যে সমান গুরুত্ব দিতেন। এতে কোনো বিভেদনীতি ছিল না। মুঘল শাসনামলে সমাজের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণির জনগণ আইনের চোখে সমান ছিল।[৬]

আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অবদানের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও শুরু হয় বস্তুত মুঘল আমল থেকে। ব্যাপকভাবে শিল্পকলার চর্চা ও প্রসার ঘটে। শিল্পকলায় মানবিক মূল্যবোধ, আবেগ ও উন্নততর রুচির প্রতিফলন হতে থাকে।[৭] ভারতবর্ষে মুঘলদের পরিচর্যায় গড়ে ওঠে একটি দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সমৃদ্ধি লাভ করে। তবে শুধু এসব বিষয় মূল্যায়ন করে মুঘলদেরকে সাম্রাজ্য বিস্তার ও রাজ্য শাসনের নিরেট গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা অযৌক্তিক বলে

---

[১] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[২] 'পেশকশ' শব্দটি উর্দু ও হিন্দি ভাষায় বহুল ব্যবহৃত। পেশকশ বলতে জমিদার তথা রাজাদের দ্বারা মুঘল বাদশাহকে প্রদত্ত উপহার তথা বার্ষিক করকে বোঝানো হয়েছে।

[৩] হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

[৪] J. N. Sarkar, *Mughal Administration,* London: Forgotten Books, 1920, p. 6

[৫] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৬] এ কে এম আবদুল আলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[৭] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

বিবেচিত হবে। মুঘল চরিত্রের দ্বিতীয় একটি বলিষ্ঠ ধারাও এই উপমহাদেশে ক্রমে বিকশিত ও সমুজ্জল হতে তাকে। তা হচ্ছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুঘলদের নানামুখী অবদান। এই সাংস্কৃতিক বৈভবের আকর্ষণে বহু বিদেশি পর্যটক ও বণিক মুঘল আমলে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। মুঘল রাজদরবার ও বাদশাহি মহলের অন্তঃপুরের অভ্যন্তরেই ছিল সংস্কৃতি চর্চার চারণক্ষেত্র। সেখানে মুঘল মহিষী, শাহজাদীদের অনেকেই ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি গভীর আগ্রহী। তাঁদের মধ্যে অনেকে জীবনীকার, কবি ও চিত্রশিল্পী রূপে খ্যাতিমান ছিলেন। বাদশাহ আকবর শিল্পকলা চর্চা ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং এক্ষেত্রে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি মুঘল রাজদরবারে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এবং ইউরোপ থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মুঘল দরবারে সংস্কৃতিবান ও নানা গুণসম্পন্ন অনেক অভিজাতদের কথাও জানা যায়। মুঘল বাদশাহগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং গুণী পণ্ডিত ও শিল্পীদের সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিবিধ ক্ষেত্রে মুঘল সাম্রাজ্য বিকশিত হয়।

ভারতবর্ষে মুঘল আমলের সূচনালগ্ন থেকেই উপমহাদেশের শিল্পকলায় একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়। মুঘলদের ঐকান্তিক পরিচর্যায় শিল্পকলার দুটি শাখায় অসামান্য বিকাশ লাভ করে। এর একটি স্থাপত্যশিল্প এবং অন্যটি চিত্রকলা। এছাড়া মুঘলদের উদ্যান রচনাকেও শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বাদশাহ বাবুর প্রাসাদের চারদিকে মনোমুগ্ধকর বাগান নির্মাণের রীতি চালু করেন। পরবর্তী বাদশাহগণও বাবুরের এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন।[১]

মুঘল শাসনের অবসান হলেও মুঘল শব্দটি আভিজাত্য, জাঁকজমক ও বিশালত্বের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যয়বহুল, সম্পদশালী ও অসাধারণ কোনো কিছুর সঙ্গে বর্তমানে 'মুঘলাই' তকমা এঁটে দেয়া হয়।[২]

২.৩ মুঘল চিত্রকলার স্বরূপ

ইসলামী চিত্রকলার ইতিহাসে মিনিয়েচর পেইন্টিং (Miniature) বা ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রের উন্মেষ ও বিকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ল্যাটিন শব্দ 'মিনিয়াম' থেকে 'মিনিয়েচর' শব্দের উৎপত্তি। 'মিনিয়াম' শব্দের বাংলা অর্থ লাল মেটে সিঁদুর। মধ্যযুগে ইউরোপে লাল মেটে সিঁদুর দিয়ে পুস্তক বা চিত্রিত পুঁথিতে রঙিন সীমারেখা (border decoration) অঙ্কিত হতো। হাতে লিখিত পুস্তক বা পুঁথির অভ্যন্তরে স্বল্প পরিসরে যে ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র বা অনুচিত্র (miniature) অঙ্কিত হতো, তাকে মিনিয়েচর চিত্র হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য চিত্রকলায় মিনিয়েচর চিত্রের উদ্ভব হয় ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট লিপিবদ্ধ হবার পর। উপর্যুক্ত ধর্মগ্রন্থগুলোর ঐশ্বরিক মহিমা এবং

---

[১] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

[২] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

যিশুর প্রচারকার্য প্রসারের জন্য ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টিয় সাধুমন্ত ও রাজন্যবর্গ Acts of the Apostles (যিশুর দ্বাদশ শিষ্যের প্রচারকার্যের বিবরণ) এবং Apocrypha (ওল্ড টেস্টামেন্টের বিবরণের বাহিরে যিশুর ঘটনাবলী) চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে উপস্থাপন করার আদেশ জারি করতেন।[১]

মুঘল চিত্রকলাকে সাধারণত মিনিয়েচর বা ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র (Mughal Miniature) হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া অণুচিত্রও বলা হয়ে থাকে। এর কারণ মুঘল চিত্রকলা মূলত পুঁথিচিত্রণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২] পনের শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকদের দরবারে পুঁথিচিত্রণ বা চিত্রিত গ্রন্থের মাধ্যমে মুঘল চিত্রকলার প্রচলন হয়।[৩] ভারতবর্ষের চিত্রকলার পরিচয় দু'টি ভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়। প্রথমত বৌদ্ধ ফ্রেস্কো (fresco)[৪] এবং মধ্যযুগের মিনিয়েচর।[৫] ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র বা মিনিয়েচর প্রধানত দুপ্রকার, যথা- রাজপুত ও মুঘল। রাজপুত চিত্রের উৎপত্তি হিন্দু রাজপুত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আর মুঘল চিত্রের উন্মেষ মুসলমান মুঘল বাদশাহগণের রাজ দরবারে।[৬] যেহেতু মুঘল চিত্রকলার জন্ম রাজদরবারে, সেহেতু এই বিশেষ শৈলীর অন্তর্গত প্রতিটি চিত্রকর্ম নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের নিদর্শন। কারণ প্রতিটি চিত্রকর্ম রচনার বা উৎপাদনের একদিকে ছিলেন বিশেষ একজন ব্যক্তি, যিনি রং-তুলি ও কাগজের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। অর্থাৎ তিনিই পৃষ্ঠপোষক বা Patron। অন্যদিকে শিল্পী তাঁর শ্রম ও মেধা বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি করতেন মূল্যবান চিত্রকর্ম।[৭]

মুঘল প্রাসাদের যে নির্দিষ্ট স্থানে চিত্রকরদের জন্য কাজের জায়গা নির্ধারিত ছিল, তাকে বলা হতো কারখানা। পরবর্তীকালে বাদশাহ আকবর এটিকে 'সুরৎখানা' নামকরণ করেন। সুরৎখানা সাধারণত কুতুবখানার পাশে স্থাপিত হতো। চিত্রশালা বা সুরৎখানা এবং কুতুবখানা বা পাঠাগার মুঘল

---

[১] নাজমা খান মজলিশ, 'মুসলিম মিনিয়েচার চিত্র: একটি রূপরেখা', *অরণি* স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৩ (সম্পা. নাজমা খান মজলিশ), ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, ২০১৪, পৃ. ৩৭; J. M. Rodgers, *Mughal Miniature,* London: The British Museum Press (2nd ed.), 1993, p. 16

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরূপ: মুঘল চিত্রকলা*, কলকাতা: থীমা, ১৯৯৯, পৃ. ৯

[৩] Som Prakash Verma, *Mughal Painting,* New Delhi: Oxford University Press, 2014, p. XVII

[৪] ফ্রেস্কো বস্তুত দেয়ালচিত্রের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি দুরকম। যথা- Fresco Secco ও Fresco Buon বা True। প্রথমটি অর্থাৎ সেকো দেয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে শুকনো দেয়ালে রং, আঠা এবং জল মিশিয়ে চিত্রাঙ্কন করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি বুঅন বা খাঁটি দেয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে কাঁচা পলেস্তরার ওপর চিত্রাঙ্কন করা হয়। ইতালিতে রেনেসাঁর সময় ফ্রেস্কো চিত্ররীতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদে মিকেলাঞ্জেলোর অঙ্কিত চিত্রকর্মগুলো এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

[৫] Percy Brown, *Indian Paintings Under the Mughals,* New Delhi: Cosmo Publications, 2007, p. 17

[৬] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, পৃ. ৮৯

[৭] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

বাদশাহগণের সংস্কৃতিসম্পন্ন উন্নত মানসিকতার পরিচয় বহন করে।[১] সুরৎখানায় সৃষ্টি হতো মুঘল চিত্রকর্ম। ঠিক একইভাবে অন্যান্য কারখানায় প্রস্তুত হতো বাদশাহগণের রাজোচিত জীবনযাত্রার নিত্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। যেমন- পোশাক-পরিচ্ছদ, রত্ন-অলংকার ও যুদ্ধের অস্ত্র তৈরির জন্য বাদশাহগণের নিজস্ব কারখানা ছিল। বিবিধ কারখানায় উৎপন্ন এইসব জিনিসপত্রের মতো চিত্রকর্মেও স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পীর যুগ্ম চাহিদা। এ জন্য এই চিত্ররীতি 'দরবারি মুঘল চিত্র' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।[২]

বাদশাহ আকবরের আমলেই শিল্পী মীর সৈয়দ আলীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় 'হাম্‌জানামা' চিত্রায়নের জন্য। পঞ্চাশজনেরও বেশি শিল্পী এই পুঁথিচিত্রণে নিযুক্ত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। প্রায় চার খণ্ড শেষ হবার পর মীর সৈয়দ আলী মক্কায় পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তিনি আর ফিরে এসেছিলেন কিনা জানা যায়নি।[৩] পারস্য চিত্রশৈলীর অনুসরণে ভারতবর্ষে মুঘলদের যে চিত্ররীতি গড়ে ওঠে, প্রকৃত অর্থেই তা একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিমান ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাক-মুঘল যুগে মুসলিম চিত্রকলার উদাহরণ অপ্রতুল এবং তা শুধুমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সুলতানি আমলে চিত্রকলা চর্চা হয়েছিল যৎসামান্য। সুলতানি চিত্রকলা আব্বাসীয় আমলের মেসোপটেমীয় চিত্রকলার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। মুঘল বাদশাহগণ পারসিক চিত্ররীতির আদর্শে ভারতবর্ষে মুঘল চিত্রকলার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত, মুঘল রাজদরবারকে কেন্দ্র করে যে চিত্রকলার উন্মেষ হয়, তাকেই মুঘল চিত্রকলা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৪]

২.৪ মুঘল চিত্রকলা উন্মেষের প্রেক্ষাপট

বাদশাহ হুমায়ূন মুঘল চিত্রকলার সূচনা করেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থ থেকে অধ্যাপক রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় একটি চমৎকার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। হুমায়ূন একদিন যুদ্ধযাত্রার বিরতিতে তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঠিক সে সময় তাঁবুর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে একটি মনোমুগ্ধকর পাখি, হরেক রকম রঙের ডানাযুক্ত ছিল সেই পাখি। হুমায়ূন পাখিটির রূপে মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠান তাঁর অনুচর চিত্রকরকে। পাখিটির চিত্র অঙ্কনের জন্য চিত্রকরকে হুকুম দেওয়া হয়। প্রকৃতির প্রতি হুমায়ূনের যেরূপ অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা, তা তাঁর পিতা বাবুরের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। প্রায় একই রকম মনন

---

[১] কামাল উদ্দিন হোসেন, *রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৪ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ১১৪

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৩] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৪] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৩ (নবম মুদ্রণ), পৃ. ২৪৯

ও উৎসাহ দেখা গেছে জাহাঙ্গীরের মধ্যেও। প্রকৃতিকে নিখুঁত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দৃষ্টিসুখকর চিত্র রচনা করাই ছিল মুঘল শিল্পীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষক বাদশাহগণের প্রধান দাবি। প্রকৃত অর্থে অঙ্কিত এই চিত্রকর্মগুলো পৃষ্ঠপোষকের কাছে দৃশ্যজগতের বিশেষ দলিল হিসাবে বিবেচিত হতো। এই বিবেচনা তাঁদের এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জ্ঞান ও বোধকে সমৃদ্ধ করেছে।[১] এখানে উল্লেখ্য যে, ফতেহপুর সিক্রি এবং লাহোরের প্রাচীরে অঙ্কিত ফ্রেস্কো ছাড়া ভারতবর্ষে মুসলিম চিত্রকলার যা কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা সবই ছোট আকারের চিত্রকম। ইংরেজিতে এ ধরনের চিত্রকর্মকে বলা হয় 'মিনিয়েচর'। এসব চিত্র দূরে বা উঁচুতে প্রাসাদের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেখার জন্য অঙ্কিত হয়নি। বস্তুত এগুলো হাতে ধরে, গভীর অনুভবে চোখের কাছে এনে, অথবা কোলে পেতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যথাযথ নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে অঙ্কিত হয়েছে। ঠিক যেমন চোখের কাছে ধরে পুঁথি পড়তে হয়। ফলত, মিনিয়েচর চিত্রকর্ম তুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজে পূর্ণতা পেয়েছে।[২]

মুঘলদের পূর্বে ভারতবর্ষে যাঁরা মুসলমান শাসক হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা বস্তুত আফগানিস্তান থেকে আসা মানুষ। আফগানিস্তানের বংশোদ্ভূত বিভিন্ন গোত্রের মানুষ ছিলেন তাঁরা।[৩] কিন্তু বাবুর ভারতবর্ষে এসেছিলেন মধ্য এশিয়ার ফারগানা থেকে।[৪] পিতৃত্বের দিক থেকে বাবুরের পূর্বপুরুষ ছিলেন চাঘতাই-তুর্কী এবং মাতৃত্বের দিক থেকে মোঙ্গল বংশোদ্ভূত।[৫] মোঙ্গল ও তুর্কী বংশীয় সুলতানগণ একদিকে যেমন সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে রাজ্য স্থাপন এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, ঠিক তেমনি সমগ্র মধ্য এশিয়ার পূর্ব সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিবান শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মোঙ্গল এবং তুর্কী সংস্কৃতির মাধ্যমে বিকশিত এই ধারাকে বাবুর নতুন আঙ্গিকে ভারতবর্ষে চালু করেছিলেন। বাবুর ভারতবর্ষের জলবায়ু ও জনগণ নিয়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তাঁকে ভারতবর্ষ আপন ভূখণ্ডরূপে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বাবুর তাঁর পিতৃপুরুষের সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির মিশ্রণে একটি উন্নততর নতুন সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশে প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন।[৬] বাবুর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[২] অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০ (পঞ্চম মুদ্রণ), পৃ. ১০৭

[৩] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[৪] Jeremiah, P. Losty, *op. cit.,* p. 74

[৫] Percy Brown, *op. cit.,* p. 50

[৬] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

মৃত্যুবরণ করেন। এই অল্পকালের মধ্যে তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। বাবুর শুধু একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি নানা বিদ্যায় ভূষিত ছিলেন। তিনি একাধারে বিদ্বান, কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁর ওয়াকাই (Waqa'i) বা আত্মচরিত *বাবুরনামা* তুর্কী ভাষায় লেখা হয়েছে। এটি সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে একটি অনন্য সাধারণ গ্রন্থ।[১] মূল তুর্কী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি বাবুরের পৌত্র আকবরের আমলে ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে স্মৃতি সাহিত্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[২] বাবুর তুর্কী ভাষায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। তুর্কী কবিতায় তাঁর স্থান ছিল অদ্বিতীয়। এসব গুণ ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শিকারী ও ভ্রমণকারী। গভীর অনুভবে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। উদ্যান ও ফুল বিশেষ ভালোবাসতেন। বলা যায়, তিনি একজন শিল্পী ছিলেন। "Babur stands out in his relief as one the most remarkable men Asia has ever produced".[৩] রাজধানী আগ্রায় ১৫২৮-১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী ভাষায় রচিত বাবুরের একটি *দিওয়ান* পাণ্ডুলিপি বর্তমানে রামপুর লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[৪]

শিল্পকলার প্রতি বাবুরের গভীর অনুরাগ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে আগ্রায় নির্মিত তাঁর বাগানবাড়ির কয়েকটি প্যাভিলিয়নের ধ্বংসাবশেষ থেকে। পারসিক ও ভারতীয় শৈলীর মিশ্রণে এগুলো নির্মিত হয়েছিল। সাহিত্য ও শিল্পানুরাগের প্রেক্ষিতে অনুমেয় যে, বাবুর চিত্রকলার প্রতিও উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু মাত্র চার বছরের রাজত্বকালে, রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কঠিন সময়ের মধ্যে, তিনি চিত্রকলার ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রেখেছিলেন তা বলা মুশকিল। যেহেতু বাবুরের আমলের কোনো চিত্রকলা ফ্রেস্কো ও পাণ্ডুলিপিতে বর্তমানে নেই, তাই ধরে নেয়া হয় সময়ের অভাবে তিনি এই শিল্পে মনোনিবেশ করতে পারেননি। তবে বাবুরের পুত্র পরবর্তী বাদশাহ হুমায়ূনের চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ থেকে অনুমান করা যায়, পিতৃসূত্রেই সম্ভবত তিনি এই জ্ঞান এবং শিল্পানুরাগ লাভ করেছিলেন।[৫]

২.৫ মুঘল চিত্রকলায় হুমায়ূনের ভূমিকা

১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ বাবুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ূন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দশ বছর রাজত্ব করার পর ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে আফগান শের শাহের নিকট পরাজিত হলে হুমায়ূন পারস্যের সাফাভী সুলতান শাহ তাহ্মাস্পের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পারস্যে থাকাকালীন তিনি পারস্য চিত্রকলার উজ্জ্বলতম ধারা সাফাভী চিত্রকলার প্রতি গভীর অনুরাগী হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত সমৃদ্ধ

---

[১] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[২] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[৩] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[৪] Jeremiah, P. Losty, *op. cit.,* p. 74

[৫] এ বি হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

ও উন্নততর পারস্যরীতি ও শিল্প কৌশলের প্রতি আকৃষ্ট হন হুমায়ূন। ইস্পাহানের 'চেহেল সুতুন' প্রাসাদের দেয়ালচিত্রে হুমায়ূন এবং শাহ্ তাহ্মাস্পের একটি দরবার দৃশ্য রয়েছে। হুমায়ূন তাব্রিজের শিল্প পরিবেশে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন।[১]

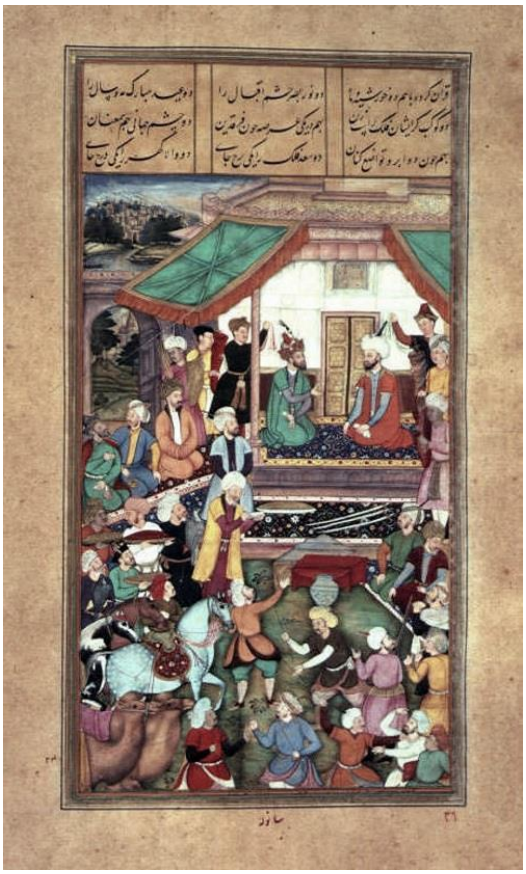

আলোকচিত্র ২.৩: শাহ্ তাহ্মাস্পের দরবারে হুমায়ূন

সূত্র: www.mughalempire.com

এখানেই বিহ্জাদীয় স্কুলের দুজন অসামান্য প্রতিভাবান চিত্রকর মীর সৈয়দ আলী ও আবদুস সামাদের সঙ্গে হুমায়ূনের পরিচয় ও সখ্যতা গড়ে ওঠে। ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ূন শাহ তাহ্মাস্পের সহযোগিতায় কান্দাহার দখল করেন। তারপর এগিয়ে যান কাবুলের দিকে এবং এখানে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কাবুলে থাকাকালেই তাঁর চিত্রকারখানার কাজ শুরু হয়। ১৫৪৬ খ্রিষ্টাদে হুমায়ূন পূর্বোক্ত দুই পারসিক শিল্পীকে কাবুলে আগমনের জন্য আহ্বান জানান। তবে তাঁরা কাবুলে এসে পৌঁছেন ১৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দে।[২] হুমায়ূনের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বপ্রথম মীর সৈয়দ আলী রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীসম্বলিত গ্রন্থ *দাস্তান-ই-আমির হামজা*'র চিত্রাঙ্কন শুরু করেন। আমির হামজার 'দাস্তান' পাণ্ডুলিপি চিত্রাবলীর মাধ্যমে মুঘল

[১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুঘল চিত্রকলা*, ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৪, পৃ. ১৮-১৯

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

চিত্রকলার উন্মেষ হয়।[১] এখানে উল্লেখ্য যে, ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে শাহ তাহ্মাস্পের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর চিন্তাধারা ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আসে, তিনি চিত্রকলায় উৎসাহ ফেলেন এবং নিজেকে শিল্প থেকে দূরে সরিয়ে নেন।[২] এর ফলে ভবিষ্যত মুঘল বাদশাহ হুমায়ূনের জন্য এক বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। শাহ তাহ্মাস্প চিত্রকলায় উৎসাহ হারানোর ফলে চিত্রশিল্পীদের মাঝে গভীর হতাশা ও বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।

এর ফলশ্রুতিতে শিল্পীদের মাঝে এক অভিবাসন স্পৃহা জেগে ওঠে। এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনেক শিল্পী তাহ্মাস্পের দরবার ছেড়ে প্রতিষ্ঠিত উসমানীয় দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেউ চলে যান প্রাদেশিক শহর মাশহাদে, কেউ সদ্য প্রতিষ্ঠিত উজবেক রাজধানী বোখারায়। এরই ধারাবাহিকতায় কেউ এসেছিলেন হুমায়ূনের দরবার কাবুলে।

তাহ্মাস্পের রাজধানী তাব্রিজ থেকে কাবুলে হুমায়ূনের দরবারে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিল্পী মীর মুসাব্বিরের পুত্র মীর সৈয়দ আলী অন্যতম। উল্লেখ্য, মীর সৈয়দ আলী তখন থেকেই নামের শেষে 'তাব্রিজি' পদবী ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ মীর সৈয়দ আলী তাব্রিজি, 'তাব্রিজি' পদবীটা মর্যাদাপূর্ণ অভিধার একটি উৎকৃষ্টতম উদাহরণ। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন সিরাজ থেকে আগত অন্য এক খ্যাতিমান শিল্পী খাজা আবদুস সামাদ বা পদবী সহযোগে আবদুস সামাদ সিরাজি। তাব্রিজ এবং সিরাজ ঘরানার এই দুই চিত্রশিল্পীই মুঘল চিত্রকলার পথিকৃৎ। তাঁরাই মুঘল চিত্রকলার ঐতিহাসিক রূপকার।[৩] শের শাহের আকস্মিক মৃত্যুর পর হুমায়ূন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।[৪] প্রায় পনেরো বছরের নির্বাসন জীবন অতিবাহিত করার পর ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ হুমায়ূন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। উল্লেখ্য, হুমায়ূনের সঙ্গে শিল্পী মীর সৈয়দ আলী ও শিল্পী আবদুস সামাদ কাবুল থেকে ভারতে চলে আসেন। হুমায়ূনের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এই দুই শিল্পীর অসামান্য মেধা ও পরিশ্রমের ফলে মুঘল চিত্রকলার গোড়াপত্তন হয়।

১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ূন ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লিতে শের শাহ কর্তৃক নির্মিত পুরাতন কেল্লায় রাজধানী স্থাপন করেন। পুরনো কেল্লার প্রাচীর এবং প্রাচীন কিছু ইমারত আজও শের শাহ ও হুমায়ূনের গৌরবগাথার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। দিল্লিতে ফিরে হুমায়ূন বেশি দিন বেঁচে ছিলেন না। প্রত্যাবর্তনের বছরে অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে হুমায়ূন তাঁর নির্মিত গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে নামার সময় পা পিছলে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মুঘল চিত্রকলায় ব্যাপক অবদান রাখা বা মুঘল চিত্রকলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হুমায়ূনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হুমায়ূনের

---

[১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[২] Jeremiah, P. Losty, *op. cit.,* p. 75

[৩] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬; Jeremiah, P. Losty, *op. cit.,* p. 75

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

অসামান্য ও ঐতিহাসিক অবদান হলো, প্রকৃত অর্থেই মুঘল চিত্রকলার স্বপ্নদর্শনে ও ভিত্তি স্থাপনে। হুমায়ূন নির্মিত ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই পরবর্তীকালে মুঘল চিত্রকলা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে এবং ইসলামী চিত্রকলার ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

হুমায়ূনের চিত্রকরদের অঙ্কিত প্রথম চিত্র হলো "তৈমুর বংশীয় শাহাজাদাগণ" বা Princes of the House of Taimur।[২] অনুমান করা হয় এটি আবদুস সামাদ অঙ্কিত চিত্র।[৩] বৃহদাকার এই চিত্রটি কাপড়ের ওপর অঙ্কিত হয়েছিল। ধারণা করা হয় এটি হুমায়ূনের কাবুলের দরবারে অঙ্কিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি চিত্রটি নিয়ে আসেন। বর্তমানে চিত্রটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ হুমায়ূন মীর সৈয়দ আলীকে পারসিক পুঁথি 'দাস্তান' (Dastan-i-Amir-Hamzah) চিত্রাঙ্কনের জন্য নিযুক্ত করেন। এটি শিল্পীর এক অমর কীর্তি। বারোটি খণ্ডে এই চিত্রাঙ্কন সমাপ্ত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল, প্রতিটি খণ্ড একশত সংখ্যক বিভাগ বা ফোলিও এবং প্রতিটি বিভাগে একটি চিত্রকর্ম থাকার কথা। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হলে ১২০০ চিত্রকর্ম দ্বারা গ্রন্থটি শোভিত হতো। পুস্তকের প্রতিটি পৃষ্ঠার মাপ ছিল ২২″ × ২৮.২৫″। বলা যায়, মিনিয়েচরের ক্ষেত্রে এই পরিমাপ অস্বাভাবিক বড় আকারের। চিত্রকর্মগুলো কাপড়ের ওপর অঙ্কিত হয়েছে। কারণ তখন এই পরিমাপের উৎকৃষ্ট কাগজ ভারতবর্ষে পাওয়া যেতো না। সাত বছর কাজ করার পর মোট চারটি গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছিল। প্রতিটি পত্র সম্পাদন করতে সাত দিন সময় ব্যয় হতো। এতে মীর সৈয়দ আলীর সঙ্গে আবদুস সামাদও কাজ করেছেন। এছাড়া পারস্য ও ভারতের অন্যান্য শিল্পীরা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন। মীর সৈয়দ আলীর এই শ্রেষ্ঠতম কাজের নমুনা ইউরোপের বিভিন্ন বিখ্যাত জাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে। ভিয়েনার Industrial Museum, লন্ডনের Victoria and Albert Museum এবং South Kensington Museum-এ এর নিদর্শন রয়েছে।[৪]

মুঘল চিত্রকলার ইতিহাসকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়।[৫] যথা-

১) প্রাথমিক যুগ অর্থাৎ ইন্দো-পারস্য পর্যায়

২) স্বর্ণযুগ অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ মুঘল চিত্রশিল্পের পর্যায় এবং

৩) অবক্ষয়ের যুগ

---

[১] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[২] Jeremiah, P. Losty, *op. cit.,* p. 75

[৩] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[৪] Percy Brown, *op. cit.,* p. 54

[৫] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ২৯১

ঐতিহাসিক পটভূমির আলোকে এ কথা সত্য যে, মুঘল চিত্রকলার উন্মেষ ও প্রাথমিক যুগের সূচনা হয় হুমায়ূনের পৃষ্ঠপোষকতায়। তিনি ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাসন জীবন অতিবাহিত করে পারস্যের শিল্পী মীর সৈয়দ আলী ও আব্দুস সামাদকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় মুঘল চিত্রকলায় পারসিক চিত্ররীতির ব্যাপক প্রভাব ছিল। এজন্য প্রাথমিক যুগের চিত্রকর্মসমূহ 'ইন্দো-পারস্য স্কুল' এর কাজ হিসাবে বিবেচিত। মুঘল চিত্রকলার প্রথম পর্যায়ের সূচনা হুমায়ূনের রাজত্বে হলেও, আকবরের দূরদর্শিতা এবং একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রশিল্পের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১] আকবর ছিলেন মুঘল চিত্রকলার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) মুঘল চিত্রকলার ব্যাপক উন্নতি হয়। আকবরের রাজত্বের অবসানে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে মুঘল চিত্রকলা উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তিনি চিত্রকলার প্রকৃত সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলা ভারতীয় ও পারসিক চিত্ররীতির প্রভাব এবং উপাদানের সংমিশ্রণে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুঘল চিত্ররীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য জাহাঙ্গীরের আমলকে মুঘল চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শাহজাহানের দরবারে চিত্রকলার চেয়ে স্থাপত্য শিল্প অধিক গুরুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বলাই বাহুল্য, শাহজাহান অকুণ্ঠচিত্তে স্থাপত্যের জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন। এ কারণে তাঁর রাজত্বে মুঘল চিত্রকলার বিকাশ থেমে যায়।[২] প্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রতি আওরঙ্গজেবের বৈরী মনোভাব মুঘল চিত্রশিল্পের অবক্ষয় ত্বরান্বিত করে। তাঁর আমলে চিত্রকলা অত্যন্ত কম পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। আওরঙ্গজেবের পরেই দুর্বল মুঘল বাদশাহের রাজত্বে চিত্রকলার অবসান হয়।[৩]

প্রখ্যাত মুঘল চিত্রকলা বিশারদ ও লেখক সোম প্রকাশ ভার্মার গবেষণালব্ধ সারণি থেকে মুঘল চিত্রকলা চর্চার উত্থান থেকে অবক্ষয় পর্ব পর্যন্ত সময়কালের একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য মুঘল চিত্রকলার ইতিহাসে ৩২৭ জন চিত্রশিল্পীর মধ্যে ২৬০ জনই ছিলেন বাদশাহ আকবরের চিত্রশালায়।[৪]

---

[১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

[২] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[৩] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

[৪] Som Prakash Verma, *op. cit.,* p. 13

রাজত্বকাল (১৫২৬-১৭০৭ খ্রি.)	চিত্রশিল্পীর সংখ্যা	
	হিন্দু	মুসলমান
বাবুর (১৫২৬- ১৫৩০)	-	-
হুমায়ূন (১৫৩০- ৩৯; ১৫৫০-৫৬)	-	৬
আকবর (১৫৫৬- ১৬০৫)	১৪৫	১১৫
জাহাঙ্গীর (১৬০৫- ১৬২৭)	৪৩	৪১
শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮)	১৭	১৮
আওরঙ্গজেব (১৬৫৯- ১৭০৭)	৮	৪

সারণি- ১

উৎস: Som Prakash Verma, *Mughal Painting,* New Delhi: Oxford University Press, p. 13

চিত্রশিল্পীর মোট সংখ্যায় লক্ষ করা যায় যে, আকবরের চিত্রশালায় সবথেকে বেশি সংখ্যক শিল্পী কাজ করতেন। জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় শিল্পী ছিল আকবরের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক। মুঘল চিত্রকলার অবক্ষয়ের শুরু হয় বস্তুত শাহজাহানের রাজত্বকাল থেকে। আকবরের রাজত্বে মুঘল চিত্রকলা চর্চার প্রকৃত প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়। চিত্রশালায় বিভিন্ন ধর্মের শিল্পীরা কাজ করতেন। বলাই বাহুল্য, আকবরের চিত্রশালায় সর্বোচ্চ সংখ্যক শিল্পী কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আকবরের রাজত্বকাল শেষ হলে চিত্রকলায় বিশেষায়িত শাখা গুরুত্ব লাভ করে। জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল চিত্রকলা একটি স্বতন্ত্র শৈলী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় কল্পনা প্রসূত চিত্র ও প্রতিকৃতি চিত্রের ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া ফুল ও লতা-পাতাধর্মী (*Flora* and *Fauna*) চিত্রেরও অসামান্য উন্নতি হয়।

জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় কোনো মধ্যম মানের শিল্পী ও কম দক্ষ শিল্পীর কাজের সুযোগ ছিল না। ফলত অনেক শিল্পী দরবারি চিত্রশালার বাইরে কাজ করতেন। সাধারণ জনগণের মাঝে সেসব শিল্পীরা দরবারি চিত্রকলার পাশাপশি একটি জনপ্রিয় বা বাজারের চাহিদা মোতাবেক চিত্রশৈলী নির্মাণ করেন। বলা যায়, এটি ছিল মুঘল চিত্রকলার অনুন্নত সংস্করণ। শাহজাহানের রাজত্বকালে স্থাপত্যকলা সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। ফলে চিত্রকলা চর্চা হ্রাস পেতে থাকে। এই সময় অনেক শিল্পী দরবার ছেড়ে চলে যায়। শাহজাহানের আমলে পাণ্ডুলিপি চিত্রের চেয়ে মুরাক্কা (অ্যালবাম বা একক চিত্র) বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এক্ষেত্রে প্রতিকৃতিচিত্র বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। আওরঙ্গজেবের প্রতিকৃতি চিত্রের প্রতি অনীহা মুঘল চিত্রকলার অবক্ষয়ের পথ তৈরি করে।[১]

[১] Som Prakash Verma, *op. cit.,* pp. 13-14

বাবুরের প্রচারধর্মী ও প্রভাবসৃষ্টিকারী শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং হুমায়ূনের যথাযথ দৃশ্যগ্রাহ্য দলিলের চাহিদা মুঘল দরবারি চিত্রকলার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। অবশ্য ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসনে চিত্রকলা চর্চার ব্যাপারে বিধি-নিষেধের কথা জানা যায়।[১]

২.৬ ইসলামে চিত্রকলা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা

প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামে যেসব শিল্পকলার চর্চা হতো, তার মধ্যে স্থাপত্য ও অনুপম লিপিকলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সময় সুনিপুণ ও সুবিন্যস্তভাবে যেসব স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে দামেস্কের জামি মসজিদ, জেরুজালেমের কুব্বাতুস সাখরা, ইবনে তুলূনের মসজিদ, কর্ডোভার মসজিদ প্রভৃতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মোজাইক ও বিবিধ প্রকারের অলঙ্করণ দ্বারা মসজিদগুলোকে সুশোভিত করা হয়েছে। এগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়নি। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.) মসজিদ নির্মাণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মসজিদ নির্মাণকে মহাপূণ্যের কর্ম হিসাবে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুন্দর হস্তলিখন শিল্পকে ইসলামে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। মহানবী (সা.) এর প্রতি প্রথম যে ওহি অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে কলমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুন্দর হস্তলিখনের জন্য মহানবী (সা.) তাঁর অনুসারীগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।[২] এ কারণে অনেক মুসলমান শাসক স্বহস্তে পবিত্র কুরআন লেখার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। যেমন: বাদশাহ আওরঙ্গজেব। ইসলামে শুরুতে লিপিকলা ও স্থাপত্য শিল্প প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে চিত্রকলার তেমন কোনো চর্চা হয়নি বলে জানা যায়। এজন্য কোনো মসজিদ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চিত্রের মাধ্যমে কোনো ধর্মীয় বা লৌকিক ঘটনা উপস্থাপনের প্রচেষ্টা হয়নি। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে চিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা ছিল।

ইসলামী আইন ও জীবনবিধানের প্রধান উৎস আল-কুরআনে চিত্রকলা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে কোনো আয়াতে বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কিত নির্দেশ জারির উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৩] অবশ্য আল-কুরআনের সূরা মায়িদাহ্'তে স্পষ্ট বলা হয়েছে-

> হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারির তীর এসব গর্হিত বিষয়। শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।[৪] (সূরা: ৫, আয়াত: ৯০)

এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'আনসাব'- মূর্তি শব্দের ব্যাখ্যায় আল-কুরআনের টীকাকারগণ যে কোনো প্রকারের প্রতিকৃতি (চিত্রকর্ম বা ভাস্কর্য) উপস্থাপন নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। চিত্রকলা দ্বারা

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[২] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, ঢাকা: ২০১৩, পৃ. ২১১-২১২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১২

[৪] *কুর'আনুল কারীম* (বাংলা তাফসীরসহ, অনুবাদ: প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান), রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০২, পৃ. ২৩২

দেয়ালচিত্র, ক্যানভাস বা কাগজে অঙ্কিত চিত্র বা যে কোনো সারফেসের ওপর অঙ্কিত প্রতিকৃতি উপস্থাপনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

আল হাদিস হচ্ছে ইসলামী আইন ও জীবনবিধানের দ্বিতীয় উৎস। এতে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। হাদিস থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নির্দেশনা পাই। মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ঘরে কোনো কুকুর, মূর্তি বা চিত্রকর্ম থাকে, সেই স্থানে আল্লাহ্‌র রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।" তিনি আরো বলেছেন: "কিয়ামতের দিনে যাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দেয়া হবে, তাদের মধ্যে নবীর হত্যাকারী, নবী কর্তৃক নিহত ব্যক্তি, মূর্তির কারিগর এবং চিত্রকর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।" চিত্রকরকে কিয়ামতের দিনে তার অঙ্কিত চিত্রে জীবন প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হবে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না। তখন অগ্নিকুন্ডে তাকে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ সৃষ্টির ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সংরক্ষিত। এই হাদিসসমূহ দ্বারা এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে চিত্রকলা চর্চা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।[১] ফলত, ইসলামী শিল্পে প্রথমে গড়ে ওঠে আলংকারিক লিপি, তারপর লিপিকে ঘিরে বিমূর্ত জ্যামিতিক নকশা। উল্লেখ্য, মুঘল দরবারি চিত্রকলা উন্মেষের অনেক আগেই মধ্য এশিয়ায় উন্নত চিত্রকলা চর্চা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্য সংস্কৃতিতে মূর্তি নির্মাণ যেভাবে সম্ভব হয়েছে, ইসলামী সংস্কৃতিতে তা কখনোই সম্ভব হয়নি। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইসলামী চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতে মুসলমান বাদশাহ্‌গণ কুণ্ঠিত হননি। সম্ভবত সৃজনশীল শিল্পসৃষ্টির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই এর প্রধান কারণ। মুসলিম চিত্রকলা শীর্ষক গ্রন্থ রচনায় অগ্রণী ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাকরিজী (জীবনকাল: ১৩৬৪-১৪৪২ খ্রিষ্টাব্দ)। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি বিলুপ্ত হলেও তাঁর অপর গ্রন্থ *আল-খিতাত* থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ফাতেমী খলিফা মুসতানসিরের (১০৩৫-৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) শিল্পানুরাগী মন্ত্রী ইয়াজুরী চারু ও কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ইয়াজুরী একবার মিশরীয় শিল্পী আল-কাসীরের সঙ্গে ইরাকী চিত্রকর ইবনে আজীজের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ইসলামী চিত্রকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মিরখন্দ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *খুলুসাত-আল-আকবার* এবং মিরখন্দের পৌত্র তাঁর রচনা *হাবিব আল-সিয়ার*-এ খ্যাতিমান মুসলমান চিত্রকরদের সম্বন্ধে বিশদ তথ্যমূলক বিবরণ দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, মুসলমান বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত চিত্রশিল্পের সমৃদ্ধি ও উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হওয়া অসম্ভব ছিল।[২]

মধ্য এশিয়ার চিত্রকলা এবং ধ্রুপদী পারসিক চিত্রকলা সাধারণ রূপকথার কল্পকাহিনির ভিত্তিতে সৃষ্টি হতো। ফলত, জীবন্ত মানুষ, গাছপালাও এখানে অন্যান্য প্রাণীর মতোই আলংকারিক নকশার অংশ

---

[১] এ কে এম ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

[২] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

হয়ে উঠত। মুঘল চিত্রকলার প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ূনের চিত্রকারখানার প্রথমদিকের চিত্রকর্মও এই ধারার অনুসরণে অঙ্কিত হয়েছে।[১]

বস্তুত মুসলমান বাদশাহ বা শাসনকর্তাদেরই অভিপ্রায় এবং প্রেরণায় ইসলামী চিত্রকলার আবির্ভাব ঘটে। তাঁদেরই আনুকূল্য ও নির্দেশে 'পারসিক চিত্রকলা' নামে একটি বিশেষ শৈলীর চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছিল। প্রখ্যাত চিত্রকর কামাল-উদ-দ্বীন বিহজাদ তাঁদেরই দরবারী শিল্পী ও মূখ্য শিল্প-পরিচালক ছিলেন। তাঁর নামেই পারসিক চিত্রকলায় "বিহজাদ স্কুল অব পেইন্টিংস" নামে এক স্বতন্ত্র ধারার অভ্যুদয় ঘটে।[২] মঙ্গোলদের আমলেই পারসিক চিত্রকলার পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি আঁকার জোয়ার আসে, তৈমুর লঙের বেশ কয়েকটি প্রতিকৃতি রয়েছে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের মুঘল বাদশাহ (মঙ্গোল থেকেই মুঘল) জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত *জাহাঙ্গীরনামায়* খলিল মির্জা নামে এক শিল্পীর আঁকা তৈমুরের যুদ্ধের একটি দৃশ্যের বর্ণনা আছে। ছবিটিতে ২৪০ জন মানুষ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেছেন।[৩]

আদি মুসলমান চিত্রকরগণ স্বাভাবিকভাবেই যেমন নিসর্গ ও প্রাণিকে বিষয় করেছিলেন, তেমনি ধর্মকেও। যিশুর জীবনও চিত্রিত করেন তাঁরা। নিউ টেস্টামেন্টের যিশুর পরিবর্তে কুরআনে বর্ণিত ঈসা (আ.) এর বৃত্তান্তই ছিল তাঁদের স্বীকৃত বিষয়বস্তু। বাইবেল ও কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ-জুলেখার কাহিনির চিত্ররূপ দিয়েছিলেন তাঁরা। আবার বাইবেলের অসংখ্য কাহিনিও চিত্রিত হয়েছিল মুসলমান চিত্রকরদের হাতে।[৪]

এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একাদশ শতক নাগাদ ইসলামে মিস্টিসিজম (mysticism) বা মরমিবাদের আবির্ভাব ঘটে। এর প্রভাবে ইসলামী চিত্রকলায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। উল্লেখ্য, মরমিবাদই হলো সুফিবাদ। তাঁরা অবশ্য ধর্মসাধনার অংশ হিসাবে চিত্রকলাকে গ্রহণ করেননি, যেরূপ হিন্দুদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। বস্তুত গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং জোরালোভাবে প্রকাশ করাই ছিল চিত্রসন্নিবেশের মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃত অর্থে ইসলামী চিত্রকলার ব্যাপক বিকাশের ক্ষেত্রে সুফিবাদ নিয়ামক হিসাবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।[৫] পারসিক চিত্রকলা ও মুঘল চিত্রকলার ক্ষেত্রে একথার সত্যতা লক্ষ করা যায়।

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৩] সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব ও অন্যান্য*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১৪১৩, পৃ. ২৭

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

প্রশ্ন হতে পারে যে, 'ইসলামী চিত্রকলা' আলাদাভাবে চিহ্নিত করার অর্থ কী? এর অর্থ হলো এই: মুসলমান চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রকলাকে মুসলিম চিত্রকলা বা ইসলামী চিত্রকলা বলা হয়েছে। পারসিক চিত্রকলা ও মুঘল চিত্রকলাকে সেই প্রেক্ষিতে ইসলামী চিত্রকলার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু শিল্পবিচারে বা সূক্ষ্মভাবে শৈলী বা রূপ-রীতি প্রকরণের দিক থেকে তা আদি আরব্য ইসলামী চিত্রকলা থেকে একেবারেই ভিন্নতর।[১]

২.৭ বাদশাহ আকবরের আমলে মুঘল চিত্রকলা

মুঘল চিত্রকলার প্রকৃত সময়কাল শুরু হয় বাদশাহ হুমায়ূনের পুত্র বাদশাহ আকবরের আমল থেকেই। আকবর পিতার স্বপ্নের বাস্তব রূপকার। হুমায়ূনের অকাল মৃত্যুর পর ১৫৫৬ সালে ক্ষমতাবান সভাসদ বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার সান্নিধ্যে থেকে জীবনের শুরু থেকেই আকবর চিত্রশিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন।[২] আকবরের চিত্রাঙ্কনের জন্য বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি এবং তাঁর পিতা হুমায়ূন পারসিক চিত্রকর খাজা আবদুস সামাদের নিকট চিত্রাঙ্কন শিক্ষালাভ করেছিলেন।[৩] আকবর মসনদে আরোহণের পর পিতার আদেশ ও নির্দেশ পালনে তৎপর হলেন। *দাস্তান-ই-আমির হামজা* চিত্রায়ণ সম্পূর্ণ করার জন্য পিতার দেওয়া নির্দেশ আকবর গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। হুমায়ূন যে দুজন পারসিক শিল্পীকে ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন, আকবর সে দুই শিল্পী মীর সৈয়দ আলী ও খাজা আবদুস সামাদকে *দাস্তান-ই-আমির হামজা* চিত্রায়নের দায়িত্ব প্রদান করলেন।[৪] *দাস্তান-ই-আমির হামজা*'র নতুন নাম হলো *হামজানামা*। সর্বপ্রথমে অঙ্কিত যে চিত্রকর্মটি এখনও সংরক্ষিত আছে, তার তারিখ ১৫৬২। সমাপ্ত হয় ১৫৭৭ সালে।[৫] *আমির হামজা* মুঘল চিত্রের গোড়াপত্তন করে। এর প্রারম্ভিক চিত্রকর্মসমূহে সাফাভিদ স্কুলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিহজাদের শিল্পরীতি তাতে লক্ষণীয়।[৬] আকবর চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিশেষ রীতি অবলম্বন করতেন। ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *আইন-ই-আকবরী*তে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বাদশাহ আকবর নিজেই চিত্রকর্ম পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রতি সপ্তাহে দারোগাগণ বাদশাহর সম্মুখে চিত্রকরদের শিল্পকর্ম প্রদর্শন করতেন। চিত্রকর্মের উৎকর্ষ অনুসারে বাদশাহ শিল্পীদের পুরস্কার অথবা বেতন বৃদ্ধি করতেন।

---

[১] সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[২] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

[৩] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

[৪] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[৫] প্রাগুক্ত, ১১২

[৬] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

আকবরের চিত্রকারখানায় বিপুল সংখ্যক শিল্পী কাজ করতেন। এঁদের অধিকাংশ শিল্পীই ছিলেন সনাতন ধর্মাবলম্বী। ঐতিহাসিক আবুল ফজল এ সকল শিল্পীদের ব্যাপারে গৌরববোধ থেকে লিখেছেন: "শিল্পীগণ আমাদের ধারণার অতীত উন্নততর চিত্রকর্ম অঙ্কন করেন। পৃথিবীতে তাঁদের সমতুল্য শিল্পী অত্যন্ত বিরল।" আকবরের আমলে চিত্রকলার মাধ্যম ও সরঞ্জাম ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। এইসময় রঙের সংমিশ্রণের রীতিতে বিশেষ উৎকর্ষতা লক্ষণীয়।[১]

আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৫৭৭ সালে হামজানামার বারোটি খন্ডের ১৪০০টি প্রমাণ সাইজের চিত্রকর্ম সমাপ্তির পর অ্যালবাম (মুরাক্কা) তৈরি হয়। শেষের দিকের খণ্ডগুলোতে সবদিক বিবেচনায় ক্রমান্বয়ে এক অপূর্ব বৈচিত্র্য, দ্যোতনা, অভিব্যক্তি, গতি ও আবেগ লাভ করেছে। হামজানামার প্রথম দিকে কয়েকটি খন্ডে ওই গুণসমূহ অনেকক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। সার্বিকভাবে হামজানামা যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি সাধন করলো, তার দৃষ্টান্ত ভারতীয় প্রাচীরচিত্র, পুঁথিচিত্র বা মিনিয়েচরে পূর্বে ছিল না।[২] উল্লেখ্য, পাণ্ডুলিপি চিত্রে আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে হামজানামর চিত্রায়ণ বিবেচিত। হামজানামা মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.) এর পিতৃব্য হামজা'র বীরত্বগাথার কাহিনি সম্বলিত পাণ্ডুলিপি।[৩] আকবর এই বীরত্বগাথায় বিশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। এটি তিনি জেনানা মহলে রেখেছিলেন। আবুল ফজল, বদাওনী, শাহনওয়াজ খান প্রমূখ লেখকগণ এটির উল্লেখ করেছেন।[৪]

১৫৬০ সালে আকবর আরেকটি পুঁথিচিত্র সংকলনের জন্য নির্দেশ দেন। ভারতবর্ষ ও পশ্চিম এশিয়ার লোকসাহিত্যে আকৃষ্ট হয়ে আকবর 'তুতিনামা' (তোতাকাহিনি) শীর্ষক অ্যালবাম বা মুরাক্কা তৈরির জন্য শিল্পীদের নির্দেশ প্রদান করেন। এই অ্যালবাম প্রস্তুত হয় ১৫৬০-১৫৬৫ সালের মধ্যে। এটি বর্তমানে ক্লীভল্যান্ড মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।[৫]

আকবরের রাজদরবারে একাধিক হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও চিত্রিত সংস্করণ রচিত হয়। অনুমান করা হয়, গোঁড়া মুসলমান সমাজকে নাড়া দেওয়ার জন্য আকবর এই প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। এটি যে সম্ভব হয়েছিল, তা প্রকাশ পায় বদাউনির গোপন রচনায়, যা সঙ্গত কারণে আকবরের জীবদ্দশায় তিনি প্রকাশ করতে পারেননি।

---

[১] Abu'l-Fazl-Allami, *A'in-i-Akbari*, English translation in the 'Bibliotheca Indica Series' Vol. 1 (Translated into English by H. Blochmann and edited by D. C. Phillot, 1927), Calcutta: The Asiatic Soceity, 2010 (Third reprints), p. 113

[২] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

[৩] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

[৪] অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৫, পৃ. ১৩৩১

[৫] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

রজম্‌নামা বা যুদ্ধের কাহিনি নামে মহাভারতের অনুবাদ করেন নাকিব খান। আকবরের অনুরোধে এই অনুবাদটিকে পারসিক কাজে পরিণত করেন বদাউনি। এর সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধিত হয় আকবরের সভাকবি ফৈজির কৃতিত্বে। ১৫৮৬ সাল নাগাদ অনুবাদটি শেষ হলে ঐতিহাসিক আবুল ফজল এর মুখবন্ধ রচনা করেন। এর চিত্রিত সংস্করণটি একই সময় আকবরকে উপহার দেন তাঁর অনুগত শিল্পীগণ। এর আরো চিত্রিত সংস্করণ করা হয়। মূল গ্রন্থটি জয়পুরের রাজপরিবারের সংগ্রহশালায় আছে। অন্যগুলো সংগৃহীত রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহশালায়।[১] *রজমনামায়* মুঘল চিত্রকলার একটি নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। পারসিক চিত্রকলার উজ্জ্বল রঙের সঙ্গে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ পীত বসন। কাহিনিটি হিন্দুদের কাছে জনপ্রিয় করার জন্য রাজপুত রাজাদের পোশাক ও মুকুট হিন্দু দেবদেবীদের মতো সজ্জিত করা হয়। এই আঙ্গিকের বিস্তার পরবর্তীকালের রামায়ন, যোগবশিষ্ট ও হরিবংশে লক্ষ করা যায়।[২]

দৈবশক্তিতে বলীয়ান যে বাদশাহ, তিনিও সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শ অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পিতৃপুরুষদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। মুঘলগণ তৈমুর লঙের বংশধর- এর গৌরব বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণের জন্য আকবর থেকে শুরু করে প্রায় সকল বাদশাহগণ বিশেষ উৎসাহবোধ করতেন। প্রতিটি ফরমা ও সিলমোহরগুলোতে উৎকীর্ণ থাকতো পূর্বপুরুষের নাম। একই যুক্তিতে যে সকল ইতিহাস মুঘল রাজদরবারে রচিত হয়, সেখানেও তৈমুরীয় বংশের জয়গাথা প্রাধান্য লাভ করে। *তারিখ-ই-খানদান-ই তিমুরিয়া* এই বিবেচনায় মুঘল রাজবংশের প্রথম ইতিহাস। যার চিত্রিত সংস্করণ পাটনার খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।[৩]

আকবর *খানদান-ই-তিমুরিয়া*'র মাধ্যমে রাজবংশের বীরত্বের কাহিনি প্রতিভাত করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে একই সঙ্গে তা বংশমর্যাদা ও ঐতিহ্যের বিবরণ হিসাবে চিহ্নিত, যা আকবরের ক্ষমতার বৈধকরণ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। তৈমুরের মৃত্যুর দৃশ্যে তাঁর অনুচরদের শোকের ছবি আনুগত্যের বিষয়টিকে চিত্ররচনার মাধ্যমে দর্শকের কাছে স্পষ্ট করে দেয়।

তৈমুর থেকে বাবুর এবং বাবুর থেকে হুমায়ূনসহ সকল মুঘলশাসক যোদ্ধা, বিজয়ী ও বীর ছিলেন। এই তথ্যসমূহ লেখক ও চিত্রশিল্পী উভয়কে তাঁদের রচনায় ও চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এসবের সঙ্গে আরো স্পষ্ট করে তুলতে হয় বাদশাহগণের চরিত্রের মানবিক দিক। ফলত, লক্ষণীয় *খানদান-ই-তিমুরিয়া*'র চিত্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো হুমায়ূন ও আকবরের জন্মের দৃশ্যগুলো। হুমায়ূনের জন্মের দৃশ্য দেখা যায় বাবুর এক মণিময় স্বর্ণসিংহাসনে আসীন। তাঁর সম্মুখে অর্ধগোলাকারে উপবিষ্ট আছেন সভাসদগণ। তাঁদের সম্মুখে পাত্রপাত্র রয়েছে। ভৃত্যগণ খানা-দানা

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[২] অনিরুদ্ধ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩২

[৩] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

পরিবেশনরত। একটি প্রাচীর চিত্রের জমিন বিভাজন করেছে। প্রাচীরের ওপর একটি নৃত্যরত ময়ূর। আর প্রাচীরের অন্য পারে অগণিত মানুষ, তারা উৎসবের আনন্দে আত্মহারা। তাদের মধ্যে রাজ-কর্মচারীরা বিতরণ করছেন অর্থ, খাদ্য ও রাজ-অনুগ্রহের অন্যসব স্মারকচিহ্ন। আকবরের জন্মের দৃশ্যটি অনেক বেশি অন্তরঙ্গ আমেজে রচিত। অন্তঃপুরের দৃশ্যে লক্ষ করা যায়, সদ্যপ্রসূত শিশু তার ধাত্রীর কোলে। একটি বিছানায় অবসন্ন মাতা শায়িত অবস্থায় আছেন। আশেপাশের কতিপয় নারী তাঁর সেবায় নিয়োজিত। কজন নারী শিশুকে ঘিরে এক ব্যস্ততম আবহ তৈরি করেছেন। অন্তঃপুরের বাইরে জ্যোতিষীরা শিশুর ভাগ্যগণনায় মনোনিবেশ করেছেন। এক ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ করা যায়। তিনি হুমায়ূনকে সুসংবাদটি দেওয়ার জন্য ছুটে চলেছেন। এই চিত্রকর্ম স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আকবরের জন্ম হয়েছিল এমন এক দুঃসময়ে যখন তাঁর পিতা হুমায়ূন ফেরারী। ফলে শিশু আকবরের ভাগ্যে রাজকীয় আড়ম্বর খুব অল্পই জোটে।[১]

পিতা থেকে পুত্রের ক্ষমতালাভের যে চিরাচরিত প্রথা, সেটি বাবুর, হুমায়ূন ও আকবরের বিবিধ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। *বাবুরনামা* ও *আকবরনামা*'তেও ওই প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। চিত্রশৈলীর গতি-প্রকৃতি কিভাবে সমসাময়িক মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছে, ঐতিহাসিক আবুল ফজলের *আকবরনামা* তার যথার্থ উদাহরণ।

১৬০২ সালে আবুল ফজলের মৃত্যুর পর *আকবরনামা* অসম্পূর্ণ থাকে। ১৫৯০ সালে *আকবরনামা* চিত্রণের কাজ শুরু হয় বাদশাহ আকবরের আদেশে। এর মধ্যে একটি নতুন আঙ্গিকের সূত্রপাত হয়। জীবনের বাস্তব ঘটনার চিত্রণ এবং সভ্যতার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে প্রকাশের চেষ্টা লক্ষণীয়। এখানে আকবরকে জমকালো পোশাক পরিহিত বাদশাহ-ই শুধু বোধ হয় না, বরং তাঁর মুখাবয়বে সুস্পষ্ট রাজসিক আদল প্রতিভাত হয়েছে। যা প্রাক-মুঘল যুগের শাসকদের প্রতিকৃতিতে পাওয়া যায় না। ১৫৮০ সালের পরবর্তীকালে নতুন আঙ্গিকের প্রতিকৃতি অঙ্কন দরবারি চিত্রশালায় শুরু হয়। আকবরনামার শেষভাগের কিছু অংশ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময় চিত্রিত হয়েছিল। পারসিক রীতি অনুযায়ী আখ্যানমূলক চিত্রাঙ্কন করা হলেও মুঘল শিল্পীরা আকবরের জীবনের ঘটনাবলীর কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন লক্ষ করা যায়, দরবারের মধ্যে আতকা খানকে হত্যা ও আধম খানের মৃত্যুর অসামান্য চিত্র এঁকেছেন শিল্পী মিশকিন। আকবরের আদেশে আধম খানকে দোতলা থেকে ফেলে দেওয়া হয়। এই ভয়াবহ দৃশ্য এবং বাদশাহের মহিমা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।[২]

১৫৯০ সালের দিকে *বাবুরনামা*'র চিত্রণের কাজ শুরু হয়। অর্থাৎ যা *আকবরনামা*'র সমসাময়িক। বাবুরনামা তুর্কি ভাষায় রচিত হয়েছিল। আকবরের আদেশের আবদুর রহিম খান-ই-খানান এটির

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[২] অনিরুদ্ধ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩৩

ফারসি অনুবাদ রচনা করেন। এর যে চারটি চিত্রিত খণ্ড পাওয়া গেছে সবকটিই আকবরের রাজত্বে রচিত হয়। প্রথম খণ্ডটির মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে। এগুলো লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত করা হয়েছে। বিবেচনা করা হয়, এটিই আকবরকে উপহার দেওয়া সংস্করণটির অংশ। দ্বিতীয়টি লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে, তৃতীয়টি মস্কোর স্টেট মিউজিয়াম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলটিমর-এর ওয়ালটার্জ আর্ট গ্যালারির মধ্যে বিভক্ত। এছাড়াও *আকবরনামা*'র চতুর্থ খণ্ডটি দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।[১]

বাদশাহ আকবরের ধর্মচর্চা, সকল ধর্মে আগ্রহ ও সমন্বয় সাধনের প্রগতির ইতিহাস আবুল ফজলের রচনা থেকে পাওয়া যায়। অতএব কোন গ্রন্থটি (নামা) ঠিক কত সালে রচিত হয়, তা ওই ইতিহাসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করাই শ্রেয়।[২] যথা-

তুতিনামা (তোতাকাহিনি)	:	১৫৬০-১৫৬৫; তুলা কাপড়ের ওপর অঙ্কিত।
হাম্‌জানামা	:	১৫৬২-১৫৭৭; তুলা কাপড়ের ওপর অঙ্কিত।
বাবুরনামা	:	সম্পূর্ণ হয় ১৫৮৯; কাগজের ওপর অঙ্কিত।
আকবরনামা	:	সম্পূর্ণ হয় ১৫৯০ (আনুমানিক); কাগজের ওপর অঙ্কিত।
হরিবংশ	:	সম্পূর্ণ হয় ১৫৯০ (আনুমানিক); আকবর ও যুবরাজ সেলিমের (পরবর্তীকালে বাদশাহ জাহাঙ্গীর) রাজত্বে অঙ্কিত।
রজমনামা (মহাভারত, যুদ্ধের বই)	:	সম্পূর্ণ হয় ১৫৯৮ (আনুমানিক); আকবর ও যুবরাজ সেলিমের (পরবর্তীকালে বাদশাহ জাহাঙ্গীর) রাজত্বে অঙ্কিত।

উপরে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির অ্যালবাম (মুরাক্কা) বা চিত্র সংকলন চিত্রণে বাদশাহ আকবর, যুবরাজ সেলিম বা পরবর্তীকালে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিজস্ব চিত্রশালা বা কারখানায় আনেক শিল্পী নিযুক্ত ছিলেন।[৩] *বাবুরনামা*'র চিত্রিত সংস্করণগুলোর সঙ্গে শিল্পমূল্যের ভিত্তিতে আকবরনামার চিত্রিত খণ্ডগুলোর তুলনা করলে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন প্রায় একই সময়ে রচিত হলেও *আকবরনামা*'র ক্ষেত্রে শিল্পীরা অনেক বেশি যত্নশীল। তাঁরা যথাযথ চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষ তৎপর ছিলেন। এর কারণ, উল্লিখিত দুটি গ্রন্থের রচনায় নিহিত ইতিহাস থেকে শনাক্ত করা যায়। *আকবরনামায়* লেখক ও শিল্পী লিপিবদ্ধ করেছিলেন সমসাময়িক ঘটনা। অন্যদিকে *বাবুরনামায়*

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

[২] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

পেছনের ঘটনা বা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। *বাবুরনামা*'র চিত্রণে যেরূপ ভাবালুতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, *আকবরনামায়* তা পরিবর্তিত হয়ে ভয় ও সম্ভ্রমে পরিণত হয়েছিল। ফলত, যৌক্তিত বিবেচনা থেকে *আকবরনামার* চিত্রকর্মগুলো সমগ্র মুঘল চিত্রশিল্পের বিশেষ নিয়ামক হিসাবে গণ্য।[১]

আকবর ও জাহাঙ্গীর তাঁদের সাম্রাজ্যে জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে একাত্মতা তৈরি করে শিল্পকলার বিকাশের জন্য অশেষ অনুরাগের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উভয়ের আত্মনিবেদন মুঘল চিত্রকলার ইতিহাসে অত্যন্তর গুরুত্ববহ এবং অবিস্মরণীয়। আকবর চিত্রশালা শুরু করেছিলেন তাঁর পিতা হুমায়ূনের পারস্য রাজদরবার থেকে নিয়ে আসা শিল্পীদের মাধ্যমে। জাহাঙ্গীর প্রায় একান্তভাবে ভারতবর্ষের শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। অর্থাৎ আকবর তাঁর রাজত্বকালে সুদক্ষ চিত্রশিল্পী তৈরি করে গেছেন। এর ফলে শাহজাদা সেলিম (পরবর্তীকালে বাদশাহ জাহাঙ্গীর) ওই সকল শিল্পীদের মাধ্যমে নিজের অভিপ্রেত রুচি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

আকবরের রাজত্বে খ্যাতিমান শিল্পীদের মধ্যে খাজা আবুদস সামাদ (পারস্য), মীর সৈয়দ আলী (পারস্য), আবুল হাসান, আকা রিজা, আকিল খান, বসাওন, ভবানী দাস, বিচিত্র, বিহ্জাদ (খাজা আবদুস সামাদের পুত্র), বিষণদাস, দশান্ত, গোবর্ধন, কমল কাশ্মীরী, কেশু খুর্দ, মনোহর, ওস্তাদ মনসুর, মিশকিন, নয়নসুখ, রুকনুদ্দিন, সাহিবদিন, সুদর্শন ও রঞ্জা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২]

২.৮ জাহাঙ্গীরের রাজত্বে মুঘল চিত্রকলার স্বর্ণযুগ (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল চিত্রকলা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলায় রাজপুত ও পারসিক চিত্রশৈলীর সংমিশ্রণ ঘটে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পূর্বে চিত্ররীতি ইন্দো-পারস্য চিত্র নামে পরিচিত ছিল। তাঁর প্রবল উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্র ইন্দো-পারস্য ধারা হতে মুক্ত হয়ে স্বকীয় একটি অনন্য সাধারণ ধারা সৃষ্টি করে। জাহাঙ্গীরের রাজদরবারের চিত্রকর্মই প্রথম মুঘল চিত্র আখ্যাপ্রাপ্ত হয়।[৩] ১৬০৫ হতে ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে মুঘল চিত্রকলার স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। বলাই বাহুল্য যে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিত মুঘল চিত্ররীতির উন্মেষ ও বিকাশ কখনও সম্ভবপর হতো না।[৪] মুঘল বাদশাহগণের নিজস্ব অভিধায় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক প্রশংসনীয় কর্ম। জাহাঙ্গীরের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শিল্পের

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

[২] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

[৩] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

[৪] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

উদার পৃষ্ঠপোষণ। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কালে জাহাঙ্গীর পূর্ণ উদ্যমে এলাহাবাদে একটি স্বাধীন দরবার গড়ে তোলেন। সেখানে তিনি চিত্রকারখানা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। ওই চিত্রকারখানায় শুধু ভারতবর্ষ নয়, পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে অনেক সুদক্ষ শিল্পী এসে যোগ দেন।[১] জাহাঙ্গীরের রাজত্বে চিত্রকলা চর্চা শুরু হয় বস্তুত তাঁর এলাহাবাদ গমনের বছর থেকে। উল্লেখ্য, তাঁর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক শিল্পী এলাহাবাদে গমন করেছিলেন।[২] পিতার সঙ্গে বিরোধের পর জাহাঙ্গীর স্বেচ্ছায় ১৫৯৯ থেকে ১৬০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এলাহাবাদে বসবাস করেছেন। সেখানে তিনি সুদক্ষ ও প্রখ্যাত শিল্পীদের সহযোগে মনের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন চিত্রকারখানা।[৩]

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের রক্তে দুটি ধারার সংমিশ্রণ ছিল। কারণ তাঁর জননী ছিলের রাজপুত নারী যোধাবাই, অর্থাৎ রাজা মানসিংহের ভগিনী। জাহাঙ্গীর পিতার দিক দিয়ে পেয়েছেন মোঙ্গল ও তিমুরিদ রক্ত এবং মাতার দিক দিয়ে রাজপুত রক্তের সংমিশ্রণ। ফলত, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ছিল ভিন্নধর্মী। তাঁর রুচিবোধ, কল্পনা, সংবেদনশীলতা, শিল্পানুরাগ ইত্যাদি ছিল অনন্য সাধারণ।[৪]

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের মধ্য দিয়ে মুঘল চিত্রকলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়। উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীর নিজেও একজন শিল্পী ছিলেন। ফলে চিত্রকরেরা বাদশাহের ব্যক্তিগত প্রভাব, শিল্পানুরাগ ও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পচর্চা করেছিলেন। তাঁর আমলে ইন্দো-পারস্য রীতি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মুঘল চিত্রকলায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এই রূপান্তর সম্ভবপর হয়েছে বস্তুত দুটি কারণে। প্রথমত, জাহাঙ্গীরের শিল্পানুরাগ ও শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব এবং দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বাদশাহ আকবর যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজকর্মে অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব, নির্দেশনা ও অভিব্যক্তির প্রকাশ শিল্পের মাধ্যমে চূড়ান্ত সাফল্য পায়নি। তিনি অসংখ্য শিল্পীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের শিল্পচর্চায় যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি।[৫]

আকবর ও জাহাঙ্গীরের চিত্রকলার মধ্যে বিষয়ভিত্তিক মূখ্য পার্থক্য হলো এই যে, আকবরী চিত্রকলায় বহির্মুখিতা এবং জাহাঙ্গীরের চিত্রকলায় অন্তর্মুখিতা উদ্ভাসিত। আকবরের বহির্মুখী আমেজের চিত্রকর্মে সর্বদা একটা উত্তেজনা ও উদ্বেগজনক ভাব বিরাজ করে। অন্যদিকে জাহাঙ্গীরের চিত্রকলায় রয়েছে এক শান্তিময় আবহ। এখানে উল্লেখ্য যে, মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আকবরকে প্রায় সবসময় উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে জীবন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[২] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

[৩] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[৪] Percy Brown, *op. cit.,* p. 72

[৫] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলত জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ছিল বিশেষ উপভোগ্য। এই উপভোগ্য সময় তাঁর চরিত্র এবং কার্যক্রমে বিবিধ প্রেক্ষিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর অসামান্য অনুরাগ। আকবর চিত্রকলায় পৃষ্ঠপোষকতা করলেও তাঁর মূল কীর্তি রাজ্য জয়ে, প্রশাসন সুদৃঢ়করণে এবং রাজধানী নির্মাণ ও স্থাপত্য অবদানে। কিন্তু জাহাঙ্গীরের প্রধান কীর্তি হলো চিত্রকলায় বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান, শুধু পৃষ্ঠপোষকতা করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজেও চিত্রকর ও শিল্পতাত্ত্বিক হয়ে উঠেছিলেন।[১] তিনি জীবনচরিত *তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী*'তে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে লিখেছেন:

> চিত্রশিল্পের প্রতি আমার গভীর অনুরাগের ফলে এর যথার্থ বিবেচনা ও মূল্যায়ন ক্ষমতা আমার মধ্যে দারুণভাবে বিকশিত হয়েছে। নাম উল্লেখ না করেও যদি জীবিত অথবা প্রয়াত শিল্পীর কোনো চিত্রকর্ম আমার সম্মুখে প্রদর্শন করা হয়, আমি মুহূর্তের মধ্যে বলে দিতে পারি চিত্রকর্মটি কোন শিল্পী অঙ্কন করেছেন। আর যদি কোনো প্রতিকৃতিধর্মী চিত্রকর্মে বিভিন্ন প্রতিকৃতি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীকে দিয়ে অঙ্কিত হয়, তা সত্ত্বেও আমি নির্ধারণ করে দিতে পারি কে কোন মুখাবয়বটি এঁকেছেন। যদি কোনো শিল্পী মুখাবয়বে শুধু চোখ ও ভ্রু অঙ্কন করেন, সেক্ষেত্রে আমি মুখমন্ডলের প্রকৃত শিল্পী এবং চোখ ও ভ্রু অঙ্কনকারী শিল্পীকে পৃথকভাবে শনাক্ত করতে পারি।[২]

জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই শুরু হয় শিল্পীদের ব্যক্তি প্রতিভার বিকাশ। জাহাঙ্গীর নিজে পুঁথিচিত্রণে আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও একক চিত্রকর্ম সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগ দিতেন। তাঁর আমলে রচিত বিশাল সব অ্যালবাম (মুরাক্কা) পাওয়া গেছে। এসব মুরাক্কায় রয়েছে ইউরোপীয় ছবির অনুসরণ, ওস্তাদ মনসুরের অঙ্কিত পশু-পাখির চিত্রকর্ম এবং আবুল হাসানের অঙ্কিত প্রতিকৃতি।[৩] জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় উল্লিখিত দুজন ক্ষণজন্মা মুসলমান চিত্রশিল্পীর সৃজনশীল শিলচর্চার ফলে মুঘল চিত্রকলার প্রকৃত বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধিত হয়। শিল্পী আকা রিজার পুত্র আবুল হাসান ও ওস্তাদ মনসুর দুজেনই ছিলেন অনন্যসাধারণ চিত্রকর। অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বাদশাহ জাহাঙ্গীর আবুল হাসানকে 'নাদির-উজ-জামান' অর্থাৎ 'যুগের শ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করেন। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী *তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী*'র নামপত্র (frontispiece) আবুল হাসান অত্যন্ত চমৎকারভাবে অঙ্কন করেছেন বিধায় বাদশাহ তাঁকে এরূপ মর্যাদা দান করেন। জাহাঙ্গীর তাঁর সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন: "তাঁর শিল্পকর্ম ছিল সর্বোৎকৃষ্ট এবং যুগের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়।"[৪] আবুল হাসানের মতো অপরাপর যে সকল শিল্পী রাজদরবারে অল্পবয়স থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতেন তাঁদের বলা হতো খানাজাদা। তাঁরা অন্য শিল্পীদের চেয়ে অধিক সম্মানিত বলে গণ্য হতেন। জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই তাঁদের

---

[১] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১

[২] Nur-ud-din Muhammad Jahangir, *Tuzuk-i-Jahangiri* (Memoirs of Jahangir), Translated by A. Rogers, edited by H. Beveridge, Vol. II, London: Royal Asiatic Society Library, 1909, p. 161

[৩] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

[৪] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

বিশেষ যত্নের সঙ্গে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হতো। আবুল হাসান যদিও ফুল-লতাপাতা এবং পশু-পাখির চিত্রাঙ্কন করেছেন কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ ছিল প্রতিকৃতি অঙ্কন। এই শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন ইউরোপীয় প্রতিকৃতি চিত্রকর্মসমূহ অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। ফলত, আবুল হাসানের অঙ্কিত প্রতিকৃতি চিত্রগুলো বাস্তবধর্মী হতো। একইসঙ্গে প্রকাশিত হোত শিল্পীর নিজস্ব ভঙ্গি। চিত্রকর্মের এই গুণাবলী শুধু জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতি চিত্রে নয়, শাহজাহানের যে প্রতিকৃতিগুলো আবুল হাসান অঙ্কন করেছেন সেসবের মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে।[১]

বাদশাহ জাহাঙ্গীর ওস্তাদ মনসুরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।[২] ১৬১৯ সালে তিনি তাঁর রাজত্বের তের বছর সময়কালে লিখেছেন: "আমার পিতার রাজত্বকালে এবং আমার রাজত্বকালেও ওস্তাদ মনসুর ও আবুল হাসানের মতো তৃতীয় কোনো শিল্পী তৈরি হয়নি।"[৩] মনসুরের শিল্পকর্মের মধ্যে অভিনব সৃজন ও গুণাবলী দেখে বিমুগ্ধ জাহাঙ্গীর তাঁকে 'নাদির-উল-আসর' অর্থাৎ যুগের বিস্ময় উপাধিতে ভূষিত করেন।[৪] অনুমান করা হয়, মনসুর বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালের শেষের দিকে ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে ওস্তাদ অভিধাটি যুক্ত হয়। প্রধানত ফুল-লতাপাতা এবং পশু-পাখির ছবিগুলোই ওস্তাদ মনসুরকে দিয়ে অঙ্কিত হতো। উল্লেখ্য, একদা মথুরা থেকে দিল্লি গমনের পথে জাহাঙ্গীরের প্রিয় বাজপাখিটি মারা যায়। ওস্তাদ মনসুরের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয় পাখিটির চিত্র অঙ্কনের জন্য। এরপর বাদশাহ তাঁকে আবারও তলব করেন কাশ্মীর গমনকালে। কাশ্মীরের অপরূপ ফুলগুলো জাহাঙ্গীরকে মোহাবিষ্ট করেছে। ওস্তাদ মনসুরকে নির্দেশ দেওয়া হয, তিনি যেনো ফুলগুলোর অনুপুঙ্খ ছবি অঙ্কন করে রাখেন। এছাড়াও কোনো পাখি, বিস্ময়কর কোনো প্রাণি বাদশাহের দৃষ্টিগোচর হলেই ওস্তাদ মনসুরের ডাক পড়তো। প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে ফুটিতে তুলতে যে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, তা মনসুরের আয়ত্তে ছিল। এর প্রমাণ মেলে তাঁর কিছু প্রতিকৃতি চিত্রে। অবশ্য বাদশাহের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে প্রধানত মন দিতে হলো ফুল, ফল এবং পশু-পাখির নিখুঁত রূপায়ণে। ১৬২১ সালের পর থেকে ওস্তাদ মনসুরের স্বাক্ষরিত কোনো ছবি পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয়, ওই পর্যায়ে তিনি শিল্পী হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।[৫]

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অসাধারণ ধীশক্তি এবং মননশীলতার জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুঘল চিত্রকলার নবযুগের সূচনা হয়েছিল। জাহাঙ্গীর শুধু বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি, একই সঙ্গে

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[২] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

[৩] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৪] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

[৫] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

তাঁর অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল।[১] পার্সি ব্রাউন লিখেছেন: "জাহাঙ্গীরের শৈল্পিক রুচি, নান্দনিক জ্ঞান ও শিল্পীমনের কল্পনাকে দরবারি শিল্পীগণ বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন।"[২] জাহাঙ্গীরের রাজত্বে মুঘল চিত্রশিল্পের চর্চা ও বিকাশ সম্পর্কে প্রধানত জানা যায় তাঁর আত্মচরিত *তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী* থেকে। দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে জাহাঙ্গীরের দরবারে আগত ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রো'র চিঠিপত্র। জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতে প্রকৃত এবং সুগঠিত মুঘল চিত্ররীতির উদ্ভব সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে ঐতিহাসিক প্রতিকৃতি, দরবার দৃশ্য, বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি, ফুল, উদ্যান এবং অসাধারণ কিছু বিষয়ের উল্লেখ আছে। জাহাঙ্গীরের আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলা শুধু স্বর্ণযুগেই উপনীত হয়নি, বরং তিনি যে চিত্রকলার একজন প্রকৃত ও অভিজ্ঞ সমঝদার ছিলেন তারও প্রমাণ মেলে।[৩] জাহাঙ্গীর গর্ববোধ করতেন তাঁর অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার জন্য, একটি চিত্রে অনেক শিল্পীর অঙ্কন ও পৃথক শৈলী থাকলেও, তিনি সহজেই বলে দিতে পারতেন মুখাবয়বে কে চোখ এঁকেছেন এবং কে রং দিয়েছেন- ইত্যাদি বিষয়।[৪]

জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় প্রধানত তিন ধরনের চিত্র অঙ্কিত হতো। যথা-

১) পাণ্ডুলিপি চিত্রাবলী
২) মুখাবয়ব বা প্রতিকৃতি ও
৩) ফুল, লতাপাতা, পশু-পাখি ও প্রকৃতি

তাঁর দরবারে হিরাত হতে এসেছিলেন চিত্রকর আকা রিজা, যুবরাজ সেলিম (জাহাঙ্গীর বাদশাহ হওয়ার পূর্বে সেলিম নামে খ্যাত ছিলেন) আকা রিজার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সিংহাসনে আরোহণ করে জাহাঙ্গীর পিতার পদক্ষেপ অনুসরণ করেন। তিনি রাজকীয় কুতুবখানায় (গ্রন্থাগার) অসংখ্য মূল্যবান চিত্রিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করে মূল্যবান প্রাচীন চিত্রিত গ্রন্থাবলী এবং একক চিত্রকর্ম সংগ্রহ করেন। তাঁর রাজসিক চিত্রশালায় বিভিন্ন চিত্রশৈলী বা স্কুলের শিল্পকর্মগুলো পর্যবেক্ষণ ও উপভোগের যথাযথ সুযোগ ছিল। চিত্রকরগণ স্বভাবত এই শিল্পকর্মগুলো দ্বারা প্রভাবান্বিত হতেন।[৫] জাহাঙ্গীর যে সমস্ত পারসিক চিত্রকর্ম সংগ্রহের জন্য গর্ববোধ করতেন, সেসব চিত্রকর্মের মধ্যে বিহজাদের স্কুলে ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত চারটি মিনিয়েচর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাদশাহ চিত্রগুলো পনেরোশত টাকায় ক্রয় করেন। তিনি

---

[১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

[২] Percy Brown, *op. cit.*, p. 74

[৩] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

[৪] Annemarie Schimmel, *The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture*, London: Reaktion Books Ltd., 2004, p. 274

[৫] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

স্বীকার করেছেন যে, পারস্যের চিত্রশিল্পীদের মূল মিনিয়েচরগুলো সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ফলে বিহজাদের অঙ্কিত চিত্রকর্মের পরির্তে তাঁর শিষ্যদের অঙ্কিত মিনিয়েচর চিত্রগুলো নিয়েই বাদশাহকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। অপর একটি মূল্যবান সংগ্রহ ছিল মোল্লা পীর আলী কর্তৃক অঙ্কিত ইউসুফ এবং জুলেখার চিত্রিত পাণ্ডুলিপি। অত্যন্ত সুন্দররূপে ও চমৎকারভাবে বাঁধাইকৃত এই পাণ্ডুলিপির মূল্য ছিল এক হাজার মোহর।[১] এসব দুর্লভ ও মূল্যবান শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁর চিত্রশালা সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নিজের শিল্পানুরাগী মনেরও পরিচয় দিয়েছেন।

ফতেহপুর সিক্রিতে শিল্পী খাজা আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলী আকবরের চিত্রশালায় কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই দুই পথিকৃৎ শিল্পী জাহাঙ্গীরের দরবারে যোগ দেন। তাঁদের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের শিল্পীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শিল্পী ফারুক বেগ। ফারুক বেগ সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীর বিবাহ উপলক্ষে শিল্পীকে দুই হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। ফারুক বেগ ব্যতীত জাহাঙ্গীরের দরবারে আরও দুজন প্রতিভাবান শিল্পী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন সমরখন্দ নিবাসী মুহম্মদ নাদির এবং মুহম্মদ মুরাদ। দুজনেরই প্রতিকৃতি অঙ্কনে চমৎকার দক্ষতা ছিল। তাঁরা প্রধানত 'সিয়াহি কলম' বা সাদা-কালো রঙের (Black and White drawing) কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ওঁরাই মুঘল দরবারে শেষ পারসিক শিল্পী ছিলেন।[২]

মুঘল দরবারি চিত্রে ইতিহাসকে রূপায়িত করা হয়েছে শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ *আকবরনামা*। *জাহাঙ্গীরনামা* বা *তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী*'তে আরও অন্তরঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। বাদশাহ নিজেই তাঁর আত্মচরিত রচনা করেছেন। কদাচিৎ তাঁর হাত এবং হৃদয় ঠিকমতো কাজ না করলে তিনি ডেকে পাঠাতেন ইতিমাদ উদ-দৌলার মতো কোনো বিশ্বস্ত অনুচরকে। এই কথা বাদশাহ নিজেই লিখে গেছেন তাঁর দিনলিপিতে। জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী লেখেন তাঁর শাসনামলের সপ্তদশ সাল পর্যন্ত। তারপর মুতামিদ খাঁ নামে তাঁর এক বিদ্বান সভাসদের ওপর ভার পড়ে শেষ কয়েক বছরের বৃত্তান্ত লেখার জন্য। *তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী* থেকে জানা যায় যে, বাদশাহ আত্মচরিতের একটি বিশেষ সংস্করণ রচনা করতে আদশে করেছিলেন। যা তাঁর কুতুবখানায় সংরক্ষিত থাকবে। অন্য কপিগুলো বিতরণ করা হবে তাঁর অনুগতদের মধ্যে। কিছু পাঠানো হয় প্রাদেশিক রাজকর্মচারীদের কাছে। যাঁদের বলা হতো 'আরবার-ই-দৌলত'। যাতে তাঁরা এই গ্রন্থ থেকে বাদশাহের নীতিগত ধারণাগুলোকে অনুধাবন করতে পারেন। *তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী*'র চিত্রকর্মগুলো দেশে-বিদেশে বহু সংগ্রহশালায় ছড়িয়ে আছে। সেসব চিত্রগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রামপুর স্টেট লাইব্রেরির সাতটি ছবি। এগুলোর মধ্যে একটি হলো খুসরুর বিচার দৃশ্য। ১৬০৬

---

[১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

[২] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

সালের ১০ জুন লাহোরের উপকণ্ঠে মির্জা কামরানের বাগানে জাহাঙ্গীর অস্থায়ী এক দরবার বসালে, সেখানে হতভাগ্য রাজকুমার খুসরুকে হাজির করা হয়। উদ্যানে গাছপালার ছায়ায় ঢাকা রঙিন গালিচা, উপরে সোনালি কাজ করা শামিয়ানার তলায় সিংহাসনে আসীন বাদশাহ জাহাঙ্গীর। সম্মুখে দুই দিকে রাজ্যের গণ্যমান্য ওমরাহগণ। তাঁদের মাঝখানে মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে আছেন হতভাগ্য যুবরাজ খুসরু। অনাহারে শীর্ণ এবং মস্তক অবনত। তাঁর দুই পাশে দুই সহচর- হাসান বেগ ও আবদুল রহিম। দুজনের মস্তক সদ্যমৃত ষাঁড়ের ও গাধার ছালে আবৃত। জানা যায়, হাসান বেগ শুকিয়ে ওঠা চামড়ার চাপে মারা যান। কিন্তু জাহাঙ্গীর কিছুদিন পর আবদুল রহিমকে ক্ষমা করে দেন। খুসরুকে মৃত্যুদন্ড না দিলেও তাঁকে চরম অত্যাচার করা হয়।

এই চিত্রকর্মটি একদিকে যেমন জাহাঙ্গীরের জীবনের একটি নিষ্ঠুর সত্য ঘটনাকে প্রতিভাত করেছে, তেমনি প্রকাশ করেছে রাজশক্তির মহিমা। যে পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নয়, সামাজিক কারণেও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। জীবনের সত্য ঘটনা ছাড়াও যা কিছু অদ্ভূত, অভূতপূর্ব এবং যা তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করতো, জাহাঙ্গীর সেসব বিষয়ের ছবি আঁকানোর চেষ্টা করতেন। এই প্রেক্ষিতে মুঘল শিল্পীরা এঁকেছেন খাইবার গিরিবর্ত্মে আঁকাবাঁকা পথে যেতে এক অতিকায় মাকড়সা ও সাপের লড়াই। এইভাবে চিত্রিত হয় একাধিক শিকার দৃশ্য।[১] মুঘল বাদশাহগণ ভ্রমণে, যুদ্ধে বা শিকারে যেখানেই যেতেন, চিত্রকরদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোনো চিত্তাকর্ষক ঘটনা দৃষ্টিগোচর হলেই বাদশাহগণ তা শিল্পীদের চিত্রায়িত করতে নির্দেশ দিতেন।

জাহাঙ্গীর শিকারপ্রিয় ছিলেন। তাঁর দরবারি শিল্পীরা শিকারের দৃশ্য এঁকেছেন, তন্মধ্যে "একটি সিংহ শিকারের দৃশ্য" বিখ্যাত চিত্রকর্ম। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মচরিতে এই শিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজ হাতে সিংহটি শিকার করেছেন। জাহাঙ্গীর পশু-পাখি ও ফুল ভীষণ ভালোবাসতেন। তাঁর আত্মচরিতে এসব বিষযের চমৎকার বিবরণ আছে।[২] *তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী*'র অন্য একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম হলো সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সঙ্গে বাদশাহের হোলি খেলার দৃশ্য। তুজুখে এই ছবি বর্ণিত হয়েছে 'বস-তবারি' উৎসব নামে। হারেমের[৩] একাধিক মহিলাকে এই উৎসবে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। জাহাঙ্গীর লিখেছেন: এই দিনে নূরজাহান শিকার করতে গিয়ে একটি মূল্যবান মুক্তো হারিয়ে ফেলেন এবং যা তিনি পরে খুঁজে পান। এই চিত্রকর্মে বিশেষ তাৎপর্য নিহিত আছে। তা হলো

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৮

[২] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

[৩] 'হারেম' একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্র, নিষিদ্ধ। ইংরেজিতে এর শাব্দিক অর্থ হলো- something sacred or forbidden. হারেমের পারসিক অর্থ sanctuary। সংস্কৃত Harmya অর্থ প্রাসাদ। মুঘল হারেম বলতে 'জেনানা মহল' বা Ladies Apartment কে নির্দেশ করা হয়েছে।
R. Nath, *Private Life of the Mughals of India (1526-1803 A.D.)*, New Delhi: Rupa & Co. 2005, p. 111

নূরজাহানের প্রতিকৃতি উপস্থাপনায় বাস্তবতাবোধ। মুঘল দরবারি প্রতিকৃতিতে অভিজাত নারীদের প্রতিমা প্রায় সব সময়ই শিল্পীর কল্পনা থেকে অঙ্কিত হয়েছে। একমাত্র নূরজাহানই এর ব্যতিক্রম।[১]

মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রগুলোতে পরিলক্ষিত হয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও নান্দনিক চাহিদার এক চমৎকার সমন্বয়। ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় এখানে প্রতিষ্ঠা পায় তাঁর সামাজিক প্রেক্ষায়। বাদশাহ, যোদ্ধা, রাজপুরুষ, সাধু, কারিগর সবাই এক বিশাল ঐতিহাসিক কাহিনির চরিত্র হিসাবে আবির্ভূত হন দর্শকের সামনে। ইতিহাসের এই বিবৃতির ধারা তাই নির্ধারণ করে তাঁদের প্রতিকৃতির বিভিন্ন ধরন।[২] জাহাঙ্গীরের আমলে একাধিক প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেখানে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে বিচিত্র ঘটনার প্রধান নায়ক হিসাবে। এই ধরনের চিত্রগুলোকে বলা হয় 'খেয়ালি তসবির'। বেশ কয়েকটি প্রতিকৃতির ওপর জাহাঙ্গীর নিজেই লিখেছেন যে, এগুলো তাঁর স্বপ্নাদিষ্ট অলৌকিক প্রেরণার ফসল। শিল্প ঐতিহাসিকদের মতে জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বকালকে ইতিহাস হিসাবে না দেখে রূপান্তরিত করেছিলেন রাজকীয় ক্ষমতার এক মিথে (myth)।[৩] তাঁর আমলেই প্রতিকৃতিচিত্র অঙ্কন সুদূরপ্রসারী, শৈল্পিক ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। আকবরের আমলে মিনিয়েচর চিত্র প্রাধান্য লাভ করে। জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় পাণ্ডুলিপি চিত্রকর্মের তুলনায় একক ও বিচ্ছিন্ন চিত্র অঙ্কনে চিত্রকরগণ বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রতিকৃতি অঙ্কনরীতি মুঘল চিত্রশিল্পকে পাণ্ডুলিপি নির্ভুল শিল্পকলা হতে মুক্ত করে। একইসঙ্গে তা ব্যক্তির অপূর্ব ও নিখুঁত চরিত্রাঙ্কনে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে। চিত্রকলায় আকবর অপেক্ষা জাহাঙ্গীরের শৈল্পিক দূরদর্শিতা অধিক ছিল। এই কারণে তাঁর চিত্রশালায় অসংখ্য প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়। চিত্রশিল্পের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ এবং ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের ফলে শৈশব হতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সকল পর্যায়ে জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতি চিত্র রয়েছে।[৪]

জাহাঙ্গীরের আমলেই মুঘল শিল্পীরা ইউরোপীয় চিত্রকলার অনুসরণে পুরোপুরি দক্ষ হয়ে ওঠেন। স্যার টমাস রো এই বিষয়ে একটি চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ লিখে গেছেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় একবার রো-র গলায় ঝুলছিল একটি প্রতিকৃতি সম্বলিত লকেট। জাহাঙ্গীর সেটা তাঁকে দিয়ে দিতে বলায় রো একটু বিপদে পড়েন। কারণ প্রতিকৃতিটি ছিল রো-র স্ত্রীর। জাহাঙ্গীর রো-র মনের অবস্থা বুঝতে পেরে প্রতিকৃতির অণুচিত্রটি মাত্র সাত দিনের জন্য ধার নিলেন। সাতদিন বাদে রো এসে দেখেন এক জায়গায় পরপর সাজানো রয়েছে সাতটি প্রতিকৃতি চিত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রত্যেকটি চিত্র হুবহু একই ধাঁচের। কিছুক্ষণের জন্য রো-র চোখে ধাঁধা লেগে যায়। জাহাঙ্গীর

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[৪] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০-৩৪১

তার শিল্পীদের কৃতিত্বে বিমোহিত হয়ে বলেন যে, কোনটি আসল এবং কোনটি নকল তা যেন টমাস রো শনাক্ত করে দেন। এরপর রো স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, অনুকরণ, অনুসরণ ও রীতিগত দক্ষতায় মুঘল শিল্পীরা বিশ্বের যে কোনো চিত্রকরকে হারিয়ে দিতে পারেন।[১] উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রো-র বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস তাঁকে পাঠিয়েছেন। ১৬১৫ হতে ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, তিন বছর তিনি গ্রেট মুঘল দরবারে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর লেখা থেকেই জাহাঙ্গীরের দরবারের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।[২]

জাহাঙ্গীরের দরবারে ভারতীয় মুসলমান চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দাওলাত, আকবরের হিন্দু চিত্রকরদের মতো জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায়ও রাজপুত-রীতিতে দক্ষ অসংখ্য শিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিভাশালী ছিলেন বিসনদাস, তারাচাঁদ, জগন্নাথ ও মনোহর ও গোবর্ধন। শিল্পানুরাগী জাহাঙ্গীরের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলা পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। আকবরের যুগের চিত্রকর্মে অসামঞ্জস্য, বৈষম্য, অনড় ভাবভঙ্গি, রুক্ষতা এবং উপাদানের সংঘাত মুঘল চিত্রশিল্পকে বাস্তবধর্মী এবং জাতীয় চিত্রশিল্পে পরিণত করতে পারেনি। কিন্তু জাহাঙ্গীরের বাইশ বছরের রাজত্বকালে তাঁর প্রবল ইচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলা উৎকর্ষের চূড়ান্ত শিখরে উপনীতই হয়নি, একইসঙ্গে তা চারুকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছে।[৩]

সুকুমার প্রবৃত্তি জাহাঙ্গীর তাঁর প্রপিতামহ বাবুরের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন। এই দুজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাদশাহের মধ্যে চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উভয়েই আত্মচরিত লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দুজনেরই অসামান্য ব্যুৎপত্তিজ্ঞান এবং চারু ও কারুশিল্পের প্রতি বিশেষ আনুরাগ ছিল। উভয়েই উদ্যান, ফুল, প্রকৃতি, মৃগয়া, ভ্রমণ পছন্দ করতেন। মাত্রাসহকারে সুরাপান, কাব্যচর্চা, সঙ্গীত-জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং পশু-পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল মন তাঁদের চরিত্রকে পূর্ণরূপে বিকশিত করেছিল। বংশগত-দিক বিবেচনায় দেখা যায়, জাহাঙ্গীরের মধ্যে মোঙ্গল-চাগতাই এবং ভারতীয় রাজপুত রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন আকবরের রাজপুত মহিষী যোধবাই-এর পুত্র। পার্সি ব্রাউনের মতে, মধ্য-এশিয়া এবং ভারতীর রক্তের সংমিশ্রণের ফলে জাহাঙ্গীরের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অ-ভারতীয় বলা যায় না। কারণ জাহাঙ্গীরের চিন্তাধারায় যে অন্তর্মুখী

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

[২] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

[৩] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৪

প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। তাই পরবর্তীকালে তাঁর চিত্রশিল্পকে জাতীয় চিত্রশালার প্রকৃত মুঘল চিত্রকলায় রূপান্তরিত করে।[১]

প্রবল অনুভূতিশীল ও আবেগপ্রবণ হৃদয়ের অধিকারী জাহাঙ্গীর মুঘল চিত্রশিল্পকে বাস্তব এবং পরিপূর্ণ রূপদানে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর ধমনীতে যেমন পারস্য-তুর্কি এবং রাজপুত রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে, ঠিক একইভাবে তাঁর চিত্রকলাতেও পারস্য এবং রাজপুতরীতির মিলন হয়েছিল।[২]

কাশ্মীরের নিসর্গের প্রতি জাহাঙ্গীরের প্রবল আকর্ষণ ছিল। কাশ্মীরের উপত্যকার সৌন্দর্যে বাদশাহের কবিমন বিমোহিত থাকতো। বহুবার তিনি কাশ্মীরের মায়াবী পরিবেশে এসে বিশ্রাম নিয়েছেন। এখানে তিনি সুরম্য উদ্যান রচনা করেছিলেন। ফুলের সৌন্দর্যে বিমোহিত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আদেশে ওস্তাদ মনসুর একশত প্রকারের অধিক ফুলের ছবি অঙ্কন করেছিলেন।[৩]

১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে মহান মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শূন্যতায় মুঘল চিত্রকলার গৌরবোজ্জ্বল যুগের অবসান হয়। পরবর্তীকালে মুঘল চিত্রকলার চর্চা থাকলেও, তা নিষ্প্রাণ হয়ে যায়।[৪] মুঘল চিত্রকলার চূড়ান্ত উৎকর্ষতা ও গৌরবের সঙ্গে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২.৯ শাহজাহানের আমলে মুঘল চিত্রকলা (১৬২৮-১৬৫৮)

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে চিত্রশিল্পীদের যে গৌরব ও প্রতিপত্তি ছিল, বাদশাহ শাহজাহানের দরবারে তা অনেকাংশে ম্লান হয়ে যায়। শাহজাহানের মূল অনুরাগ ছিল স্থাপত্যকলা এবং কারুশিল্পের প্রতি। ফলত, তিনি চিত্রকলা অপেক্ষা স্থাপত্য ও কারুশিল্পের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। দিল্লি দুর্গ, দিওয়ান-ই-আম, মোতি মসজিদ, তাজমহল প্রভৃতি অসাধারণ স্থাপত্যের সম্পর্কে দুনিয়াজোড়া সুখ্যাতি আছে। শাহজাহান যখন যুবরাজ খুররম নামে পরিচিত ছিলেন, তখন তিনি চিত্রকলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন। তিনি পিতা জাহাঙ্গীরের মতোই ইউরোপীয় অণুচিত্র ভালোবাসতেন। ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রো'র বক্তব্য থেকে সে সম্পর্কে জানা যায়। একবার টমাস রো যুবরাজ খুররমকে একটি রূপার ক্ষুদ্রাকার ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। তখন খুররম রো কে জানালেন যে, ঘড়ির পরিবর্তে একটি চিত্রকর্ম পেলেই তিনি অধিক খুশি হতেন।[৫] অর্থাৎ, তিনি (যুবরাজ খুররম) অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট হতে একটি ক্ষুদ্রাকার ঘড়ি উপহার হিসাবে গ্রহণ করেন।

---

[১] Percy Brown, *op. cit.*, p. 71-72

[২] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

[৩] Percy Brown, *op. cit.*, p. 73-74

[৪] *ibid*, p. 86

[৫] *ibid*, p. 87

এই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমি (টমাস রে) গতরাতে পিতাকে (জাহাঙ্গীর) যে চিত্রকর্ম উপহার দিয়েছিলাম, সেরূপ উপহার পেলে অধিক খুশি হতেন, এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ আরো আছে কিনা।[১]

বস্তুত শাহজাহানের আমলে মুঘল চিত্রকলা জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্রশিল্পেরই পুনরাবৃত্তি। তবে প্রাতিষ্ঠানিকতায়, অঙ্কনশৈলী এবং রঙের ব্যবহারে এই সময়ের চিত্রকলা মুঘল চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত।[২] বলা হয়ে থাকে, বাদশাহ শাহজাহানের আমলে মুঘল চিত্ররীতির মহিমা তুঙ্গে ওঠে। এর কারণ, পূর্ববর্তী বাদশাহ হুমায়ূন, আকবর ও জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় যেসব প্রখ্যাত ও সুদক্ষ শিল্পীগণ কাজ করেছেন, বাদশাহ শাহজাহান উত্তরাধিকার সূত্রে সেসব শিল্পীদের পেয়ে তাঁদের উৎসাহিত করেন। একই সঙ্গে সকল শিল্পীকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় লালন করেন।[৩] স্থাপত্যকলার উদার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ইতিহাসে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অবস্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং শীর্ষস্থানীয়। তবে তাঁর আমলের প্রতিকৃতি চিত্র- যেমন একক চিত্র, পারিবারিক চিত্র অথবা রাজপরিবারের চিত্র অত্যন্ত নান্দনিক এবং মনোমুগ্ধকর। এগুলো মুঘল চিত্রকলার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত। এই সকল চিত্রকর্মে অঙ্কিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতির মধ্যে যথাযথ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে এবং তা অসাধারণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।[৪]

মুঘল তথা ইসলামী স্থাপত্যের অমর কীর্তি তাজমহল শাহজাহানের শিল্পী মনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শিল্পবোদ্ধাগণ মনে করেন, তাজমহল হচ্ছে স্থাপত্যশৈলীর সমৃদ্ধির একটি চূড়ান্ত রূপ এবং একইসঙ্গে শিল্পী মনেরও চরম অভিব্যক্তির প্রকাশ। অর্থাৎ যিনি তাজমহলের রূপ অন্তরে অনুভব করেছেন, তিনি যে চিত্রশিল্পের জন্যও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দেবেন, এটিই স্বাভাবিক।[৫] শাহজাহানের চিত্রকলাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. পাণ্ডুলিপি চিত্র ও
খ. মুরাক্কা চিত্র বা সংকলিত অ্যালবাম

পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণে ঐতিহ্যগতভাবে পারসিক গ্রন্থাবলী চিত্রিত হয়েছে এবং পাশাপাশি ভারতীয় কাহিনি অবলম্বনে রচিত গ্রন্থও চিত্রিত করা হয়। মুঘল পাণ্ডুলিপি চিত্রের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, মুঘল দরবারি ইতিহাসের চিত্রায়ণ। এই প্রেক্ষিতে শাহজাহানের আত্মচরিত *পাদশাহনামা* তাঁর আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রায়িত গ্রন্থ।

---

[১] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

[২] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[৩] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[৪] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

এই গ্রন্থের চিত্রায়ণে মুঘল দরবারি চিত্র যেরূপ আনুষ্ঠানিকতায় ও বিশেষ নান্দনিকতায় চিত্রিত হয়েছে, তা পূর্ববর্তী কোন আমলেই দেখা যায় না। বাদশাহ ও অমাত্যদের পোশাক-পরিচ্ছদ, দরবারে তাঁদের অবস্থান, দাঁড়ানো বা উপবিষ্ট অবস্থার ভঙ্গি এবং সামগ্রিকভাবে রাজদরবারের যে পরিবেশ বিরাজমান, এসব কিছুই মুঘল রাজদরবারের ঐতিহ্য এবং বিশেষ পরিচয় বহন করে।[১]

সিংহাসনে আরোহণের প্রথম কয়েক বছর শাহজাহান চিত্রকরদের পূর্বের ধারা মোতাবেক কাজ করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের চিন্তাধারা থেকে শাহজাহানের চিন্তাধারার পার্থক্য থাকার ফলে চিত্রশৈলী ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। শাহজাহান নিজেকে পৃথিবীর অধীশ্বর হিসাবে প্রতিকৃতি চিত্রে প্রকাশ করতে ভালোবাসতেন। সেসব চিত্রে লক্ষ করা যায়, পরীরা স্বর্গ থেকে মুকুট নিয়ে আসছে। অত্যন্ত জমকালো পোশাক পরিধান করে বিশাল রাজদরবারে তিনি উপবিষ্ট- এরূপ চিত্রকর্মও শাহজাহানের বিশেষ পছন্দের ছিল।[২]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, শাহজাহানের রাজত্বের অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রিত পাণ্ডুলিপি হচ্ছে- তাঁর জীবনচরিত *পাদশাহনামা*। বস্তুত *পাদশাহনামা* শাহজাহানের দরবারি বা বাদশাহি ইতিহাস। আকবরের যেমন *আকবরনামা*, শাহজাহানের তেমনি *পাদশাহনামা*। এই পাণ্ডুলিপির লেখক ছিলেন তিনজন। ১৬৩৫ সালে শাহজাহান পারস্যের সাহিত্যিক মুহম্মদ আমীন কাযভিনীকে তাঁর এই জীবনীগ্রন্থ রচনা করার জন্য নির্দেশ দেন। কাযভিনী ১৬৪৬ সাল পর্যন্ত দশ বছরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন এবং তা বাদশাহের নিকট পেশ করেন। কিন্তু বাদশাহের এই রচনা পছন্দ হয়নি। তিনি কাযভিনীকে অন্য কাজে নিয়োজিত করেন। আবুল ফজলের শিষ্য আবদুল হামিদ লাহোরীকে আকবরনামা অনুসরণে অধিক অলঙ্কারসমৃদ্ধ, মনোমুগ্ধকর ভাষায় গ্রন্থটি পুনর্লিখনের দায়িত্ব প্রদান করেন। লাহোরী ১৬৫৪-৫৫ পর্যন্ত এই ইতিহাসকে বর্ধিত করেন। কিন্তু উল্লিখিত বছরে লাহোরীর মৃত্যু হয়। ফলে তাঁর শিষ্য মুহম্মদ ওয়ারিসের ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। ওয়ারিস শাহজাহানের শেষ বছর (১৬৫৭) পর্যন্ত লিখে *পাদশাহনামা'*র সমাপ্তি টানেন। উইন্ডসর প্রাসাদের রয়েল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপিটি উক্ত বছরে তৈরি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।[৩]

এই জীবনীচিত্রণে প্রতিটি দরবারচিত্রে সমবেত মানুষদের অবয়বগুলো নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এই গ্রন্থচিত্রণের প্রধান শিল্পী ছিলেন বিচিত্রের পুত্র মক্‌র্। এই চিত্রগুলোর অপর একটি সংস্করণ সংরক্ষিত আছে অক্সফোর্ড বডলিয়ান লাইব্রেরিতে, যার রচনাকাল থেকে বোঝা যায় যে, মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রণের রীতি মুঘল রাজদরবারে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কার্যকর ছিল। অবশ্য সপ্তদশ

---

[১] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

[২] অনিরুদ্ধ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩৭

[৩] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

শতকের শেষভাগ থেকেই মুঘল দরবারি চিত্রের অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন প্রদেশে। এক ধরনের প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলা গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে দরবারি প্রতিকৃতি চিত্রগুলো নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১]

পাদশাহ্‌নামা পাণ্ডুলিপিতে ৪৪টি চিত্রকর্ম অঙ্কিত হয়েছে। তার মধ্যে ৩৭টি শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দশ বছরের চিত্র। ৪টি শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বের চিত্র এবং বাকি কয়েকটি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের চিত্র। তিনটি ব্যতীত কোনো চিত্রকর্মে অঙ্কনকালের তারিখ উল্লেখ নেই। যে তিনটি চিত্রকর্মে তারিখ লিখিত আছে, তা থেকে ধারণা করা হয় যে, সবগুলো চিত্রকর্ম পাণ্ডুলিপি তৈরির সময়ই অঙ্কিত হয়েছে। চিত্রের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রধানত দেখা যায় দরবারের দৃশ্য, শোভাযাত্রার দৃশ্য এবং যুদ্ধের দৃশ্য। প্রতিকৃতিগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এই প্রতিকৃতিগুলো মুঘল চিত্রকলার ইতিহাসে একদিকে যেমন প্রতিকৃতি চিত্রের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন, ঠিক তেমনি সমগ্র ইসলামী চিত্রকলায়ও তার পূর্ণ বিকাশের নির্দেশনা দেয়। ফলত শাহজাহানের আলমকে ইসলামী চিত্রকলার চরম উৎকর্ষ পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।[২]

পাদশাহ্‌নামা পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণে যে সকল শিল্পীর নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন- বলচাঁদ, বিচিত্র, পয়াগ, মুরাদ, রামদাস, নোলা বা বোলা, আবিদ, লালচাদ, মীর দাস্‌ত এবং দৌলা। এঁদের মধ্যে বলচান্দের সুখ্যাতি জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই জানা যায়। *পাদশাহনামা* পাণ্ডুলিপিতে বলচাঁদ অঙ্কিত "যুদ্ধের প্রাক্কালে পিতার নিকট থেকে খুররমের বিদায়" শীর্ষক চিত্রকর্মটি শাহজাহানের আমলের একটি উৎকৃষ্ট ও অনন্য সাধারণ উদাহরণ। চিত্রকর্মের মূল চরিত্র পিতা জাহাঙ্গীর এবং পুত্র খুররম (পরবর্তীকালে বাদশাহ শাহজাহান)। এই চিত্রে পিতা-পুত্রের সহজাত আবেগ ও অতুলনীয় বন্ধনের নান্দনিক প্রকাশ আছে। এছাড়া সভাসদগণের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর কায়দা মুঘল রাজদরবারের রীতি ও ঐতিহ্যের দিকটিও প্রতিভাত করেছে। এতে মুঘল সভাসদগণের পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহাভ্যন্তরের জাঁকজমকপূর্ণ সৌন্দর্য, স্থাপত্যের অলঙ্করণ ও জালি-নকশার একটি চমৎকার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মুঘল স্থাপত্য অলঙ্করণে খচিত ও জালি-কার্য নকশা একটি বিশেষ শৈলীর প্রতিষ্ঠিত রূপ নির্দেশক। দরবারে যিনি ছড়ির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি যে পদমর্যাদায় অগ্রগণ্য তা-ও চিত্রকর্মে বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। শাহজাহানের আমলের সভাসদগণের কোমরবন্ধনীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তা হচ্ছে, গীটের নিচের বন্ধনীর দুই প্রান্তে সমানভাবে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকা। এই নিম্নমুখিতা পারসিক বা দাক্ষিণাত্য চিত্রকলার মতো দীর্ঘায়িত নয়। খাটো এবং অনেকটা সমান্তরালভাবে স্থাপিত। চিত্রকর্মে নিচের বামকোণে যে

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

[২] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

মানুষটির প্রতিকৃতি দেখা যায়, তা শাহজাহানের আমলের অন্যান্য চিত্রের মতো শিল্পীর আত্মপ্রতিকৃতি অর্থাৎ এটি বলচাঁদের প্রতিকৃতি।[১]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ প্রয়োজন যে, তাজমহলের ন্যায় শাহজাহানের 'ময়ূর সিংহাসন'ও ঐশ্বর্য এবং কারুশিল্প হিসাবে সারাবিশ্বে খ্যাত। এটিকে ফারসি ভাষায় বলা হতো 'তখ্ত্-ই-তাউস'। যা ছিল দুনিয়ার সর্বকালের সবচেয়ে দামি সিংহাসন। এটি নির্মাণ করেছিলেন ফরাসী শিল্পী লা গ্রাঁজ (La Grange)। ফরাসী পর্যটক তাভার্নিয়ার ময়ূর সিংহাসন দেখেছেন এবং এর বিবরণ লিখেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে- এর শামিয়ানার ধারে হীরা-মুক্তার ঝালর আছে। সিংহাসনের চতুষ্কোণ চূড়ার ওপর দুটি ময়ূর সিংহাসন দেখেছেন এবং এর বিবরণ লিখেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে- এর শামিয়ানার ধারে হীরা-মুক্তার ঝালর আছে। সিংহাসনের চতুষ্কোণ চূড়ার ওপর দুটি ময়ূর দাঁড়ানো। পেখম নীলকান্তমণি ও অসংখ্য রঙিন পাথরে অলঙ্কৃত। পুরো সিংহাসনটি সোনার তৈরি ছিল। অনেক মূল্যবান পাথর যুক্ত। বুকের ওপর আছে দামি রুবি পাথর। বারোটি স্তম্ভের ওপর সিংহাসনের ছাদ স্থাপিত। ধারণা করা হয়, এর মূল্য ছয় মিলিয়ন স্টার্লিং।[২] অবশ্য এটি চিরতরে হারিয়ে গেছে। তার খোঁজ মেলেনি। শাহজাহানের আমলে মুঘল মিনিয়েচরে কিছু নতুনত্ব আসে। এক্ষেত্রে হাশিয়া[৩] (border decoration) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রশস্ত হাশিয়া রঙিন ফুল, প্রজাপতি, কীট-পতঙ্গ ও মানুষের অবয়ব দ্বারা অলঙ্কৃত করা হতো। জাহাঙ্গীরের তুলনায় শাহজাহানের চিত্রকলায় হাশিয়া অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য ছিল। শাহজাহানের রাজদরবারে প্রধান শিল্পী ছিলেন মুহম্মদ ফকিরুল্লা খান। তাঁর সহকারী শিল্পী ছিলেন মীর হাসিম। প্রতিকৃতি চিত্রের ক্ষেত্রে মীর হাসিম ছিলেন একজন ওস্তাদ শিল্পী। ফকিরুল্লা খান সকল শিল্পীর চিত্রকর্ম পর্যবেক্ষণ করতেন। চিত্রকর্মের হাশিয়া ও ক্যালিগ্রাফি মীর হাসিম এবং অন্যান্য সহকারী শিল্পীদের দ্বারা সম্পন্ন হতো।[৪] বাদশাহ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দারা শিকো চিত্রকলার গভীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি অনেক চিত্রকর্ম সংগ্রহ করেছিলেন। হূনহর কর্তৃক অঙ্কিত তাঁর একটি প্রতিকৃতি চিত্র এখনো টিকে আছে। শাহজাহানের

---

[১] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

[২] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

[৩] হাশিয়া (Border Decoration) হলো ইসলামী চিত্রকলার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। চিত্রকর্মে প্রান্তিক অংশ ঘিরে যে আরব্য নকশা (Arabesque) অঙ্কিত হয়, তা-ই হাশিয়া। এতে ছকে বাঁধা রীতিতে (stylized) অঙ্কিত ফুল, লতা-পাতা, মানুষ ও পশুপাখির মনোমুগ্ধকর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখাচিত্র থাকে। সাধারণত হালকা রঙে হাশিয়া অঙ্কিত হতো। সাফাভী ও মুঘল চিত্রকলার হাশিয়ায় প্রয়োজন সাপেক্ষে স্বর্ণের গিল্টি করা হতো।
নাজমা খান মজলিস, 'মুঘল মিনিয়েচরে হাশিয়া (১৫৫৬-১৬৫৮ খ্রি.)', (সম্পা. মমতাজুর রহমান তরফদার ও অজয় রায়), ইতিহাস, ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, পৃ. ৫, Som Prakash Verma, *Mughal Paintings,* New Delhi: Oxford University Press, 2014, p. 111

[৪] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

রাজত্বের সবথেকে উল্লেখযোগ্য মুরাক্কা হচ্ছে- তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র যুবরাজ দারা শিকোর নামে যে অ্যালবাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেটি। উক্ত মুরাক্কা বর্তমানে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। দারা শিকো এই মুরাক্কাটি একত্রে সংকলিত করে তাঁর স্ত্রী নাদিরা বানু বেগমকে ১৬৩০ সালে উপহার দেন। উল্লেখ্য, শিল্প ও সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ও দরদী দারা শিকোর মৃত্যু শোচনীয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতায় তাঁর জীবনের উজ্জ্বল কর্মপ্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধে দারা পরাজিত হন। জীবনরক্ষার জন্য তিনি সিন্ধুর মরুভূমিতে আত্মগোপন করেন। সেখানেও আওরঙ্গজেব তাঁকে অনুসরণ করেন। দারা খবর পান, তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্ত্রী অসহনীয় গ্রীষ্মের দাবদাহ ও তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করেছেন। যাঁকে দারা সবথেকে বেশি ভালোবাসতেন। যিনি দারার দুর্ভাগ্য নিজে ধারণ করেছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক ফোঁটা জলও পাননি। একটি ক্ষুদ্র মুরাক্কায় নামাঙ্কিত প্রথম পত্রে (Title Page) লিখিত আছে, "This album was presented to his dearest and nearest friend, the lady Nadirah Begum, by Prince Muhammad Dara Sikoh, Son of the Emperor Shah Jahan in the year 1051 (A.D. 1641-1642)।" এই মুরাক্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে অনেক ইউরোপীয় অণুচিত্রের সংগ্রহ ছিল। যা দারা শিকোর উদার মানসিকতাও অনুভব করা যায়। অণুচিত্রগুলোর একটি ছিল St. Catherine of Siena, তারিখ লেখা আছে ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দ। দারা শিকো হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ আকবরের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি উপনিষদ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন।[১]

শাহজাহানের আমলে পারসিক কাব্যের দুটি পাণ্ডুলিপি চিত্রায়িত হয়েছে। শেখ সাদীর বুস্তান এবং গুলিস্তান। এই দুই পাণ্ডুলিপির চিত্রায়ণ ১৬২৮ থেকে ১৬৩০ সালে মধ্যে আগ্রায় সম্পন্ন হয়েছিল, যা পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আছে। এই পাণ্ডুলিপি দুটির লিপিকার হাকিম রুকন উদ-দ্বীন মাসুদ। সাধারণভাবে 'হাকিম রুকনা' নামে পরিচিত এই কবি পারস্যের কাশান থেকে শাহ আব্বাসের দরবার থেকে আকবরের রাজদরবারে আগমন করেছিলেন। তিনি বাদশাহ শাহজাহানের প্রিয় পাত্র ছিলেন। এই সূত্রে তিনি *বুস্তান* ও *গুলিস্তান* পাণ্ডুলিপি দুটি তৈরি করে চিত্রায়ণের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরি এবং দ্বিতীয়টি ডাবলিনের চেস্টার বেটি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে।[২]

শাহজাহানের আমলের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপি হচ্ছে জাফর খান রচিত *মসনভি*। এই কপিটি ১৬৬৩ সালে লাহোরে তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। এটি লন্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। জাফর খান ছিলেন শাহজাহানের একজন বিশ্বস্ত অমাত্য।

---

[১] Percy Brown, *op. cit.,* p. 94-95

[২] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

তিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে কাশ্মীর এবং সিন্ধুর গভর্নর ছিলেন। কবি হিসাবে কাশ্মীর ছিল তাঁর প্রিয় বাসস্থান। ফলত এই পাণ্ডুলিপিতে চিত্রায়িত ছয়টি উভয় পৃষ্ঠার ছবির মধ্যে পাঁচটিই তাঁর প্রিয় বাসস্থান কাশ্মীর কেন্দ্রিক। এই চিত্রকর্মসমূহ ১৬৪৪ সালে শাহজাহানের কাশ্মীর গমনের দৃশ্যপটে অঙ্কিত হয়েছে। দুটি চিত্রে শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো এবং জাফর খান ও তাঁর ভ্রাতাকে অঙ্কন করা হয়েছে। ছবি দুটি কাশ্মীরের দুটি প্রমোদ উদ্যানে নির্মিত জলাশয়ের সম্মুখে চিত্রিত। উল্লেখ্য, কাশ্মীরে মুঘল আমলে বিশেষত শাহজাহানের রাজত্বে বেশ কয়েকটি প্রমোদ উদ্যান নির্মাণ করা হয়েছিল।[১]

আলোকচিত্র ২.৪: শাহজাহান সিংহাসনে উপবিষ্ট

সূত্র: www.mughalpaintings.com

শাহজাহানের রাজত্বে মুঘল চিত্রকলার চরম উৎকর্ষ লক্ষ করা যায় মুরাক্কা বা অ্যালবামে সংরক্ষিত প্রতিকৃতি চিত্রে। এই প্রতিকৃতি চিত্রসমূহ জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্রের পুনরাবৃত্তি মনে হলেও অনুপুঙ্খতা ও সূক্ষ্মতায় তা পূর্ববর্তী সময়কে অতিক্রম করেছে। বলা যায়, এগুলো মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রকে একটি নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে।[২]

ফরাসী চিকিৎসক ও পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার ১৬৫৬ থেকে ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি শাহজাহানের রাজত্বকালে শিল্প ও শিল্পীদের সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

[১] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি মুঘল অণুচিত্রের প্রশংসা করেছেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ বাদশাহ ও ওমরাহগণের দরবারে কাজের সুযোগ পেতেন। যেসব শিল্পী অদক্ষ, তাঁদের সংখ্যা বিপুল, তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে শিল্পীগণ রাজদরবারে স্থান পেতেন, কিন্তু শাহজাহান মূলত দক্ষ ও খ্যাতিমান শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলত, অনেক শিল্পী কাজের সন্ধানে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান শহরে ছড়িয়ে পড়েন। আর্ট তখন আর দরবারি শিল্প রূপে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা democratic art বা জনগণের শিল্পকলায় পরিণত হয়। অসংখ্য শিল্পী বাজারে চিত্রের দোকান স্থাপন করেন এবং জনগণের অভিরুচি মোতাবেক চাহিদা মেটান। বলা যায়, তখন শিল্পের এক ধরনের বাণিজ্যিক রূপ তৈরি হয়েছে। বার্নিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লির চিত্রকর ও কারুশিল্পীদের অবস্থার বর্ণনাও করেছেন। দিল্লির বড় বড় প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন কারুশিল্পীরা একসঙ্গে বসে কাজ সম্পন্ন করতেন। বার্নিয়ারের বরাত দিয়ে বলা যায়- "একটি ঘরে ফুলের কারিগরদের কাজ হচ্ছে, একজন তত্ত্বাবধায়ক তা পরিদর্শন করছেন। অন্য একটি ঘরে স্বর্ণকারগণ কাজ করছেন এবং তৃতীয় ঘরে আছেন চিত্রকরগণ।"[১]

বার্নিয়ার আরও লিখেছেন- প্রকৃত সমঝদারের অভাবে চিত্রকর ও কারিগরদের দারিদ্র্যের সঙ্গে জীবনযাপন করতে হয়েছে। সুদক্ষ চিত্রকর ও কারিগরের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁরা সুষ্ঠু পৃষ্ঠপোষকতা ও চিত্রের ন্যায্য মুল্য পাননি। ওমরাহগণ বাজারে সস্তাদরে চিত্রকর্ম চেয়েছেন। তাঁদের খামখেয়ালির জন্য শিল্পী ও শিল্প-ব্যবসায়ীদের বেত্রাঘাত পর্যন্ত সহ্য করতে হয়েছে। তাঁদের দরোজায় কোড়া নামক চাবুক সর্বদা টানানো থাকতো।

এসবের প্রেক্ষিতে নিম্ন শ্রেণির শিল্প ও শিল্পীদের উৎপত্তি হয়েছে। বার্নিয়ার এঁদের 'বাজার-শিল্পী' আখ্যা দিয়েছেন।[২] জাহাঙ্গীরের মতো শাহজাহান যে খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় চিত্র এবং ইউরোপীয়দের প্রতিকৃতি অঙ্কনের ব্যবস্থা করেছিলেন তা নয়। শাহজাহানের দরবারে রাগমালা চিত্রকর্মেরও সংকলন হয়। যেসব রাগমালা চিত্র শাহজাহানের সংগ্রহে ছিল তার থেকে পঁচিশটি চিত্র ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। সংগ্রাহক রিচার্ড জনসন এই চিত্রকর্মগুলো বারানসীর ইব্রাহিম আলী খানের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এগুলো শাহজাহানের সময়কার দিল্লি শহর থেকে সংগৃহীত হয়। এই সংগ্রহের মধ্য দিয়ে এমন ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, রাজপুত চিত্র ঐতিহ্যে রাগমালা যেমন মর্যাদা পেয়েছে ঠিক তেমনি শাহজাহানের আমলে এই রীতি ও বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে। মুঘল রাজদরবারে রাগমালা চিত্রসম্ভার গৃহীত হওয়ার ফলেই হয়তো রাজপুত চিত্রকলায় রাগমালার বিষয় ও প্রতি রাগের চিত্রপ্রতীকগুলো অধিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করে। পঁচিশটি রাগমলার নাম যথাক্রমে: ভৈরব রাগ, ভৈরবী রাগিণী, পটমঞ্জরী রাগিণী, ললিতা রাগিণী, মালকোষ রাগ, খাম্বাবতী রাগিণী, মালশ্রী রাগিণী,

---

[১] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[২] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

রামকেলী রাগিণী, বিলাওল রাগিণী, তোড়ি রাগিণী, দেশাখ্য রাগিণী, দেবগান্ধার রাগিণী, মধুমাধবী রাগিণী, দীপক রাগ, ধনশ্রী রাগিণী, বসন্ত রাগিণী, কামোদ রাগিণী, শ্রীরাগ, পঞ্চম রাগ, আশাবরী রাগিণী, বাঙ্গালী রাগিণী, কেদার রাগিণী, কামোদ রাগিণী, বিভাস রাগিণী, শ্বেতমল্লার বা সুধামল্লার রাগিণী।[১]

২.১০ আওরঙ্গজেবের আমলে মুঘল চিত্রকলা (১৬৫৮-১৭০৭)

বাদশাহ শাহজাহানকে ১৬৫৮ সালে তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব সিংহাসনচ্যুত করে আগ্রা দুর্গে অন্তরীণ করে রাখেন। এরপর আওরঙ্গজেবের সঙ্গে অপরাপর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের দখল নিয়ে ব্যাপক বিবাদ শুরু হয়। অবশেষে ১৬৫৮ সালেই পানিপথের যুদ্ধে ভ্রাতা দারা শিকোকে পরাজিত করে আলমগীর মুঘল সাম্রাজ্যের বাদশাহ হন। আলমগীর সিংহাসন লাভের পর নিজের নাম দিলেন আওরঙ্গজেব। শুরুতেই তিনি দাক্ষিণাত্য জয়ে মন দিলেন। সাধারণভাবে অনেকেই ধারণা করেন, আওরঙ্গজেব চিত্রকলা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, অর্ধসত্য বলা যায়। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের তুলনায় চিত্রকলার ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবের জ্ঞান ও উৎসাহ অবশ্যই কমই ছিল। তথাপি তাঁর পূর্বপুরুষগণ যে প্রতিভাবান ও গুণী শিল্পীদের তৈরি করে গেছেন এবং তাঁদের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত করে বাদশাহি চিত্রশালায় মর্যাদার সঙ্গে স্থান দিয়েছিলেন, সেসব শিল্পী ও তাঁদের শিষ্যগণ এবং সন্তানসন্ততিরা নিশ্চয়ই কিছু কাজ করবেন।

শাহজাহান তাঁর শাসনামলে মুঘল চিত্রকলার যে উৎকর্ষ এনেছিলেন, বিশেষত প্রতিকৃতি চিত্রে, তার রেশ আওরঙ্গজেবের আমলে কিছুটা টিকে থাকলো। কিন্তু চিত্রকলা, প্রতিকৃতি চিত্র ইত্যাদির ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেলো। ফলে প্রতিকৃতি চিত্রের অবনতিও শুরু হতে থাকে।[২] শাহজাহানের পরবর্তীকালে অর্ধ-শতাব্দী ধরে মুঘল চিত্রশিল্প আর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। বাদশাহ আওরঙ্গজেব (শাসনকাল: ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর দীর্ঘ ৪৯ বছরের শাসনামলে প্রায় সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। অধিকন্তু তিনি প্রবল ধর্মানুরাগী হওয়ায় চিত্রশিল্পে পূর্বপুরুষের মতো উদার পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায়নি।[৩] যে সংস্কৃতি একজন বাদশাহকে ঘিরে নির্মিত হয়, সেটি তাঁর সঞ্জীবনী রস, জ্ঞান, উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশে বিকশিত হয়, অন্যথায় বিলুপ্ত হতে থাকে। আওরঙ্গজেব উত্তরাধিকারসূত্রে যেসব জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের তাঁর দরবারে পেয়েছেন, সেসব

---

[১] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

[৩] এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

শিল্পীরা বাদশাহের কাছে তাঁর পিতা ও প্রপিতামহের মতো চিত্রকলা বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি, সমঝদারি, তারিফ, বিচার ও উৎকর্ষের প্রয়োজন সাপেক্ষে সমালোচনা পেলেন না। ফলে শিল্পীগণ স্বাভাবিকভাবেই নিরুৎসাহিত হলেন। তাঁরা কাজ করে চললেন ঠিকই, কিন্তু মনেপ্রাণে তাঁদের কোনো স্পৃহা ছিল না।[১]

বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুঘল চিত্রকলার শ্রেষ্ঠকাল। এরপর থেকেই চিত্রকলায় অধোগতি আরম্ভ হয়। আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামি ও কঠোর শুদ্ধিবাদ (puritanical) প্রকৃতি মনোবৃত্তি চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জাহাঙ্গীর ছিলেন হিন্দু রাজপুত নারীর সন্তান। বলা হয়, এজন্য জাহাঙ্গীর বিভিন্ন সংস্কৃতি সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছেন। অপরপক্ষে আওরঙ্গজেব ছিলেন মুসলমান নারী আরজুমান বেগমের পুত্র। যাঁর স্মৃতিকে অমর করার লক্ষে তাজমহল নির্মিত হয়েছে। আওরঙ্গজেব মুসলমান হিসাবে সকল নীতি ও ধর্মীয় বিধান আক্ষরিকভাবে প্রতিপালন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পিতা শাহজাহান ও পিতামহ জাহাঙ্গীরের আমলে ধর্মীয় বিধান ও গোঁড়া ইসলামী ধর্মমত অনেক ক্ষেত্রেই শিথিল হয়েছিল। আওরঙ্গজেব তা সংশোধন সহকারে পুনরায় চালু করেন। এই পদক্ষেপ মুঘল চিত্রকলা ও মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনে। গবেষকদের মতে, আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দারা শিকো যদি সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন, তবে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস অন্য রকম হতে পারতো। চিত্রকলা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো এবং সাম্রাজ্য টিকে যেতো।[২]

এতদসত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের আমলে চিত্রকলার কিছু কাজ হয়েছে। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে প্রতিকৃতি চিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, চরিত্রচিত্রণ, সূক্ষ্ম তুলির রেখা এবং অর্ধস্ফুট বা অস্ফুট রং-তুলির আঁচড়ে চিত্রিত ব্যক্তির অন্তরাত্মা প্রকাশিত হয়েছে। সেই অন্তর্দৃষ্টি ও তুলির ঐশী শক্তি স্তিমিত হলেও আওরঙ্গজেবের আমলে প্রতিকৃতি চিত্রে কিছু নতুনত্ব আসে। মুঘল চিত্রকলায় আওরঙ্গজেবের প্রধান অবদান হলো দাক্ষিণাত্য জয়ের পর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দক্ষিণী চিত্ররীতি (Deccani qalam) তৈরি করা। এটি মুঘল চিত্ররীতির সার্থক প্রাদেশিক অপভ্রংশ হিসাবে স্বাধীন মর্যাদা পেলো।

শাহজাহানের প্রতিকৃতি চিত্রের রীতি আওরঙ্গজেবের আমলে অনেকাংশে পরিবর্তন হয়েছে। এই সময় সূক্ষ্ম কাজ ও জাকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে অন্তর্দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ সম্ভবত বাদশাহের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বিচারবোধের অভাব। চিত্রকলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঠ করার সময় ও গভীর আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম উদাহরণও রয়েছে। আওরঙ্গজেবের একটি প্রতিকৃতি চিত্রে লক্ষ করা যায়, বাদশাহ পাশ ফিরে উপবিষ্ট আছেন, দেহ প্রোফাইল ভঙ্গিতে অঙ্কিত হয়েছে। মুখাবয়ব ও চোখজোড়া স্পষ্ট ইউরোপীয় ভঙ্গিতে

---

[১] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

[২] Percy Brown, *op. cit.*, p. 98-99

ফেরানো। ডান কব্জির ওপর একটি বড় টিয়াপাখি (বাজ নয়, কারণ বাজের ঠোঁট আরও বড়, বাঁকানো এবং তীক্ষ্ণাগ্র)। এটি সত্য যে, জাহাঙ্গীরের চিত্রকলার মতো এতে চরিত্রস্ফূরণ নেই। পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য ও নিপুণতায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আওরঙ্গজেবের আমলেই ইউরোপীয় রীতিতে অঙ্কিত অনেক প্রতিকৃতির দেখা মেলে। এর কিছু কিছু দিল্লি কলমে অঙ্কিত। আর বেশিরভাগ দক্ষিণী কলমের। কারণ দাক্ষিণাত্যেই তখন অনেক বিদেশি বণিক ব্যবসা করতেন। চিত্রকরগণ তাঁদের চাহিদা মোতাবেক কাজ করতেন। বস্তুত এইভাবে এই মিশ্র মুঘল-দক্ষিণী রীতি গড়ে ওঠে এবং বিস্তৃতি লাভ করে।[১]

ভারতবর্ষের চিত্রকলার ইতিহাসে এই মুঘল-দক্ষিণী রীতি আওরঙ্গজেবের অবদান। আওরঙ্গজেব চিত্রকলায় পূর্বপুরুষদের মতো উৎসাহী না থাকায় অনেক চিত্রকর রাজদরবারি চিত্র কারখানা থেকে ক্রমে ক্রমে সরে পড়েন। তাঁরা প্রাদেশিক রাজধানীতে গমন করে প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার সমৃদ্ধি সাধন করলেন। এইসময় পাণ্ডুলিপি চিত্র ও মুরাক্কা সৃষ্টির কাজও দ্রুত কমে গেলো। আওরঙ্গজেবের আমলে প্রতিকৃতি চিত্র অসংখ্য অঙ্কিত হলেও, অধিকাংশ চিত্র পূর্বের নৈপূণ্য, প্রাণবন্ত প্রকাশ ও অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে।[২]

একটি কথা বলাই বাহুল্য যে, আওরঙ্গজেবের চিত্রকলার প্রতি ঔদাসীন্য থাকা সত্ত্বেও চিত্রকলা চর্চা একেবারে থেমে যায়নি বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধের চিত্রকর্মের সংখ্যা প্রথমার্ধের তুলনায় কম নয়, বরং বেশি। যদিও নৈপূণ্য ও উৎকর্ষতায় হীন। অনেক চিত্রকর্মে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বৃদ্ধ বয়সের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়া বাদশাহের বিষণ্ন প্রতিকৃতিও রয়েছে। তাঁর নানা অবস্থার চিত্র দেখা যায়, যেমন- বাদশাহের শিকার দৃশ্য, ভ্রমণ, গ্রন্থপাঠ, শাসন, সৈন্য পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের মতো তিনিও মুঘল অণুচিত্রের বিষয়বস্তু হয়েছেন। এ সকল চিত্রকর্ম নিশ্চয়ই আওরঙ্গজেবের আদেশে অঙ্কিত হয়েছে। অবশ্য সকল চিত্র বৃদ্ধ বয়সের, যুবা বয়সের চিত্র নেই। বৃদ্ধকালে হয়তো তিনি অনড় অবস্থান থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছিলেন।[৩]

আওরঙ্গজেবের আমলে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীদের মধ্যে ফকির-ই-হকির আমাল-ই-ক্ষেমানন্দ (বেচারা কৃপাপাত্র গরীব ক্ষেমানন্দ), রঘুনন্দন, রায় চিতরমন, মধুপুত্র ইলিয়াস বাহাদুর, জ্ঞানচাঁদ, অনুপ চওর,

---

[১] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

[৩] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

রায় ফৎ চাঁদ, হুনহার, ছাট মল, রায় চাতামল, ওস্তাদ গোলাব রায়, চেৎ, আফজল আলী খান, মাসুদ, লছমন সিং প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১]

বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁর শিল্পানুরাগী মনকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করতে পারেননি। একটি ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সুলতান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। বাদশাহ বাধ্য হয়ে তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখেন। পুত্রকে বন্দী করে রাখলেও, বাদশাহ পুত্রের প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ হারিয়ে ফেলেননি। তিনি চিত্রকরদের নির্দেশ দেন, তাঁরা যেন পুত্র সুলতানের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। পুত্রের সান্নিধ্য অনুভব করার জন্য বাদশাহের আদেশে পুত্রের প্রতিকৃতি এঁকে মাঝে মাঝে তাঁকে দেখাতে হতো।[২]

১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য ও চিত্রকলার অবক্ষয় সূচিত হয়। ১৭০৭ থেকে ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল চিত্রকলার কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) মুঘল চিত্রকলার দ্বিকেন্দ্রিকরণ শুরু হয়।[৩]

২.১১ প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার উৎপত্তি

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বাদশাহগণ ইতিহাসে দুর্বল শাসক হিসাবে পরিচিত। 'The Later Mughals' আখ্যায় তাঁরা বিবেচিত। এই পর্বে দরবারের ষড়যন্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তিনজন বাদশাহ নিহত হন। দিল্লির সিংহাসনের তখন গভীর সংকটকাল চলছে। এক পর্যায়ে মুহম্মদ শাহ তাঁর মৃত্যু অবধি (১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) দিল্লিতে কিছু ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আওরঙ্গজেবের শাসনামলের প্রারম্ভ থেকে মুহম্মদ শাহের মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬৫৮ থেকে ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় শত বছরের ইতিহাস। উল্লেখ্য, ১৫৫০ থেকে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল চিত্রকলার গৌরবময় যুগ এবং ১৬৫০ থেকে এর অধোগতি ও বিলুপ্তির কাল। মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে। তিনি জয়পুরের রাজা সিওয়াই জয়সিংহকে আকবরের গ্রন্থাগারের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি *মহাভারত*-এর অনুবাদ দান করেন। ফারসি ভাষায় এই অনুবাদ রাজমনামা আখ্যায় পরিচিত। এই পাণ্ডুলিপিতে হিন্দু শিল্পীরা চিত্রাঙ্কন করেছিলেন। এই চিত্রিত পাণ্ডুলিপি মুঘল চিত্রের গৌরব, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৪]

---

[১] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

[২] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

[৩] Percy Brown, *op. cit.*, p. 103

[৪] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

প্রকৃত অর্থে এই সময়ে দিল্লীর মুঘল ঐতিহ্য ও গৌরব ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে এসেছিল। বিভিন্ন প্রদেশে শাসকগণ স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করতে উদ্যোগী হন। অযোধ্যার নবাব ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দিল্লির মুঘল রাজ দরবারের সঙ্গে এক প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব নিয়ে অযোধ্যার নবাব লক্ষ্ণৌতে দরবার স্থাপন করলেন। দিল্লির দরবারি শিল্পীরা কর্মচ্যুত হয়ে লক্ষ্ণৌর দরবারে কাজের সুযোগসহ আশ্রয় পেলেন। অযোধ্যার মতো হায়দ্রাবাদেও স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হলো। এখানেও অনেক চিত্রকরের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

মুঘল চিত্রকলার শাখা লক্ষ্ণৌ ও হায়দ্রাবাদে স্থাপিত হলো, যা মুঘল চিত্র থেকে কিছুটা ভিন্নতর। এই সময় ভারতীয় শিল্পকলায় 'কলম' (qalam) শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হলো। 'কলম' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'স্কুল' অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পরীতি। ইউরোপে যেমন বলা হয় ফ্লোরেন্স স্কুল, ভেনিসিয়ান স্কুল, ঠিক তেমনি দিল্লি কলম, লক্ষ্ণৌ কলম, হায়দ্রাবাদ বা দক্ষিণী কলম (Deccani qalam)।[১]

১৭৪৮ সালে মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর মুঘল দরবারের চিত্র-কারখানায় শিল্পী নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তবুও প্রসিদ্ধ শিল্পীরা দিল্লি শহর ও আশেপাশের রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে কিছু কাজের সুযোগ পেলেন। ইতিমধ্যে অনেক বিখ্যাত শিল্পী ফৈজাবাদ (অযোধ্যা) ও লক্ষ্ণৌতে কাজের সুযোগ পেয়ে চলে গেলেন। দিল্লি কলমে চরিত্রচিত্রণে, পুরাণে, ইতিহাসে, জীবনীগ্রন্থে, প্রকৃতির যাবতীয় ঐশ্বর্য, পশু-পাখি অঙ্কন অনেক কমে গেলো। বস্তুত, ১৭৪৮-১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত যে সকল ছবি দিল্লি কলম নামে পরিচিত, সেসব মুঘল চিত্রকলা হিসাবে অভিহিত হলেও অধিকাংশ অন্যত্র আঁকা হয়েছে। ফলত কিছু প্রতিকৃতি চিত্রে তখনও যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখা যায়, যেমন: আহমদ শাহর (শাসনকাল: ১৭৪৮-১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিকৃতি, নজম-আল-দ্বীন আলী খানের প্রতিকৃতি এবং একটি মহিলার প্রতিকৃতি।[২]

উল্লেখ্য, সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সে সময় এক দল শিল্পী পাটনাতে (বিহার) গমন করেন। সেখানে তাঁরা পাটনাই কলম আরম্ভ করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাটনাই কলমের বৈশিষ্ট্যসমূহ রূপ লাভ করেছিল।

প্রকৃত অর্থে বাদশাহ আকবরের আমল থেকেই মুঘল দরবারি শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও জমিদারদের চিত্রকারখানায় তাঁরা সাদরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এইভাবে বিভিন্ন রাজ্যের চিত্রশালায়- যেমন: অম্বর (জয়পুর), বুন্দি, কোটা এবং মেবারেও পাওয়া যায় মুঘল দরবারি শিল্পীদের স্বাক্ষরিত ছবি। অবশ্য মূলত সপ্তদশ শতক থেকেই রাজস্থানী

---

[১] Percy Brown, *op. cit.,* p. 103-104

[২] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

চিত্রকলায় মুঘল দরবারি চিত্রকলার স্থায়ী প্রভাব স্বীকৃতি লাভ করে। রাজস্থানী চিত্রশৈলীর উৎসমূলে আছে তিনটি ভিন্ন চিত্ররীতি। একদিকে পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্রণ রীতি, যা মূলত অলংকৃত জৈন ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে জৈন ভাণ্ডারগুলোতে সংরক্ষিত ছিল। অন্য দিকে ছিল রাজস্থানের সমৃদ্ধ লোকশিল্প ঐতিহ্য, যা দ্বারা উজ্জ্বল রঙের সমাবেশ ও স্পষ্ট রেখার বেষ্টনীর মাধ্যমে চিত্রকল্পকে উপস্থাপিত করা হতো দর্শকের সামনে। এই দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হলো মুঘল দরবারি শিল্পের আঙ্গিক। এই সংমিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল শুধু পৃষ্ঠপোষকের চাহিদার জন্য নয়। শিল্পী ও সমসাময়িক দর্শকদের নান্দনিক চাহিদাও এর বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখ্য, মুঘল শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে রাজপুতদের স্থান করে দিয়েছিলেন আকবর। আর সেই সূত্রে মুঘল-রাজপুত সম্পর্কের কিছু স্বার্থকতা প্রকাশ পায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে।[১]

মুঘল শেষপর্বে অর্থাৎ ১৮০৬ থেকে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং এর পরবর্তী সময়ে মুঘল চিত্রকলায় কিছু কাজ হয়েছে বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহ (শাসনকাল: ১৮০৬-১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের (শাসনকাল: ১৮৩৭-১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) কিছু কিছু শিল্পী দিল্লির দরবার আঁকড়ে ধরে থাকলেন। এই সময়ের দুটি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি আছে। দুটিই শিল্পী গোলাম মুর্তজা খান অঙ্কিত। এর একটি বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহের প্রতিকৃতি। এই চিত্রকর্মের স্বাক্ষরে লেখা: এই যুগের বিস্ময়, বিহজাদের সমকক্ষ, মহান দরবারের শিল্পী গোলাম মুর্তজা খান। অন্যটি যুবরাজ আবু জাফর সিরাজ-উদ-দ্বীন মুহম্মদ বাহাদুর শাহের (পরবর্তীকালে বাহাদুর শাহ জাফর) প্রতিকৃতি। এছাড়া বেশিরভাগ চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু ছিল পাঁচমিশেলী। চিত্রকর্মের উৎপাদন ছিল সংখ্যায় কম। স্পষ্টই বোঝা যায়, পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা বহুগুণ হ্রাস পেয়েছিল।[২]

দক্ষিণী রীতির চিত্রকলা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা প্রয়োজন। ষোল শতকে দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদের আওতায় চারটি রাজত্ব ছিল। যথা- আহমদনগর, বিজাপুর, বিদর ও গোলকুন্ডা। এই চার রাজ্যের দক্ষিণে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরে রাজাদের অনুগ্রহে হিন্দু চিত্ররীতি ও স্থাপত্যের ঐতিহ্য চালু ছিল। কিন্তু ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের চার রাজ্যের সম্মিলিত আক্রমণে বিজয়নগর ধ্বংস হয়। এরপরে বিজয়নগর থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় এবং দাক্ষিণাত্য ম্লান হয়ে যায়। আহমদনগরের বাদশাহ হুসেন শাহ ও বিজাপুরের বাদশাহ ইব্রাহিম আদিল শাহ দুজনেই বিভিন্ন কলারীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ফলত, বিজয়নগর ধ্বংসের

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৫

[২] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

পর সেখানকার পরিত্যক্ত চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সুরজ্ঞদের তাঁরা নিজ নিজ দরবারে মর্যাদার সঙ্গে আশ্রয় ও কাজের সুযোগ দেন।[১]

আঠারো শতকের শেষভাগে ওয়ারেন হেস্টিংস অযোধ্যা জয় করার পর এবং উনিশ শতকে লক্ষ্ণৌসহ বিভিন্ন রাজ্যে ইংরেজদের মারফত অনেক ইউরোপীয় মিনিয়েচর চিত্রকর্ম আমদানি হলো। লক্ষ্ণৌর অনেক দরবারি চিত্রকর ইউরোপীয় রীতি দ্রুত আয়ত্ত করে জন কোম্পানির সাহেবদের চিত্রকর্ম যোগাতে লাগলেন। তাঁদের প্রতিকৃতি অঙ্কনের কাজ শুরু করলেন। সাহেবগণ সে সব ছবি উৎসাহী হয়ে নিলেন। এ সকল মিনিয়েচরে ইউরোপীয় ধারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো। মুখাবয়ব সাধারণত একপাশ করে আঁকার কারণে তাঁদের সঙ্গে ইউরোপীয় রীতিতে তৈরি মেডালিয়ান বা মুদ্রণ ছবির ব্যাপক মিল লক্ষ করা যায়।[২]

দিল্লি, লক্ষ্ণৌ থেকে আঠারো শতকে কয়েকটি শিল্পী পরিবার ইংরেজদের কাছে কাজ পাবার আশায় পাটনায় এসে বসবাস আরম্ভ করে। এইভাবে উনিশ শতকে পাটনায় গড়ে ওঠা শিল্পরীতির নামই পাটনাই কলম পরিচিতি পায়। পাটনাই কলমের ছবি বিশেষ উন্নততর কিছু নয়, এগুলো প্রায় আড়ষ্ট, ভাবাবেগহীন নীরস ছবি। অবশ্য রঙ ও নকশায় মুনশিয়ানা দেখা যেতো। পাটনাই কলমের চিত্রে সর্বপ্রথম বাস্তবানুগ প্রতিচ্ছবি দেখা যায় বলে মনে করা হয়। কোম্পানি আমলে পাটনাই কলমের একটি অভিনব সঙ্কর বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। যা দেশীয় নয় বরং ইউরোপীয়ও নয় কিন্তু এই দুইয়ের মিশ্রণে সৃষ্ট। এই রীতিকে বলা হতো ইঙ্গ-বঙ্গ।[৩]

এছাড়াও কাশ্মীরে মুঘল রীতির এক ধরনের বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। এটি 'কাশ্মীরী কলম' আখ্যায় পরিচিতি পায়। এই চিত্রসমূহ প্রথম দিকে কাশ্মীরেই অঙ্কিত হতো। শেষের দিকে কাশ্মীরী শিল্পীরা পাঞ্জাবের লাহোর, অমৃতসরসহ বিভিন্ন রাজ্যে এই রীতির প্রচলন করেন।

প্রাদেশিক চিত্রকলার ধারা বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বকীয়তায় তৈরি হলো। এগুলো এক প্রকার সুন্দর ছবি হলো ঠিকই, কিন্তু মুঘল চিত্রকলার প্রকৃত নান্দনিকতা, রস ও গাম্ভীর্য হারালো। ভারতীয় মূল চিত্রধারার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।[৪]

এই পর্যায়ে মুঘল চিত্রকলার কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক কলম (শৈলী) নিয়ে আলোচনা করা সমীচীন।

---

[১] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

২.১১.১ মুর্শিদাবাদ শৈলী (১৭০৩-১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ)

মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে নবাবী আমল আরম্ভ হয়। তিনি সৎ ও সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন। রাজস্ব ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা মুঘল সুবাহ বাংলার সুবাদার পদে উন্নীত হন।[১] বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খান ১৭০৪ সালে ঢাকা থেকে তাঁর রাজধানী সরিয়ে আধুনিক মুর্শিদাবাদের লালবাগে প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদাবাদ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কেন্দ্রস্থলে হবে, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[২] তিনিও ছিলেন আওরঙ্গজেবের মতোই অনাড়ম্বর জীবনচর্চায় অভ্যস্ত গোঁড়া সুন্নি মুসলমান। তাঁর কাছে চিত্রকরদের বিশেষ কদর ছিল না। তবু তাঁর আমলেই দিল্লি থেকে সমাগত শিল্পীগণ ধর্মীয় কারণে কিছু পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খান মিতব্যয়ী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মহররম এবং 'খাজা খিজির' উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করতেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল জনগণের জন্য তিনি সে সময় ভোজের ব্যবস্থা করতেন। সমগ্র মুর্শিদাবাদ শহর তো বটেই, ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাড় পযৃন্ত সেই উৎসবের দিনগুলোতে আলোকসজ্জায় ঝলমল করতো। এই আলোকসজ্জার ব্যবস্থাপনা ও অভ্রফলকের লণ্ঠন চিত্রণের কাজে দিল্লির শিল্পীদের নিযুক্ত করা হতো। এইসব লণ্ঠন চিত্রিত হতো পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং মসজিদ, লতাবৃক্ষ ও অন্যান্য অনুষঙ্গের নকশাভিত্তিক অলংকরণের মাধ্যমে। এই উৎসবের আয়োজন এত বিপুল ছিল যে, নগরসজ্জাসহ প্রভৃতি কাজে প্রায় এক লক্ষ মানুষকে নিয়োজিত করা হতো। মুঘল চিত্রকলার প্রাদেশিক কলম মুর্শিদাবাদ শৈলীতে অঙ্কিত একটি ছবিতে উল্লিখিত উৎসবের দৃশ্যটি প্রতিভাত হয়েছে। ছবিটির বিষয়বস্তু হলো- মুর্শিদাবাদের নিজস্ব দরবারে নবাব মুর্শিদকুলী খান উপবিষ্ট আছেন। তাঁর পশ্চাৎপটে অর্থাৎ চিত্রের পটভূমিতে বহমান ভাগীরথীতে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে নৌকার সারি, নদীর ওপারে মহীনগর থেকে লালবাগ পর্যন্ত দীর্ঘ তিন মাইল পথও অভ্রের লণ্ঠনে এই সময় সজ্জিত করা হতো। ছবিটিতে এই বিষয়টিও চিত্রিত করা হয়েছে। এই চিত্রটির অঙ্কনকাল ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দ বলে ধারণা করা হয়।[৩]

---

[১] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ১৯৫

[২] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

[৩] Robert Skelton, 'Murshidabad Painting', *Marg*, Vol. X, No. 1, Bombay: 1956, p. 10

রবার্ট স্কেলটনের উল্লিখিত বিবরণ মোতাবেক চিত্রকর্মটি মুঘল চিত্রকলার পরম্পরায় উদ্ভূত মুর্শিদাবাদ কলমের একটি আদি নিদর্শন। প্রকৃত অর্থে মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলের পর থেকেই মুর্শিদাবাদ শৈলীর বিকাশ ঘটে।[১]

বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুর্শিদাবাদে যে শিল্পরীতি গড়ে ওঠে, তা পর্যবেক্ষণ করলে মুঘল দরবারি শিল্পের শেষ পর্যায়ের অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। যেরূপ দরবারি আদব-কায়দা মুঘল সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছিল, তা নতুন করে মুর্শিদাবাদ দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুর্শিদকুলী খান সপ্তাহে দুদিন করে দরবারে বসেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। ১৭১৩ সালে তিনি একই সঙ্গে দেওয়ান ও সুবাদার দুটি পদই গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে মনসবদারদের আদেশ করা হয় তাঁরা যেন সম্পূর্ণ দরবারি পোশাক-পরিচ্ছদে নবারের সম্মুখে উপস্থিত হন। দরবারে মর্যাদা অনুসারে অন্যান্য সভাসদেরও স্থান নির্ধারিত হয়। মুর্শিদাবাদ পূর্ব-ভারতের ইসলাম সংস্কৃতির একটি বৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হওয়ায়, এই শহরে অনেক দক্ষ শিল্পী, কারিগর, বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিরা আগমন করেন। এছাড়া বাণিজ্যের একটি বিশাল কেন্দ্র হিসাবেও মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সমসায়মিক জৈন কবি নিহালের সাক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে যে, মুর্শিদাবাদের বাজারগুলোতে নানা পোশাকের এবং নানা বর্ণের মানুষ সমবেত হতেন। মুর্শিদাবাদ শৈলীর চিত্রকর্মেও এই অসংখ্য মানুষের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে।[২]

এ কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করা যায় যে, বাংলার নবাবরা ছিলেনর শিল্পের বড় পৃষ্ঠপোষক। মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে বৃহদাকার মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। সেখানে মর্যাদার সঙ্গে বিদ্বান ও ধার্মিক ব্যক্তিদের আমন্ত্রণের মাধ্যমে আনা হতো। শুধু পবিত্র কুরআন পাঠের জন্য আড়াই হাজার মানুষকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মুর্শিদকুলী খানের পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান (শাসনকাল: ১৭২৭-১৭৩৯) ছিলেন অত্যন্ত শৌখিন ব্যক্তি। তিনি পুরনো প্রাসাদ ভেঙে নতুন প্রাসাদ ও নতুন বাগান নির্মাণ করেন। প্রচলিত কিংবদন্তি আছে যে, সেই বাগানে রাত্রিকালীন সময়ে পরীরা নেমে আসতো।[৩] সুজাউদ্দীন ও তাঁর পুত্র সরফরাজ খানের (শাসনকাল: ১৭৩৯-১৭৪০) আমলের মুর্শিদাবাদ শৈলীর কোনো চিত্রকর্ম আজও পাওয়া যায়নি। আলিবর্দী খান (শাসনকাল: ১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে মসনদে আসীন হবার পরই মুর্শিদাবাদ শৈলীর প্রকৃত বিকাশ ঘটেছিল। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়। অর্থাৎ তাঁর শাসনামলের শেষ সাত বছর- ১৭৫০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ শৈলীর শ্রেষ্ঠকাল। উল্লেখ্য মসনদে আরোহণের পর থেকে পরবর্তী দশ বছর

---

[১] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৫৫

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

আলিবর্দীকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল মারাঠা বর্গিদের সঙ্গে। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় নিজের ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য তাঁকে বহুবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। পরিণত বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে যোদ্ধা, সুশাসক ও চরিত্রবান মানুষ হিসাবে তিনি নিজেকে তৈরি করেন। অবক্ষয়ের যুগে তিনি বাংলার ইতিহাসে গভীর ছাপ রেখে গেছেন। নৃত্যকলা, সংগীত, হারেম সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি আগ্রহবোধ করতেন না। অবশ্য ধারণা করা হয় চিত্রকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। এর যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, শিল্পীদের সঙ্গে আলিবর্দীর ঘনিষ্ঠতার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর আমলে অঙ্কিত চিত্রকর্মগুলোতে। এই চিত্রকর্মসূহে আলিবর্দীর চরিত্র অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এর প্রমাণ মেলে সমসাময়িক ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের লেখায়।[১] আলিবর্দী খানের দরবারে আগমন করেছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ পারসিক কবি শেখ মুহম্মদ হোসেন ও হাজী বদরুদ্দীন। এই সময়ের মুর্শিদাবাদ চিত্রের সঙ্গে আরবি চিত্রকলার যথেষ্ট মিল আছে। শিল্প ঐতিহাসিকদের মতে এই ছবিগুলোতে লক্ষ্ণৌ থেকে আসা দরবারি শিল্পীদের কিছুটা প্রভাব পড়েছে। এভাবে মুঘল দরবারি শিল্পীদের মুর্শিদাবাদে যাতায়াতের মাধ্যমে বেশ কিছুদিন মুঘল দরবারি শিল্পের শৈলী ও বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় থাকে।[২]

এ পর্যায়ে আলিবর্দী খানের ব্যক্তিত্ব ও শৌর্যের পরিচয় বহনকারী মুর্শিদাবাদ শৈলীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ছবির বিবরণ দেওয়া যায়।

[১] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫, ৫৭

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

আলোকচিত্র ২.৫: হরিণ শিকাররত নবাব আলিবর্দী খান (মুর্শিদাবাদ শৈলী)

আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত হয়েছে শিকারের চিত্রকর্মটি। এখানে লক্ষ করা যায়, আলিবর্দী খান ঘোড়ায় চড়ে নদীর খাঁড়িতে প্রাণভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া একটা হরিণ শিকারে তৎপর রয়েছেন। তাঁর উত্থিত হাতে বল্লম ধরা। উত্তুঙ্গ বালিয়াড়ি এবং প্রশস্ত নদী দেখে স্থানটি শনাক্ত করা যায়।[১] বিশেষত গোলাম হোসেন সলীমের লেখা থেকে স্পষ্ট জানা যায়। তিনি লিখেছেন- নবাবের প্রতি বছর শীতকালে রাজমহল পাহাড়ে শিকার করার অভ্যাস ছিল। সপ্ততিপর নবাবের বলিষ্ঠ দেহ, রুচিসম্মত পোশাক, তাঁর অশ্বের তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি- সবকিছুই যেন শৌর্য আর ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। চিত্রকর্মের নিসর্গে বিধৃত দূরন্ত বিস্তৃত নদী, ধূসর উত্তুঙ্গ বেলাভূমি এবং বিশাল সবুজ বৃক্ষের রূপায়নেও এক মনোমুগ্ধকর গাম্ভীর্য প্রকাশিত হয়েছে।[২]

[১] Robert Skelton, *op. cit.*, p. 12

[২] Ghulam Husain Salim, *Riaz-us-Salatin (History of Bengal)*, translated by G. Stewart, Vol. 2, London: 1813, p. 141

আলোকচিত্র ২.৬: দরবারে উপবিষ্ট নবাব আলিবর্দী খান

অপর চিত্রকর্মে লক্ষ করা যায়, আলিবর্দী খানের সুনিয়ন্ত্রিত প্রাত্যহিক জীবনের অবসরকাল। যেখানে রাজকীয় পরিবেশ চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। নবাব প্রত্যহ সূর্যোদয়ের দুই ঘন্টা পূর্বে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও ইবাদত সেরে নিতেন। এরপর কফি পান করে দরবারে উপবিষ্ট হতেন।[১] এই দরবারে দুই ঘন্টা কার্যক্রম চলতো। তারপর নবাব বিশ্রাম নিতেন। বিশ্রামকালীন সময়ে তাঁকে প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু সঙ্গ দিতেন। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম এই চিত্রকর্মটির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাচীরবেষ্টিত উন্মুক্ত ছাদে জাজিমের উপর নবাব উপবিষ্ট আছেন। পেছনে দুই পরিচারক চামার ব্যঞ্জন করছে। তাঁর পাশে বসে আছেন ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজিস মুহম্মদ খান ওরফে শহমত জঙ্গ। আর সম্মুখে মুখোমুখিভাবে অপর ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহমদ খান ওরফে সৌলত জঙ্গ ও দৌহিত্র সিরাজ-উদ্‌দৌলা। বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবাম মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এই ছবিটির পেছনে লিখিত লিপি থেকে এইসব পরিচয় পাওয়া গেছে।[২]

---

[১] Robert Skelton, *op. cit.*, p. 12

[২] Ghulam Husain Salim, *op. cit.*, Vol. 2, p. 157

জ্যামিতিক শৃঙ্খলার একটি সুসংহত বিন্যাস আছে ছবিটিতে, যা নবাব আলিবর্দীর জীবনধারা ও সমুন্নত রুচির পরিচয় দেয়। দূরের আকাশের গাঢ় নীল, ছাদের একাংশের গাঢ় খয়েরি ও অপরাংশের সাদা রঙের বিস্তৃতি, সামনের চত্বরের নিচু পাঁচিল ও দূরের চৌহদ্দির স্তম্ভ ও কার্নিশের গাঢ় লাল, আর রাজসিক পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জাজিমের সুসংযত নকশা আলিবর্দীর আমলের মুর্শিদাবাদ শৈলীর উন্নততর ও বলিষ্ঠ চরিত্রটিকে সবিশেষ ফুটিয়ে তুলেছে।[১]

আলিবর্দীর আমলের এই চিত্রাদর্শই মুর্শিদাবাদ কলমের একমাত্র অভিব্যক্তি ছিল না। তাঁর জীবনকালের শেষভাগ থেকেই দৌহিত্র সিরাজ-উদ্‌দৌলা দরবারে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। দাদাজান আলিবর্দীর প্রশ্রয়ে লালিত সিরাজ ছিলেন বিলাসী যুবক। সিরাজের রুচিবোধ ও চিন্তাধারা ছিল মেজাজ অনুযায়ী কমনীয় ও লাস্যপ্রিয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রভাবে শিল্পীরা দরবারি পরিবেশের বাইরে থেকেও ছবির বিষয় নির্বাচন করতে শুরু করেছিলেন।[২]

মুর্শিদাবাদের নবাবগণ ইন্দো-পারস্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করতেন। সেই প্রেক্ষিতে তাঁরা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় ছিলেন। এর ফলে ক্ষমতার যে বৈধকরণ হতো, সে সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল থাকতেন। প্রজাদের সম্মুখে তাঁরা চিত্রকলার মাধ্যমে নিজেদের ভাবমূর্তি তুলে ধরতেন। এভাবে মুঘল চিত্রকলার ঐতিহ্য মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের মাধ্যমে বজায় থাকতো। মুঘল দরবারি শিল্পীরা একসময় মুঘল বংশের ইতিহাস ও বাদশাহের জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে শিল্পের মূল বিষয় হিসাবে প্রতিভাত করেছিলেন। একইভাবে নবাবী আমলের মুর্শিদাবাদ কলমের প্রতিকৃতি চিত্রেও দেখা যায়, তাঁরা শিকারে গমন করছেন, যুদ্ধে অবতীর্ণ, বিরাট শোভাযাত্রার সম্মুখে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন ইত্যাদি বিষয়সমূহ। চিত্রকর্মে এই দৃশ্যাবলি অবধারিতভাবে সমাপ্ত হয় দরবারে। দরবারে আসীন বাদশাহ হলেন যে কোনো চিত্রকর্মের প্রধান অনুষঙ্গ। ত্রিতলে বিভক্ত চিত্রভূমির সবচেয়ে উপরে দর্শকের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর অবস্থান। নিচের সারিবদ্ধ মানুষ নিজেদের সামাজিক মর্যাদা মোতাবেক স্থান পেয়ে থাকেন।[৩]

নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদ শৈলীর কয়েকটি চিত্রকর্মে প্রধান চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দস্তর-ই-হিম্মত শীর্ষক চিত্রিত পুঁথিতেও প্রধান চরিত্র বা নায়ক সিরাজউদ্দৌলা। যা বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। যে রাজকীয় মর্যাদা নবাবকে ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার চিত্ররূপ হচ্ছে দরবারের মসনদে উপবিষ্ট রাজা। দর্শকের মনে ওই প্রতিচ্ছবি প্রেমিক চরিত্র হিসাবে বিকশিত হয়। নবাব হয়ে ওঠেন রূপকথার চরিত্রের মতো আকর্ষণীয়। বাস্তব ও কল্পনার

---

[১] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৩] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

সংমিশ্রণে যখন কোনো ব্যক্তি প্রতিকৃতি চিত্রের মাধ্যমে একটি পরিচিত মুখাবয়বে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন দর্শক সর্বসাধারণের থেকে তাঁকে পৃথক করে রাখে। বিশেষ অনুষঙ্গের উপস্থাপনের ফলে দরবারি চিত্র কখনই বাস্তবানুগ আদলে রূপায়িত হয় না। চিত্রকর্মের চরিত্র বা মডেল বাস্তব জগতের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কল্পলোকের নায়করূপে প্রতিভাত হন। এই বিশেষ আদর্শ মুঘল চিত্রকলা থেকে অষ্টাদশ শতকের দরবারি শিল্পেও জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।[১]

সিরাজউদ্দৌলার আমলে মুর্শিদাবাদের মসনদের ভাগ্যে কঠিন বিপর্যয় আসা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ চিত্রশৈলীতে বৈচিত্র্য ও সজীবতা বিরাজমান ছিল। 'রাগমালা' সিরিজের চিত্রকর্মে শিল্পীগণ নতুন স্বাচ্ছন্দ্যে নব নব রূপবিন্যাস এঁকেছেন। রূপবিন্যাস যেমন লক্ষ করা গেছে নতুন উদ্ভাবনা, রূপনির্মিতিতেও প্রকাশ পেয়েছে মুর্শিদাবাদ শৈলীর নিজস্বতা। এক্ষেত্রে শিল্পীরা চিত্রের জমিনে জ্যামিতিক বিন্যাসকে নানাভাবে ভেঙেচুরে এবং প্রয়োজনে বর্জন করেও চিত্রকর্মে স্বতঃস্ফূর্ততা কায়েম করলেন।

রাগমালা সিরিজে চিত্রকর্মের পশ্চাৎপটের আকাশ রাগ ও রাগিণী অনুসারে কখনও গুরুভার মেঘে ভরে উঠল। কখনও মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত হয়েছে সূর্যকিরণ। আবার কখনও সকাল ও সন্ধ্যার উষ্ণ শীতল আলোয় উদ্ভাসিত হলো। হিন্দোল রাগে নায়ক-নায়িকাকে দোলনায় দোল দিচ্ছেন সহচরীরা। ককুভ রাগিণীতে নির্জন প্রান্তরে জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে নায়িকাকে একাকী দুহাতে দুই মালাসমেত নায়কের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। নায়িকার দুপাশে দুই ময়ূর-ময়ূরী। কেদারা লক্ষ করা যায়, এক নদীতীরের জলটুঙির উন্মুক্ত ছন্দে, তারাজ্বলা আকাশের নীচে তানপুরা বাজিয়ে নায়িকা গান গেয়ে যাচ্ছেন। নায়ক ফুল হতে গান শুনছিলেন। ছিলাবল রাগিণীতে নায়িকাকে সম্মুখে আরশি রেখে জেনানামহলের উন্মুক্ত ছাদে পরিচারিকার দ্বারা প্রসাধিত হতে দেখা যায়। এ ধরনের বিষয়বস্তু ও অনুষঙ্গ নির্ভর চিত্র কেবল সিরাজউদ্দৌলার প্রভাবেই নয়, তাঁর শাসনামল ও জীবনাবসানের পরও মুর্শিদাবাদে অঙ্কিত হয়েছে।[২]

সিরাজের পর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর নবাব হলেও মুর্শিদাবাদ শৈলী অব্যাহত থাকে। কেবল নবাব বা তাঁর পরিবারের নয়, হিন্দু অমাত্য ও জমিদার, এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের আনুকূল্যও শিল্পীরা লাভ করেছিলেন। এসময়ে অঙ্কিত মীরজাফরের কয়েকটি চিত্রকর্ম পাওয়া গেছে। তার একটি লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। এই চিত্রে মীরজাফর ও তাঁর পুত্র মিরনকে এক দিগন্ত প্রসারিত অসম প্রান্তরে অশ্বারোহী হয়ে সৈন্য

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

[২] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

পরিদর্শনরত অবস্থায় দেখা যায়। চিত্রটিতে শিল্পী হিসাবে যাঁর সিলমোহর রয়েছে তিনি হলেন লক্ষ্ণৌর খ্যাতিমান শিল্পী পুরান নাথ, ওরফে হুনহার। ছবিটি ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত হয়েছে।[১]

মীর কাসিম (শাসনকাল: ১৭৬০-১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) নবাব হলে তিনিও চিত্রকলার উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে বর্তমানে সংরক্ষিত উইলিয়াম ফুলহার্টনের সংগ্রহের চিত্রকর্মগুলো থেকে মিরকাসিমের শাসনকালের মুর্শিদাবাদ শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। সংরক্ষিত একটি চিত্রকর্মে লক্ষ করা যায়, গঙ্গাতীরে প্রাসাদচত্বরে চাঁদোয়ার নীচে এক হিন্দু অমাত্যের সঙ্গে মীর কাসিমের আলাপচারিতার দৃশ্য। তাঁর হাতে রয়েছে গড়গড়ার নল। চিত্রটি আলিবর্দীর আমলের দরবারি গাম্ভীর্যেই অঙ্কিত হয়েছে। প্রায় একই রূপবিন্যাস রচিত হয়েছে একজন অমাত্যের অবয়বও। যাঁকে মীর কাসিমের সেনাপতি আর্মেনীয় গুরগল খাঁ বলে কতিপয় ঐতিহাসিক শনাক্ত করেছেন। এই চিত্রকর্মের শিল্পী দীপচাঁদ।[২]

মুর্শিদাবাদ শৈলীর ক্ষেত্রে দুটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ ঘটনা ঘটে মীর কাসিমের আমলেই। প্রথমটি হলো- লক্ষ্ণৌর শিল্পীরা সেকালে মুর্শিদাবাদে এসে কাজ করেছেন। ফলত, সাময়িকভাবে মুর্শিদাবাদ শৈলীর ওপর লক্ষ্ণৌ শৈলীর প্রভাব পড়ে। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা এই সময়েই সূক্ষ্ম তুলি ব্যবহারের মাধ্যমে হালকা খয়েরি বা ছাইরঙের ফুটকি দ্বারা প্রতিকৃতি চিত্র অনুপুঙ্খ আঁকতে শুরু করেন। এর পূর্বে মুর্শিদাবাদ শৈলীর শিল্পীরা যথারীতি মুঘল পদ্ধতিতে ঘন জলরঙে চিত্রাঙ্কন করেছেন।[৩]

অষ্টাদশ শতকের সমাজে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে। এই সময় হিন্দু জমিদারদের বহু বাহ্যিক আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে মুসলমান দরবারের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যসমূহের গভীর প্রভাব পড়ে। অপরপক্ষে নবাবগণ হিন্দু অভিজাতগণের সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছেন। বাদশাহ আকবরের দরবারে হিন্দু মহাকাব্য অনুবাদ ও চিত্রণের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রাদেশিক মুঘল কেন্দ্রগুলোতেই সংরক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদে চিত্রিত 'নলদময়ন্তী'র পুঁথিটি তার এক বিশেষ নিদর্শন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংরক্ষিত 'নলদময়ন্তী'র এই পুঁথিটি নক্স্ লিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, পুঁথিটি প্রথমে মুঘল রাজ দরবারে ছিল। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদে আসে এবং সেখানে অলংকৃত হয়। চিত্রগুলো এক একটি পৃষ্ঠায় সংযোজন করে পুঁথিটি পুনরায় বাঁধানো হয়। দরবারি মুঘল শৈলী এখানে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলত,

---

[১] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

মুর্শিদাবাদের নবাবগণের জীবনধারা চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। যদিও আখ্যানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন তবু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে নবাবদের চিত্রকর্ম পাওয়া যায়।[১]

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুর্শিদাবাদের দরবারি চিত্রকলায় দরবারে আসীন নবাবের চিত্র প্রায় নেই। একমাত্র 'নলদময়ন্তী'র পুঁথিচিত্রগুলোতেই দরবারের দৃশ্য লক্ষ করা যায়। মুঘল দরবারি আঙ্গিকের ত্রিতল ভাগ। সেই মোতাবেক প্রধান চরিত্র হিসাবে নবাবের স্থান সর্বউচ্চে এবং অন্তঃপুরের অন্তরঙ্গ দৃশ্যসহ প্রভৃতি বিষয় 'নলদময়ন্তী'র চিত্রগুলোতে বর্তমান রয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এখানে প্রধান চরিত্র বা নায়ক এবং সভাসহ সকল ব্যক্তি সমকালীন মুর্শিদাবাদের নবাব ও অভিজাতদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত, এর ফলে চিত্রকর্মে তাঁদেরকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

'নলদময়ন্তী'র শিল্পীদের নাম পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয়, লক্ষ্ণৌ ও হায়দ্রাবাদ থেকে এসে যে সকল শিল্পী মুর্শিদাবাদে কাজ পেয়েছিলেন, তাঁদের অসামান্য দক্ষতা ছিল। অভিজাত পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিকৃতি চিত্রে যথাযথ রূপায়ণে তার প্রমাণ মেলে।[২]

নবাব মীর কাসিম ইংরেজদের হাতে পরাজিত হলে ইংরেজরা তাদের ক্রীড়ানক মীরজাফরকে পুনরায় মুর্শিদাবাদের মসনদে বসালো। বস্তুত তখন থেকেই নবাবি মসনদের প্রকৃত মর্যাদা শেষ হয়ে যায়। এরপর থেকেই মুর্শিদাবাদ শৈলীর দ্রুত অবক্ষয় হতে থাকে। শিল্পীরা সৃজনশীলতা হারিয়ে নবাব-বাদশাহদের আলেখ্যচিত্র আঁকতে লাগলেন। কারণ, সাধারণের মধ্যে নবাব-বাদশাহদের এসব চিত্রকর্মের একটা বাজার ছিল। কিন্তু এগারোশো ছিয়াত্তরের (১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) মন্বন্তরের করাল গ্রাসে সেই অবক্ষয়িত দুর্ভিক্ষের প্রকোপে শিল্পীদের অনেকেই অনাহারে প্রাণ হারালেন। অনেকে দেশান্তরী হলেন। এঁদের মধ্যে শেষপর্যন্ত যাঁরা ইংরেজদের আশ্রয়ে জীবনরক্ষায় সক্ষম হলেন, তাঁদের হাতেই মূলত মুঘল ও পাশ্চাত্য চিত্ররীতির সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন এক শৈলী। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'কোম্পানি স্কুল'।[৩] এভাবে মুঘল দরবারি শিল্পীরা ইংরেজ সাহেবদের কাছে ছবি কাঁধে ফেরি করে বেড়ান। ক্যামেরা আবিষ্কার হবার পর যখন সাম্রাজ্যের সস্তা স্মারকচিহ্ন হিসাবেও সাবেক দরবারি মুঘল শিল্পীদের কাজের আর কোনো মূল্য থাকে না, তখন তাঁরা দেশের আরো বহু শিল্পীর মতো বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যান।[৪]

---

[১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

[৩] অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[৪] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

২.১১.২ বাংলা কলম ও পাটনাই কলম

প্রখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক টি. ফক ও এম. আর্চার মুর্শিদাবাদ শৈলীর একটি অপভ্রংশকে 'বাংলা কলম' হিসাবে অভিহিত করেছেন। ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহের ক্যাটালগ তিনি এই কলমের ভিত্তিতে নয়টি সংখ্যায় ভাগ করেন: ৩৯০-৩৯৮। এরমধ্যে ৩৯৩ নম্বরে রয়েছে নয়টি তান্ত্রিক দেবীদের চিত্রকর্ম: লক্ষ্মী, ভূতেশ্বরী, তারা, দেবী, ধর্মাবতী, দুর্গা, ভৈরবী, পীতাম্বরী ও মাতঙ্গী। ৩৯৬ নম্বরের আওতায় রয়েছে সাতটি বিষ্ণু অবতার: মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ। ৩৯৭ নম্বরে আছে দশাবতার: মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। নগরগুলোর বাইরে গ্রামাঞ্চলেও যে মিনিয়েচর শিল্পী ছিলেন, তার প্রমাণ হিসাবে রিচার্ড জনসন জোড়াবাগের পূর্বে সুতাকুটি গ্রামনিবাসী আত্মারাম দামঘোষকে কলকাতায় আনিয়ে ছন্দোবদ্ধ একটি মহাভারত গ্রন্থ চিত্রিত করান।[১]

ফক ও আর্চার মুঘলরীতির অপভ্রংশ হিসাবে পাটনাই (আজিমাবাদ) কলমের পৃথক শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে আজিম-আল-শান তাঁর পিতামহের অনুমতিক্রমে পাটনায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তার নাম দেন 'আজিমাবাদ'। গন্ডক ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে নগরস্থাপনার ফলে শহরটি বঙ্গপ্রদেশ শাসনের পক্ষে অনুকূল হয়। এই সময় আজিম-আল-শানের পৃষ্ঠপোষকতায় 'পাটনাই কলম' (১৭০৪-১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) নামে একটি চিত্রশৈলী শুরু হয় বস্তুত মুঘলরীতির অপভ্রংশ হিসাবে এই শৈলী গড়ে ওঠে। এতে বাংলার শিল্পীদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।[২]

২.১১.৩ ফররুখাবাদ শৈলী (১৭১৩- আনুমানিক ১৭৮০)

মুঘল বাদশাহ ফররুখশিয়রের রাজত্বকালে (১৭১৩-১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ) বাঙ্গাশ উপজাতির এক রোহিলাপতি, নাম মুহম্মদ খান বাঙ্গাশ বাদশাহের সম্মানে একটি নগর স্থাপন করেন। বাদশাহের নামে নগরের নামকরণ করা হয় 'ফররুখাবাদ'। এ শহরটি ফৈজাবাদ থেকে ১৬০ মাইল এবং লক্ষ্ণৌ শহরের ৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ থেকে দুটি শহর দুটি দিকে প্রায় সমান দূরত্বে স্থাপিত। এই শহর স্থাপনার পর মুহম্মদ খান বাঙাশ নিজ প্রদেশ রক্ষা করতে অনেক বাধাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু বাঙাশের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আহমদ খাঁ বাঙ্গাশ ১৭৫০ থেকে ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুই দশক ধরে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য চালান। এই সময় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কয়েকজন দক্ষ শিল্পী উৎকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে চিত্রকারখানার গৌরব বৃদ্ধি করেন। শুরুর দিকে আহমদ খাঁ বাঙ্গাশের কিছু প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কিত হয়। এই শৈলীতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রতিকৃতি চিত্রে ভিন্নভাবে দাড়ি ছাঁটা থাকে। এছাড়া দাড়ি গোঁফ খুব সুস্পষ্ট ও পুষ্ট। চিবুক থাকে চাঁবা কামানো।

---

[১] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

আহমদ খাঁর মৃত্যুর পর মজাফফর জঙ্গ নবাব হন। তাঁর প্রতিকৃতির বিশেষত্ব হচ্ছে- ঝুলে পড়া গোঁফজোড়া। ইন্ডিয়া অফিসের সংগ্রহে ফররুখাবাদ শৈলীর একটি মুরাক্কা বা অ্যালবাম আছে (৬৬নং)। এতে ছয়টি আবেগময় রম্যচিত্র মিনিয়েচর রয়েছে। প্রত্যেকটি মিনিয়েচরের উল্টোপিঠে আছে এক একটি করে ছয়টি রাগমালা চিত্র। এগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রতিকৃতি চিত্র ও পৃথক আটটি রাগমালা চিত্র। রিচার্ড জনসন সংগ্রহে ফররুখাবাদ শৈলীর অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণিত হয়েছে।[১]

২.১১.৪ দক্ষিণী রীতি বা মুঘল চিত্রকলার অপভ্রংশ

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে অনেকগুলো মুসলমান রাজ্য বা সুলতানী রাজ্য ছিল। এগুলোর মধ্যে সবথেকে শক্তিমান ছিল দিল্লির সুলতান বংশ। অন্যান্য স্বাধীন সুলতানী রাজ্যও ছিল, এর মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বাহমনী সুলতানগণ ছিলেন। পাঁচটি বাহমনী প্রদেশ বা রাজ্য ছিল, যথা- বেরার, বিদর, আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুন্ডা। এর মধ্যে বেরার ও বিদরই ছিল সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী। এই দুই রাজ্যের কোনো বিশেষ চিত্ররীতির কথা এখনও জানা যায়নি। কিন্তু অপর তিনটি প্রদেশে নিজস্ব চিত্রশিল্পী ও চিত্ররীতি গড়ে উঠেছিল।

আহমদনগরের বিশেষ চিত্ররীতি ছিল। নিজামশাহী নবাবগণ গভীর উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও এই শৈলীর কাজ বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। ষোল শতকের শেষভাগে অঙ্কিত মাত্র একটি দৃষ্টান্ত আছে। দক্ষিণী রাজ্যগুলোর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল গভীর। আহমদনগর দরবারে তুরস্ক, ইরান ও এবিসিনিয়ায় অনেক লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চিত্রশিল্পী ও লিপিশিল্পীও ছিলেন। ফলে কোন ছবিটি পারস্যে পারসিক শিল্পীদের আঁকা এবং কোন ছবিটি দাক্ষিণাত্যে পারসিক শিল্পীর আঁকা, তা শনাক্ত করা মুশকিল। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল আক্রমণে আহমদনগর রাজ্যের পতন হয়।[২]

আদিল শাহী নবাবগণ বিজাপুর রাজ্যে ষোল শতকের শেষে রাজত্ব কায়েম করেন। দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৭৯-১৬২৭) চিত্রশিল্প নিয়ে বিশেষ উৎসাহবোধ করতেন। তাঁর কয়েকটি প্রতিকৃতি আছে। সেসব প্রতিকৃতি তাঁরই জীবিতকালের এবং সমসাময়িক বলে ধরা হয়। বিজাপুর শৈলীর চিত্রকর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃষ্টিসুখকর কোমল রঙের ব্যবহার। চিত্রে ফুল ও পাখির চিত্রায়ণে অসামান্য অনুপুঙ্খতা রয়েছে। একজন বৃদ্ধ মৌলবির চিত্রকর্ম আছে। তিনি দরবারের অমাত্য ছিলেন। ছবিতে

---

[১] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

জমির ওপর রাখা মৌলবীর পায়ের দুদিকে দুটি তিথির পাখি দেখা যায়। পাখি দুটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। বিজাপুর চিত্ররীতির ছবিতে পরিবেশ ও পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা বিশেষ লক্ষণীয়।

ষোল দশকের শুরুতে গোলকুন্ডা ছিল কুতুব নবাবদের রাজধানী সবচেয়ে প্রাচীন দক্ষিণী রীতির হিসাবে সনাক্ত করা কিছু চিত্রকর্মের উৎস হচ্ছে গোলকুন্ডা। ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহে যেটি সবচেয়ে প্রাচীন, সেটি অবশ্য ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের পর অঙ্কিত হয়েছে। ফলে, চিত্রটিতে প্রাচীন গোলকুন্ডা রীতির ওপর চলতি মুঘল রীতির বলিষ্ঠ প্রভাব পড়ে। কিছু নিসর্গচিত্রে পারসিক রীতির প্রভাব লক্ষণীয়, বিশেষত পটভূমির পাথরের পাহাড়ের দৃশ্যাবলীতে।

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুঘলসেনারা দাক্ষিণাত্য জয়ে বিশেষ তৎপর হলেন। বাদশাহ শাহজাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবকে সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন। বিজাপুরের পতন হয় ১৬৮৬ ও গোলকুন্ডার ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। তার আগের দশকে মুঘল শিল্পীগণ অধিকৃত আওরঙ্গাবাদে অনেক কাজ করেছেন। ১৬৪০-১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আওরঙ্গাবাদে মিশ্র মুঘল ও দাক্ষিণাত্য রীতিতে অসংখ্য কাজ হয়। ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘলরা আগমনের পর বিজাপুর ও গোলকুন্ডা থেকে চিত্রকরগণ জীবিকার সন্ধানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে চলে যান। আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে বা তারও আগে থেকে বিক্ষিপ্ত শিল্পীরা পুনরায় হায়দ্রাবাদে এসে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে শুরু করেন। এভাবেও আরও কিছুদিন গোলকুন্ডা কলম চালু থাকে।

যেসব চিত্রকর্মে সুস্পষ্টভাবে কোনো কলম বা আঞ্চলিক রীতি সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, ফক ও আর্চার সেগুলোকে পাঁচমিশেরী বা অশিক্ষিত দক্ষিণী রীতি হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করেন। এই শ্রেণিতে মুঘল চিত্রকলার নানা যুগের নকল ও অনুকরণ কলা চিত্রকর্ম পাওয়া যায়।[১]

[১] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের পরিচিতি

৩.১ বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলা তথা এই ভূখণ্ডের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। 'বাংলাদেশ' নামক এই রাষ্ট্র নির্মিত হওয়ার পেছনে রয়েছে সহস্র বছরের ইতিহাস। উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানরাই সর্বপ্রথম বাংলার সমগ্র অঞ্চলকে 'বাঙ্গালাহ' নামে অভিহিত করেছেন। কিংবদন্তি মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরি'*তে 'বাঙ্গালাহ' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাঙ্গালাহ'র প্রকৃত নাম ছিলো 'বঙ্গ'। পূর্ববর্তী শাসকগণ প্রদেশের সর্বত্র দশ গজ উচ্চ ও বিশ গজ প্রস্থ সম্পন্ন বাঁধ নির্মাণ করতেন। এই বাঁধগুলোকে 'আল' বলা হতো। 'বাঙ্গালাহ' নামের উৎপত্তির এই হচ্ছে গোড়ার কথা।[১] অর্থাৎ 'বাঙ্গালাহ' শব্দটি এসেছে বঙ্গ+আল থেকে।

অবশ্য একথাও সত্য যে, 'বঙ্গ' ও 'বাঙ্গালাহ' শব্দের উৎপত্তি হিন্দু আমলে এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও এর ব্যবহার ছিলো। হিন্দু শাসনামলের এই 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ' আধুনিক বাংলার কিছু অংশের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিলো। 'বঙ্গ' নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আরণ্যক ব্রাহ্মণে। একটি ক্ষুদ্র জনপদরূপে এটি উল্লিখিত হয়েছে। হিন্দু আমলের 'বঙ্গ' ও 'বাঙ্গালাহ' নামের অন্যান্য উল্লেখগুলোতে নদ-নদীবেষ্টিত বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলকেই নির্দেশ করা হয়েছে। তৎকালীন সময়ে বাংলার অপরাপর অঞ্চল পৃথক পৃথক নামে পরিচিত ছিলো। পশ্চিম বাংলা প্রথমে সুম্ম এবং পরে রাঢ় নামে পরিচিত ছিলো। উত্তর বাংলাকে বলা হতো পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র ও লক্ষ্মণাবতী। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ আবার গৌড় নামেও পরিচিত ছিলো। মাঝে-মধ্যে গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাদেশকেও বোঝানো হতো।[২]

আহমদ হাসান দানী উল্লেখ করেছেন যে, সেনরাজরা বাংলার একটা বৃহৎ অঞ্চলের মধ্যে শাসনকার্য ও ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদেরকে 'গৌড়েশ্বর' (গৌড়ের রাজা) হিসাবে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতেন।[৩] মুসলমানদের শাসনামলের প্রথমভাগে এবং বাংলার একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলই বঙ্গ বা 'বাঙ্গালাহ' নামে অভিহিত হয়েছিলো। সেকালের মুসলমান লেখকদের লেখায়ও এরূপ বিবেচনা প্রতিভাত হয়েছে। কিংবদন্তি ঐতিহাসিক মিনহাজ-আল-সিরাজ

---

[১] Abu'l Fazl Allami, *Ain-i-Akbari* (Translated into English by Colonel H. S. Jarrett), Vol. II, Kolkata: The Asiatic Society, 2010 (Second reprint), p. 132

[২] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮ (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১-২

[৩] Ahmad Hasan Dani, Shamsal-Din-Ilyas Shah, Shubah-i-Bangalah. *Bengali Literary Review*, 1957, Pp. 19-20

জুয্যানী এই অঞ্চলের কথা উল্লেখপূর্বক লিখেছেন যে, তাঁর লক্ষণাবতীতে ভ্রমণকাল পর্যন্ত (১২৪২-১২৪৪) লক্ষণ সেনের বংশধরগণ 'বঙ্গে' তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।[১] মিনহাজের লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, তিনি পূর্ব ভারতের ভৌগলিক বিভাগ ও বিবিধ নাম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞাত ছিলেন। বাংলা পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলকে তিনি বঙ্গ বিবেচনা করতেন। তিনি এ বিষয়ে এক জায়গায় লিখেছেন, লক্ষণাবতী ও বিহারের বিবিধ অংশের এবং 'বঙ্গ' ও কামরুদ (কামরূপ) দেশের জনগণ বখতিয়ার খলজীর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন।[২] মিনহাজের এ বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোধ হয় যে, লক্ষণাবতী অঞ্চল থেকে 'বঙ্গ' অঞ্চল পৃথক ছিলো। লক্ষণাবতী যেরূপ বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিলো, তেমনি বঙ্গ অঞ্চল ও কামরূপ অঞ্চল পাশাপাশি অবস্থিত ছিলো।[৩]

মুসলমানদের মধ্যে 'বাঙ্গালাহ' নামটি প্রচলিত হয় গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় থেকে। সাধারণত বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের জন্য এই নাম ব্যবহৃত হতো। প্রাক-মুঘল ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দিন বারণী সর্বপ্রথম মুসলমান লেখক, যিনি 'বাঙ্গালাহ' নাম ব্যবহার করেন। তাঁর প্রথমদিকের বর্ণনায় 'বাঙ্গালাহ' বলতে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখ আছে। তিনি সুলতান বলবনের একটি উক্তি উল্লেখ করেন, "আমি লক্ষ্মণাবতী ও 'বাঙলা' অঞ্চল আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে (বুগরা খান) অর্পণ করেছি। এদেশ কিছুকাল যাবৎ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।"[৪] *তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী* গ্রন্থে বারণী সুলতানের অপর একটি উক্তি প্রতিভাত করেন: "*ইকলিম-ই-লক্ষ্মণাবতী* ও *আরসাই-বাঙ্গালাহ* বশে আনার জন্য আমাকে বিপুল রক্তপাত ঘটাতে হয়েছে।"[৫] বারণী *ইকমিক-ই-বাঙ্গালাহ* জয়ের জন্য লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা বুগরা খানের প্রতি সুলতান বলবনের উপদেশের কথাও উল্লেখ করেন।[৬] জিয়াউদ্দিন বারণীর এসব গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতান বলবনের কালে লক্ষ্মণাবতী থেকে 'বাঙ্গালাহ' একটি সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল ছিলো।[৭]

বিশেষ লক্ষণীয় যে, মিনহাজের 'বঙ্গ' ও বারণীর 'বাঙ্গালাহ'- এ শব্দ দুটো ভৌগলিক দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ। সমসাময়িক মুসলমান শাসকদের মুদ্রা থেকে যে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংগৃহীত হয়েছে, তাতে

---

[১] Minhaj-al-Siraj Juziani, *Tabaqat-i-Nasiri* (Edited by W. Nassau Lees), Calcutta : Asiatic Society of Bengal, 1897, P. 151

[২] *Ibid,* p. 148

[৩] এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৪] Zia-ud-Din Barni, *Tarikh-i-Firoz Shahi* (Translated into English by Sir H. M. Elliot, edited by John Dowson), Lahore: Sind Sagar Academy, 1974, p. 53; এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৫] *Ibid,* p. 93; প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৬] *Ibid,* p. 92; প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২

এই মতে যৌক্তিকতা মেলে।[১] বারণীর তথ্য-প্রমাণাদি থেকে আরো জানা যায় যে, বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিলো। মুসলমানগণ এসব অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছিলেন, যথা- 'আরসা-ই-বাঙ্গালাহ', 'ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহ' এবং 'দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ'।[২] ড. কে. আর. কানুনগো 'আরসা-ই-বাঙ্গালাহ'কে সাতগাঁও অঞ্চল (দক্ষিণ বঙ্গ), 'ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহ'কে সোনারগাঁও অঞ্চল (পূর্ববঙ্গ) এবং 'দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ'কে সংযুক্ত সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৩]

'বাঙ্গালা' ও 'বাঙ্গালী' শব্দ দুটো এই অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুলতান হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময়কালে সর্বপ্রথম সমগ্র জনপদ তাঁর একক শাসনাধীনে উন্নীত হয়। বস্তুত তখন থেকেই বঙ্গদেশ 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিতি পায় এবং এই নামের বিস্তৃতি ঘটে। উল্লেখ্য, ইলিয়াস শাহের ব্যাপক আধিপত্যের ফলে লক্ষ্মণাবতী ও 'বাঙ্গালা' একত্রীভূত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন। তিনি এই যুক্ত অঞ্চলগুলোকে 'বাঙ্গালা' এবং অধিবাসীদেরকে 'বাঙ্গালী' নামে অভিহিত করেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ নিজে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ্', 'শাহ-ই-বাঙ্গালী' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালী' উপাধি ধারণ করেন।[৪]

এরূপ বিবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস শাহ্ 'বাঙ্গালা'র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিগণিত হন। এর ফলে বাংলার সমগ্র অঞ্চল একত্রীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভাষাগত ঐক্যের পটভূমি স্থাপিত হয়। এ সময় থেকে তেলিয়াগর্হি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ 'বাঙ্গালা'-এই একটি সাধারণ নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃত অর্থেই বাংলার ইতিহাসে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সময় থেকে পূর্ব-বাংলার অথবা উত্তরবঙ্গের অথবা পশ্চিমবঙ্গের যেখানকারই অধিবাসী হোক না কেন, তারা বাঙালি হিসাবে পরিচিত হলো সারাবিশ্বের মানুষের কাছে।[৫]

আবুল ফজল মুঘল সুবা বাঙ্গালার ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে *আইন-ই-আকবরী'*তে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাঙ্গালাহ্' দ্বিতীয় অঞ্চলে (ইকলিম) অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম থেগে গর্হি (তেলিয়াগর্হি) পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য চারশত ক্রোশ। এর পূর্ব ও উত্তর সীমায় পাহাড়-পর্বত এবং দক্ষিণে

---

[১] এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

[৩] K. R. Qanungo, *Bengal under the House of Balban,* Sir Jadunath Sarkar (ed.), The History of Bengal, Vol. II, Dhaka: The University of Dhaka, 2006 (Fourth Impression), p. 67

[৪] এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

সাগর ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এদেশের প্রান্তসীমায় রয়েছে কামরূপ এবং আসাম।[১] জাহাঙ্গীর তাঁর জীবনচরিত *তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "বাংলা দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি বিশালাকার দেশ। সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম থেগে গর্হি পর্যন্ত ৪৫০ ক্রোশ এর দৈর্ঘ্য। এবং উত্তরের পর্বতমালা থেকে মান্দারান অঞ্চল পর্যন্ত ২২০ ক্রোশ এর প্রস্থ।"[২]

*আইন-ই-আকবরী'*তে বাংলার যে ভৌগলিক বিবরণ রয়েছে, তার সঙ্গে বিভাগ-পূর্ব বাংলার ভৌগলিক প্রকৃতির মিল রয়েছে। বাংলার উত্তরদিক হিমালয়ের পর্বতশ্রেণি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। বঙ্গোপসাগর-বিধৌত এর দক্ষিণাঞ্চল এবং বিখ্যাত 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' ও অন্যান্য বন্যপ্রাণির আবাসভূমি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবন বাংলার দক্ষিণে সীমারেখা টেনেছে। প্রচুর বৃষ্টিপাত এ প্রদেশকে উর্বরা ও শস্য-শ্যামলা করে তুলেছে। এর পূর্বসীমায় গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বতরাজি অবস্থিত। খরস্রোতা গঙ্গা, মহানন্দা ও এদের বহু শাখা-প্রশাখা বাংলার পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। রাজমহলের পাহাড়, ঝাড়খণ্ডের বনাঞ্চল, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম, মানভূম ও ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমি বাংলার পশ্চিম সীমানা পরিবেষ্টিত করেছে।[৩] বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতো গঙ্গা নদী। আক্রমণকারীরা গঙ্গা দিয়েই অগ্রসর হতেন। এই নদীর ধারে রাজমহলেই গিরিপথে অবস্থিত ছিলো তেলিয়াগড় এবং সিকড়িগড় নামে দুইটি সুরক্ষিত গড় বা দুর্গ। এই দুইটি গড় রক্ষা করতে পারলে বঙ্গদেশ বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা পেত। প্রাচীনকাল থেকে মুসলমানদের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত এই গিরিপথ এবং দুর্গগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৪]

বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা এ ভূ-খণ্ডের গঠনগত ইতিহাস দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। প্লাইসটোসিনকালেই বাংলা যে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপূর্বপ্রান্তে নিজের অবস্থান বা অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছিলো সে কথা আজ সর্বস্বীকৃত সত্য পূর্ব-পশ্চিম-উত্তরের পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত এমন বেষ্টনির মধ্যেই বাংলার অবস্থান।[৫] প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন

---

[১] Abu'l Fazl Allami, *op. cit.,* Pp. 130-131

[২] Nur-ud-din Muhammad Jahangir, *Tazuk-i-Jahangiri* (Trans. A. Rogers, ed. H. Beveridge), 2 Vols. (First published in 1909-1914), Second Edition, Delhi: Munshiram Manoharlal Oriental Publication, 1968, p. 229

[৩] এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

[৪] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত), ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১১-১২

[৫] আকসাদুল আলম, 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভিত ভৌগোলিক অবস্থান ও তার প্রভাব', কে. এম. মোহসীন ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা- ৪, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৮

শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, মাঝখানের সমভূমির সাম্য- ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য।"[১]

বাংলার অবস্থানকে ভৌগোলিকভাবে এবং কিছুটা বিস্তৃতভাবে চিহ্নিত করা যায়। বাংলার মোট আয়তন ৮৪,৮৩২ বর্গমাইল। এর মধ্যে ৩০,৩৯১ বর্গমাইল পশ্চিমবঙ্গ এবং ৫৪,১৪১ বর্গমাইল বর্তমান বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের মধ্যে ছিল বলে ড. এম. হারুনুর রশীদ উল্লেখ করেছেন।[২]

বাংলা নামক এ ভূ-খণ্ডের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে হিমালয় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি করেছে গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন। হিমালয় পর্বতমালার নিম্ন উপত্যকায় দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা অবস্থিত। এই দুই জেলার পশ্চিমে নেপাল এবং পূর্বে ভূটান রাজ্য সীমা।[৩] বাংলার উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার পূর্ব সীমার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ। মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়। দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা। ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণি লুসাই জেলা এবং ব্রহ্মদেশ হতে বাংলাকে পৃথক করেছে। একইসঙ্গে শ্রীহট্টকেও পৃথক করেছে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পর্বতাকীর্ণ হলেও বার্মার সাথে বাংলার যোগাযোগ সম্পর্ক দুরতিক্রম্য ছিল না বলেই পণ্ডিতদের অভিমত রয়েছে।[৪]

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজরা বাংলাকে 'বেঙ্গল' নামে অভিহিত করেন। বাংলা ভাষায় এটি 'বঙ্গদেশ' নামে পরিচিতি পায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে বঙ্গদেশ ভাগ হয়ে পূর্ব অংশ পাকিস্তানের এবং পশ্চিম অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর পূর্ব অংশ প্রথমে পূর্ববাংলা এবং পরে পূর্ব পাকিস্তান নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর পূর্ব পাকিস্তান অংশটি বাংলাদেশ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে বাংলাদেশ নামটি গৃহীত হয়েছে।[৫]

বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

---

[১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, কলিকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৪০২ (সংযোজিত ২য় সংস্করণ), পৃ. ৭১

[২] আকসাদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৩] আকসাদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

[৪] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

[৫] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৩.২ মুঘল বাংলার প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় মুঘল বাদশাহ হুমায়ূন ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বাংলা জয় করেন। কিন্তু এই প্রদেশে তাঁর অধিকার মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বাংলার সঙ্গে তাঁর স্বল্পকালীন সম্পর্ক চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ তিনি বাংলার সুলতানদের ঐশ্বর্যময় রাজধানী গৌড়ের নাম দিয়েছিলেন 'জান্নাতাবাদ'। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ কররাণীর নিকট থেকে মুঘল তৃতীয় বাদশাহ আকবর নামেমাত্র বাংলা জয় করেন। প্রকৃত অর্থে তখন কেবল উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বার ভূঁইয়াগণ মুঘল আধিপত্য মেনে নেননি। তাঁরা নিজেদের জমিদারিতে স্বাধীনতা অবলম্বন করেছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খান চিশতী বার ভূঁইয়াদেরকে দমন করতে সমর্থ হন এবং সমগ্র বাংলায় মুঘল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন (১৬০৮-১৬১১ খ্রি.)। ইসলাম খান ও বাংলার পরবর্তী সুবাদারগণ কামরূপ, কুচবিহার, কাছাড়, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাশ্ববর্তী অঞ্চলে মুঘল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিস্তার করেন। পরবর্তীকালে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে সুবাদার মীর জুমলা আসামের রাজাদেরকে বশীভূত করেন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদার শায়েস্তা খান আরাকানদের নিকট থেকে চট্টগ্রাম জয় করেন।[১]

শুরুর দিকে মুঘল সুবাদারগণের রাজধানী ছিল গৌড় ও তাণ্ডা। মানসিংহ বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী তাণ্ডা থেকে আকবর মহলে স্থানান্তরিত করেন। আকবর মহলের বর্তমান নাম রাজমহল। এরপর সুবাদার ইসলাম খান চিশতী ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে সুবাহ বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করেন। তিনি ঢাকার নতুন নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। শাহজাদা শাহ্ সুজা বাংলার সুবাদার হিসাবে রাজমহলে তাঁর আবাসিক রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের রাজধানী জাহাঙ্গীরনগরেই বহাল থাকে।[২]

মুঘল শাসনামলে বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম সুবায় পরিণত হয়। মুঘলদের সুবা প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। প্রাদেশিক প্রশাসনের দায়িত্ব পৃথকীকরণ ও ক্ষমতা বন্টনের মাধ্যমে এর ভিত্তি নির্মাণ হতো। উল্লেখ্য, এই প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও সমতার নীতির ওপর গড়ে উঠেছিলো। বস্তুত প্রাদেশিক সরকার ছিলো কাঠামোর দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কেন্দ্রীয় সরকারে দায়িত্বসম্পন্ন উজির, দিওয়ান, বকশি, সদর-ই-সুদূর, কাজি-উল-কুজ্জতি ও প্রধান মুহতাসিব ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের নির্ধারিত দায়িত্ব

---

[১] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত), দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২ (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৩৭-৩৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

ছিলো। মুঘল সুবা প্রশাসনেরও কেন্দ্রীয় রাজকর্মচারীদের অনুরূপ কর্মচারীর ব্যবস্থা ছিলো। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিভূরূপে কাজ করতেন। সুবাদার, দিওয়ান, বকশি, সদর, কাজি ও মুহতাসিব প্রদেশের প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতেন।[১]

বাদশাহ আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনের রূপরেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী বাদশাহদের সময়ে সামান্য কিছু রদবদল হলেও আকবরের নির্ধারিত শাসনব্যবস্থা শেষ অবধি চালু ছিলো। সুবার প্রধান ছিলেন সুবাদার (বা গভর্নর)। আকবরের সময়ে তিনি সিপাহসালার, পরে সুবাদার ও নাজিম হন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসনামল থেকে শুধু নাজিম পদবী পরিচিতি লাভ করে। সুবাদারের দায়িত্ব ছিলো বিশাল, সুবাদার বাদশাহের প্রতিনিধি রূপে প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, ফৌজদারী বিচার এবং সুবার সার্বিক তত্ত্বাবধান করতেন। সুবাদারের নীচে ছিলেন দিওয়ান। তিনি রাজস্ব প্রশাসন এবং দেওয়ানী বিচার করতেন। মর্যাদার দিক থেকে দিওয়ান সুবাদারের নীচে হলেও দিওয়ান সুবাদারের নিয়ন্ত্রণে ছিলো না। দিওয়ান কেন্দ্রীয় সরকারের দিওয়ানের নিকট জবাবদিহি করতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সুবাদার ও দিওয়ান এই দুই কর্মকর্তাই ছিলো প্রাদেশিক শাসনের প্রধান দুই স্তম্ভ। এঁদের নীচের সৈন্য বিভাগের দায়িত্বে থাকতেন বখশী। বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদির ব্যাপারে সুবাদার দায়বদ্ধ ছিলেন। সে হিসাবে তিনি ছিলেন সৈন্য বিভাগের কর্তা ব্যক্তি। কিন্তু মূলত বখশীরই দায়িত্ব ছিলো সৈন্যদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে। এছাড়া একজন সদর ছিলেন ধর্মীয় বিভাগে, বিশেষত অনুদান, পুরষ্কার ও বৃত্তি প্রদানের বিভাগীয় প্রধান। কাজী ছিলেন বিচারক এবং কোতওয়াল ছিলেন পুলিশ প্রধান, যিনি নগরের শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। মুঘল সুবা বাংলা নদীমাতৃক হওয়ায় এখানে নৌবাহিনী গঠন করা হয়। মীর বহর (নৌ অধ্যক্ষ) ছিলেন এর দায়িত্বে। প্রতি মুঘল সুবায় ওয়াকিয়ানবিস নিযুক্ত হতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিলো প্রদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ অবহিত করা। ওয়াকিয়ানবিস বা সংবাদ প্রতিবেদক প্রাদেশিক সুবাদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তার অধীনে ছিলেন না। তিনি সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।[২]

মুঘল নিয়মে শাসন কাজের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশকে সরকার এবং প্রত্যেক সরকারকে পরগণা বা মহলে বিভক্ত করা হতো। প্রত্যেক সরকার-এ সাধারণ প্রশাসনের জন্য ফৌজদার এবং রাজস্ব প্রশাসনের জন্য আমিল বা আমলগুজার নামক কর্মকর্তা নিযুক্ত হতেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক পরগণা বা মহলে সাধারণ প্রশাসনে সিকদার এবং রাজস্ব প্রশাসনে আমিন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। রাজস্ব বিভাগে কানুনগো এবং পাটওয়ারী নামে কর্মকর্তাও ছিলো। কানুনগোর প্রকৃত অর্থ

---

[১] এম এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[২] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, ২৪৭

আইনের ব্যাখ্যাকারী। কিন্তু বস্তুত তাঁর দায়িত্ব ছিলো ভূমি ও রাজস্বের তালিকা সংরক্ষণ করা। পাটোয়ারীরা ছিলেন লেখক বা বর্তমানকালের কেরানী। অতএব প্রতীয়মান হয়, মুঘল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত ছিলো। যথা- (ক) প্রশাসনিক ও (খ) রাজস্ব।

এই দুই বিভাগের মধ্যে এক বিভাগের ওপর অপর বিভাগের কর্তৃত্ব ছিলো না। উভয় বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্প্রীতি রক্ষারও বিধান ছিলো। অবশ্য সুবাদার ও দিওয়ানের মধ্যে বিবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসনামল পর্যন্ত যতদিন মুঘল বাদশাহগণ শক্তিশালী ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত এইরূপ বিবাদ বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেনি। বাদশাহ দোষী ব্যক্তিদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।[১]

মুঘল সুবা বাংলা ১৯টি সরকার এবং ৬৮২টি পরগণা বা মহাল-এ বিভক্ত ছিলো। ভূমিরাজস্ব ছিলো রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস। রাজা তোডরমল্ল সর্বপ্রথম আকবরের আমলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তখন রাজস্বের পরিমাণ ছিলো এক কোটি টাকার অধিক। কিন্তু আকবরের সময় সমগ্র বাংলায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তিনি পূর্ববর্তী সরকার সমূহের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলের সমগ্র বাংলা জয় হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করে রাজস্ব ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে বাংলার বাইরে কিছু এলাকা বিশেষত কামরূপ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলী খান আবার রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করেন। এ সময় এক কোটি ৪২ লক্ষ টাকার মতো রাজস্ব নির্ধারিত হয়। এরপরে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব সংস্কার করা হয়নি। তবে প্রত্যেক সুবাদার বা নাজিম রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য সেচ বা আবওয়াব বা উপকর আরোপ করেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও আয়ের অন্যান্য উৎস ছিলো। এগুলোকে একসঙ্গে সায়ের বলা হতো। এরূপ রাজস্বের মধ্যে বাণিজ্য শুল্ক মূখ্য। বাণিজ্য শুল্ক বিভিন্ন বন্দরে আদায় করা হতো। ঢাকার বন্দরকে শাহ বন্দর, মুর্শিদাবাদের বন্দরকে পাচোত্রা বন্দর এবং হুগলী বন্দরকে বখশ বন্দর বলা হতো।[২]

বলাই বাহুল্য যে, মুঘল বাদশাহগণ বিদ্বান, উদার এবং উন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা প্রজাবৎসলও ছিলেন। মুঘল সুবা বাংলায় নিযুক্ত সুবাদার, দিওয়ান এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণও বিদ্বান, উদার এবং সুশাসক ছিলেন বলে জানা যায়। মুঘল সমাজের উন্নততর আদব-কায়দা, রুচিবোধ, রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সুবাদার ও অন্যান্য মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে সুবা বাংলার সমাজে মুঘল আদব-কায়দা এবং রীতি-নীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। সুবাদারদের মধ্যে কেউ কেউ পণ্ডিত ছিলেন এবং ফারসি ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করতেন।

---

[১] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

বাদশাহ শাহজাহানের আমলের সুবাদার কাসিম খান জুয়ুনী (শাসনকাল: ১৬২৮-১৬৩২ খ্রি.) এবং বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলের সুবাদার শায়েস্তা খানের (শাসনকাল: ১৬৬৪-১৬৭৭ এবং ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রি.) নাম কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলো।

মুঘল বাদশাহগণের অনুরূপ সুবাদারগণও গ্রন্থাগারে মূল্যবান গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ করতেন। তাঁরা কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রেও ছিলেন বিশেষ উদার। বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বে সুবা বাংলায় অনেক পারসিক কবির আগমন ঘটেছে। মুঘল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই কাব্যচর্চা করতেন। সৈন্য এবং সেনাপ্রধানের মধ্যে কবিত্ব প্রতিভার ব্যক্তিবর্গ থাকতেন। উল্লেখ্য, মুঘল রাজত্বে প্রত্যেক যুদ্ধের পরে বীরসেনা ও সেনাপতিদের বীরত্বগাথা রচিত হতো। এই বিজয়গাথা বা বীরত্বগাথাকে 'জঙ্গনামা' বলা হয়।[১]

মুঘল আমলে বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই সময় পারস্য থেকে অসংখ্য মানুষ সুবা বাংলায় আগমন করেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলো শিয়া মুসলমান। শাহ সুজার সময়ে শিয়াদের আগমন বৃদ্ধি পায়। এঁরা ঢাকা ও রাজমহলের সমাজ-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তাব করে। রাজ সরকারে চাকরি করা ছাড়াও তাঁরা বিবিধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষত মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। নবাবী আমলে শিয়াদের আগমন আরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য কারণ, নবাব মুর্শিদকুলী খান এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য উঁচুস্তরের ব্যক্তিগণ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মুঘল শাসনামলে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয়। নবাবী আমলে এই শহরগুলোতে অনেক মাদ্রাসা, শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সূফি সাধকের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। পারস্য, দিল্লি ও অন্যান্য স্থান থেকে অনেক চিকিৎসক এসে সুবা বাংলায় আত্মনিয়োগ করেন।[২]

মুঘল আমলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ইতিহাস রচনা করেছেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে মুঘলদের সমগ্র বাংলা বিজয়ের ইতিহাস মির্জা নাথান অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাঁর *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* গ্রন্থে। শিহাব-উদ-দ্বীন তালিশ তাঁর *ফতীয়া-ই-ইবরীয়া* গ্রন্থে মীর জুমলার আসাম বিজয় এবং শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁরা উভয়েই শুধু সমসাময়িক নন, প্রত্যক্ষদর্শীও। মুহাম্মদ মাসুম *তারিখ-ই-শাহ সুজায়ী'*তে বাদশাহ শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন। এতে আওরঙ্গজেবের নিকট শাহ সুজার পরাজয়ের বিবরণ বিশেষ লক্ষণীয়। মুহাম্মদ মাসুম কয়েকটি যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তবে তিনি শাহ সুজার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী হওয়ায় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। মুহাম্মদ সাদিক

---

[১] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-২৫২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

নামে একজন কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর *সুবহ-ই-সাদিক* গ্রন্থে বাংলা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের বিপুল সংখ্যক কবি, সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিত্বদের বিবরণ দিয়েছেন। উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বাংলায় তখন অনেক বিদ্বান, পণ্ডিত ও কবি শিক্ষা ও কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় নবাবী আমলেও কাব্যচর্চা বহাল ছিলো। সুজা-উদ-দ্বীন মুহম্মদ খানের জামাতা মির্জা লুৎফুল্লাহ (মুর্শিদকুলী খান ২য়, রুস্তমজঙ্গ) একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। কবি হিসাবে তাঁর ছদ্মনাম ছিলো মখমূর। নবাব সরফরাজ খানের জামাত ইউসুফ আলী খান ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ। তিনি ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে *আহওয়াল-ই-মহাবতজঙ্গী* নামে ইতিহাস রচনা করেন। নবাবী আমলের মুনশী বা সেক্রেটারিগণ বিদ্বান ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ ইংরেজ আমলে ইতিহাস রচনা করেছেন। উল্লিখিত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুঘল সুবা বাংলার মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় প্রকৃত অর্থে উন্নততর ছিলো।[১]

বাংলার অভিজাত মুসলমান শ্রেণি একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতিবান এবং প্রগতিশীল সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন। উলেমা ও শেখগণ উচ্চশিক্ষিত এবং সুরুচিশিল্প ছিলেন। তাঁরা নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। আমির-ওমরাহ, রাজকর্মচারীবৃন্দ এবং ভূস্বামীগণও শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। তাঁরা বিদ্যানুশীলন করেন। শিক্ষা, শিষ্টাচার, আদব-কায়দা ও বিশেষ প্রতিভার প্রতি তাঁরা অনুরক্ত ছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা শিক্ষা, উদ্ভাবন ও শিল্পকলায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁদের দরবার, প্রাসাদ ও আবাসগৃহ ছিলো শিক্ষা, সুরুচি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র স্বরূপ। সমাজ জীবনে তাঁরা যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার সূচনা করেছিলেন, তা বাংলায় ব্যাপক সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা নিয়ে আসে।[২]

৩.২.১ মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকার প্রেক্ষাপট

ঢাকা শহরের অভ্যুদয় এবং ইতিহাস অনেক পুরনো। বাংলার প্রাচীন রাজধানী হিসাবে গৌড়, পাণ্ডুয়া এবং সোনারগাঁও-এর পরেই ঢাকার অবস্থান। মুর্শিদাবাদ, কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে বাংলার রাজধানী হিসাবে ঢাকা প্রাচীনতম। এক সময় ঢাকাকে বলা হতো, প্রাচ্যের রোমান্টিক নগর। ব্র্যাডলি বার্ট-এর মতে, পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী ঢাকা শহর রোমাঞ্চের এক অশেষ মুগ্ধতার নাম।[৩] এই বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর ছিল এক সমৃদ্ধ এবং মনোরম শহর।

---

[১] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২-২৫৩

[২] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

[৩] F. B. Bradley Burt, *The Romance of An Eastern Capital,* Naya Delhi: Aslan Education Survice, 1906, Pp. 273-281

ঢাকা নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত একটি কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পরিদৃশ্যমান ঢাক গাছ (Butca Frondosa) থেকে ঢাকা নামের উদ্ভব হয়েছে।[১] অন্য একটি কিংবদন্তি মতে, এখানে হিন্দু দেবী দুর্গা লুক্কায়িত হয়ে যান (বাংলা শব্দ 'ঢাকা'র প্রতিশব্দ লুক্কায়িত)। ফলত, এ এলাকার নামকরণ করা হয়েছে 'ঢাকা'।[২] আরও একটি প্রচলিত অভিমত থেকে জানা যায়, মুঘল আমলে সুবাদার ইসলাম খান চিশতী যখন ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন, তখন তিনি এ এলাকার কেন্দ্রে ঢাক বাজিয়ে যতদূর পর্যন্ত ঢাকে শব্দ শোনা যায় ততদূর পর্যন্ত তাঁর রাজধানীর সীমানা নির্ধারণ করেন। এই ঢাক বাজানো থেকেই ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়।[৩]

১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে, মতান্তরে ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরকে মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সুবা বাংলার (আধুনিক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বৃহৎ অঞ্চল নিয়ে গঠিত) রাজধানী করা হয়। সুবাদার বা আঞ্চলিক প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা গভর্নর ইসলাম খান চিশতী বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর দিল্লি থেকে ইসলাম খান চিশতীকে বাংলায় প্রেরণ করেছিলেন। চিশতীর দায়িত্ব ছিলো বাংলা ব-দ্বীপের পূর্বাঞ্চল এবং তারও পরের এলাকা দখল করে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান চিশতী সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করলে ঢাকা সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করে। এর পূর্বে ঢাকার পরিচিতি ছিলো ভিন্ন। *আকবরনামা*'তে একটি 'থানা' (সামরিক ফাঁড়ি) এবং *আইন-ই-আকবরী*'তে সরকার বাজুহার একটি 'পরগণা' রূপে ঢাকার স্থানিক পরিচয় পাওয়া যায়। তারও আগে ঢাকার অস্তিত্ব ছিলো। মানুষের বসতি ও জীবন-প্রবাহ ছিলো। কিন্তু সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৬০৮ থেকে ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার চারশত বছরের এই পর্বকে রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।[৪] যথা:

(ক) মুঘল সুবাদার ও নায়েব-নাজিম বা উপ-শাসকদের আমল (১৬০৮-১৭৬৫ খ্রি.)

(খ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.) এবং

---

[১] James Taylor, *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca* (Edited by Sirajul Islam), Dhaka: The Asiatic Soceity of Bangladesh, 2010, p. 68

[২] *Ibid*, p. 47

[৩] K. B. Sayid Aulad Hasan, *Notes on the Antiquities of Dacca*, Dhaka: Dacca University Press, 1912, Pp. 1-2

[৪] ওয়াকিল আহমদ, ঢাকায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধি (এম মোফাখখারুল ইসলাম ও ফিরোজ মাহমুদ সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল* (দ্বিতীয় খণ্ড: অর্থনীতি ও সংস্কৃতি), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ১৩৩

(গ) পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ আমল (১৯৪৭-২০০৮ খ্রি.)

ইসলাম খান চিশতী সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নতুন নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। এরপর প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবৎ রাজধানী হিসাবে ঢাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।[১] এই সময়ে প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিলো ঢাকায়। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হলে প্রশাসনিক এবং সামরিক দায়িত্বে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও কর্মচারী এবং অভিজাত শ্রেণি এখানে বসবাস শুরু করেন। ইসলাম খান চিশতীর সঙ্গে রাজকর্মচারী ও সেনাসদস্যসহ প্রায় ৫০,০০০ লোকের সমাগম ঘটে। এর সাথে বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিজীবী, দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণি এবং শহরের অবকাঠামো নির্মাণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় শ্রমিক ও কর্মজীবী শ্রেণি ঢাকায় সমবেত হয়। ফলে অতি দ্রুত এর স্থানিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। শহর কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। বিদেশি পর্যটক টেভারনিয়ারের হিসাব মতে ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিলো প্রায় এক লক্ষ।

সুবাদার আমলে (১৬০৮-১৭১৭ খ্রি.) ঢাকায় যাঁরা প্রধান শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই দিল্লির খোদ মুঘল বাদশাহ পরিবারের সদস্য ও নিকট আত্মীয় ছিলেন। সুবাদার ও সহযোগী শ্রেণি হিসাবে সভাসদ, দিওয়ান, কোতয়াল, খাজাঞ্চি, সিপাহশালার প্রমূখ রক্তে-বর্ণে-বিত্তে উচ্চবংশের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তারা সে যুগের আভিজাত্যের শীর্ষে অবস্থান করতেন।[২] *History of Bengal,* Vol. II অনুসারে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা থাকাকালীন সময়ে নিযুক্ত সুবাদারদের নাম ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদান করা হলো[৩]:

১. ইসলাম খান চিশতী — ১৬০৮-১৬১৩ খ্রি. (ঢাকায়: ১৬১০-১৬১৩ খ্রি.)

২. কাশিম খান চিশতী — ১৬১৩-১৬১৭ খ্রি.

৩. ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ — ১৬১৭-১২৪ খ্রি.

৪. মহব্বত খান — ১৬২৫-১৬২৬ খ্রি.

৫. মুকাররাম খান — ১৬২৬-১৬২৭ খ্রি.

৬. ফিদাই খান — ১৬২৭-১৬২৮ খ্রি.

---

[১] আবদুল করিম, *মোগল রাজধানী ঢাকা* (অনুবাদ: ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৭

[২] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[৩] Jadunath Sarkar, "Transformation of Bengal under Mughal Rule" (Edited by Jadunath Sarkar), *The History of Bengal*, Vol. II, Dhaka: The University of Dhaka, 2006 (Fourth Impression), Pp. 228-233

৭. কাশিম খান জুয়িনী — ১৬২৮-১৬৩২ খ্রি.

৮. আজম খান মীর মুহম্মদ বাকির — ১৬৩২-১৬৩৫ খ্রি.

৯. ইসলাম খান মাশহাদী — ১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রি.

১০. শাহ সুজা — ১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি. (শাহ সুজার অনুপস্থিতিতে ১৬৪৭-১৬৪৮ খ্রি. এক বছর ফিদাই খান ভারপ্রাপ্ত সুবাদার ছিলেন)

১১. মীর জুমলা — ১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.

১২. শায়েস্তা খান — ১৬৬৩-১৬৭৮ খ্রি. এবং পুনরায় ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রি.

১৩. ফিদাই খান (আজম খান কোকা) — ১৬৭৮ খ্রি.

১৪. শাহজাদা আজম শাহ — ১৬৭৮-১৬৭৯ খ্রি.

১৫. খান-ই-জাহান — ১৬৮৮-১৬৮৯ খ্রি.

১৬. ইব্রাহিম খান — ১৬৮৯-১৬৯৮ খ্রি.

১৭. শাহজাদা আজিম-উদ-দ্বীন (পরবর্তীকালে আজিম-উস-শাহ) — ১৬৯৮-১৭১২ খ্রি.

ঢাকার অবস্থান বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। ২৬ মাইল দীর্ঘ এ নদীটি সাভারের নিকটে ধলেশ্বরী নদী থেকে নির্গত হয়ে নারায়ণগঞ্জের কিছু উত্তর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদী এবং তার জন্মস্থল ধলেশ্বরী নদীর মাধ্যমে ঢাকা জলপথে বৃহৎ নদীসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত। বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নদীর গতি পরিবর্তন। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে, সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর ঢাকায় বসবাসকালীন সময়ে সম্ভবত পূর্ববাংলার নদীগুলোর অবস্থান বর্তমানকালের চেয়ে ভিন্ন ছিলো। এন. কে. ভট্টশালী দেখিয়েছেন যে, ফতুল্লা (প্রাচীনকালের ধাপা) থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবহমান বুড়িগঙ্গার যে ধারা ধলেশ্বরী নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে, প্রাথমিক মুঘল যুগে এবং বস্তুত সপ্তদশ শতকে তার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না।[১] তখনকার দিনে বুড়িগঙ্গা বর্তমান নামে পরিচিত ছিলো কিনা তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। মির্জা নাথান তাঁর *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* গ্রন্থে বুড়িগঙ্গা নদীকে দোলাই নামে উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত দুটি নদীর সংযোগস্থলের অস্তিত্ব পরবর্তীকালে বিদ্যমান না থাকলেও বুড়িগঙ্গা নদীর গতিপ্রবাহ তার স্বাক্ষর বহন করে। যেখানে তা দুটি শাখা দ্বারা লক্ষ্যা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং দুটি শাখায় তা বিভক্ত হয়েছে ঢাকার পূর্ব প্রান্ত ছাড়িয়ে। প্রধান শাখাটি

[১] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; N. K. Bhattasali, Begnal: Past and Present, Vol. LI, 1936, p. 51

খিজিরপুরের নিকটে এবং অন্য শাখাটি চার মাইল উজানে ডেমরার নিকটে লক্ষ্যা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।[১]

সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সময় থেকে, অর্থাৎ ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সুবা বাংলার রাজধানী পরবর্তী এক শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। এই সময়কালের মধ্যে শাহজাদা শাহ সুজা তাঁর সুবাদারিকালে একান্ত ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে ঢাকা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই ব্যবস্থা মাত্র বিশ বছর অর্থাৎ ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বজায় ছিলো। এই সময়ে তাঁর সাথে সুবাদারি সংস্থাপনাও স্থানান্তরিত হয় এবং ঢাকা পুনরায় সংকুচিত হয়ে একটি অধঃস্তন বিভাগীয় দপ্তরে পরিণত হয়।[২]

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের পর শাহ সুজা আরাকানে পালিয়ে গেলে পরবর্তী নতুন সুবাদার মীর জুমলা ঢাকায় পুনরায় রাজধানী স্থাপন করেন। তখন থেকে শাহজাদা আজম শাহের সুবাদারিকাল (১৬৭৮-১৬৭৯ খ্রি.) পর্যন্ত ঢাকা রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সুদৃঢ় অবস্থান থেকেই মীর জুমলা কুচ, হাজো এবং আসামের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এবং শায়েস্তা খান মগদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল নেন। এই ঢাকাতেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্য ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহ এবং পাঠান, মুঘল ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ীরা ভিড় জমিয়েছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার ইতিহাসে কিছু সম্পূর্ণ নতুন শক্তির উদ্ভব হওয়ায় ঢাকা রাজধানী হিসাবে তার মর্যাদা হারাতে থাকে। ঢাকা তখন কেবল একটি নিয়াবত অর্থাৎ নায়েব-নাজিম (ডেপুটি গভর্নর)-এর প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৩]

১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মেদেনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার জমিদার শুভ সিংহ এবং উড়িষ্যার আফগান সরকার রহিম খান যৌথভাবে মুঘল শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এতে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়। আলস্য এবং গ্রন্থপাঠের জন্য অস্বাভাবিক উন্মাদনা ছিলো সুবাদার ইব্রাহিম খানের। তিনি উল্লিখিত বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। বাদশাহ আওরঙ্গজেব সুবাদারের পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন। এর পর বাদশাহের পৌত্র শাহজাদা আজিম উদ্দিনকে (যাঁকে ১৭০৭ সালে তাঁর পিতা বাদশাহ শাহ আলম বাহাদুর শাহ আজিম-উশ-শাহ উপাধি প্রদান করেন) বাংলার সুবাদার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। নবনিযুক্ত শাহজাদা আজিম বিদ্রোহ দমনে সফল হলেন। কিন্তু ঢাকায়

---

[১] Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaibi,* (Eng. Tr. by Dr. M. I. Borah), Vol. I, Gauhati: 1936, p. 76; Ahmad Hsan Dani, Dacca: A Record of its Changing Fortunes, Dacca: Dacca Asiatic Press, 1962, p. 25

[২] Ahmed Hasan Dani, *op. cit.,* p. 31

[৩] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি 'সওদা-ই-খাস' নামে ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেব যুবরাজের এরূপ কার্যকলাপের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। অতঃপর বাদশাহ যুবরাজকে এ ধরনের নীতিবহির্ভূত কার্যকলাপ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। করতলব খান নামক একজন যোগ্য অফিসারকে বাংলার দিওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এ নিযুক্তি বাংলার ইতিহাসে; বিশেষত ঢাকার ইতিহাসে এক সুদূর ফল বয়ে আনে। করতলব খান ঢাকায় আগমনের পরপরই এদেশের রাজস্ব প্রশাসনের প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। এসব সংস্কারের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবাদারের প্রতিপত্তি সংকুচিত হয়ে যায়। স্বভাবতই সুবাদার রুষ্ট হন এবং দিওয়ানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। দিওয়ান করতলব খান ভবিষ্যতে পুনরায় এ ধরনের বিপদের আশঙ্কা অনুমান করে তাঁর দিওয়ানি সংস্থাপনা ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে (পরবর্তীকালের মুর্শিদাবাদ) স্থানান্তর করেন।[১]

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কাছে এই পরিস্থিতি ও ষড়যন্ত্রের খবর পৌঁছে যায়। তিনি শাহজাদা আজিম উদ্দিনকে ঢাকা ত্যাগ করে বিহারে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। শাহজাদা তাঁর পুত্র ফররুখ শিয়র এবং সরবুলন্দ খানকে ঢাকায় রেখে পরিবার-পরিজনসহ বিহারের দিকে যাত্রা করেন। এরপর শাহজাদা আজিম পাটনায় গিয়ে তাঁর বসতি স্থাপন করেন। বাদশাহের অনুমোদন সাপেক্ষে পাটনার নাম পরিবর্তন করে তিনি আজিমাবাদ নামকরণ করেন।[২]

বাদশাহ আওরঙ্গজেব ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানকে বাংলায় দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকার গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং নায়েব-ই-নাজিম এর প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান বাংলার নবাব নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত ঢাকা সুবা বাংলার রাজধানী হিসাবে অক্ষুণ্ন ছিলো। ১৭১৭-১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা নায়েব-ই-নাজিম বা সুবাদারের সহকারীর কর্মস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সময় ঢাকার বিপুল অবনতি ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্য বেশিরভাগই নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে ঢাকা প্রায় পরিত্যক্ত নগরে পরিণত হয়। নবাব মুর্শিদকুলী খান ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে মির্জা লুৎফুল্লাহকে ঢাকায় নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করেন। তিনি ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। এরপর সরফরাজ খান ঢাকার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত হলেও তিনি অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদে বসবাস করতেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে গালিব আলী খান ঢাকা-প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করতেন। ওই সময় যশওয়ান্ত রায় ঢাকার দেওয়ান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এভাবে ঢাকা ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন নায়েব-

---

[১] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

নিজাম দ্বারা এবং তাঁদের প্রতিনিধি দ্বারা প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে কার্যকর ছিলো।[১] ঢাকার নায়েব-নাজিমগণের কালানুক্রমিক তালিকা[২] নিম্নরূপ:

১. খান মুহাম্মদ আলী খান — ১৭১৭ খ্রি.

২. ইতিসাম খান — ১৭২৩-১৭২৬ খ্রি. আনুমানিক

৩. ইতিসাম খানের পুত্র, যাঁর নাম জানা যায়নি — ১৭২৬-১৭২৭ খ্রি.

৪. মির্জা লুৎফুল্লাহ — ১৭২৮-১৭৩৪ খ্রি.

৫. সরফরাজ খান — ১৭৩৪-১৭৩৯ খ্রি.

তাঁর প্রতিনিধিদ্বয়: (ক) গালিব আলী খান — ১৭৩৪-১৭৩৮ খ্রি. আনুমানিক

(খ) মুরাদ আলী খান — ১৭৩৮-১৭৩৯ খ্রি.

৬. আবদুল ফত্তাহ খান — ১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.

৭. নওয়াজিশ মুহম্মদ খান — ১৭৪০-১৭৫৪ খ্রি.

তাঁর প্রতিনিধিদ্বয়: (ক) হুসেন কুলী খান — ১৭৪০-১৭৪৪ খ্রি.

(খ) হুসেন উদ্দিন খান — ১৭৪৪-১৭৫৪ খ্রি.

তাঁর প্রতিনিধি: মুরাদ দৌলত — ১৭৫৪-১৭৫৫ খ্রি.

৮. জেসারত খান — ১৭৫৫-১৭৬২ খ্রি.

৯. মুহাম্মদ আলী — ১৭৬২-১৭৬৩ খ্রি.

১০. মুহাম্মদ রেজা খান — ১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রি.

১১. জেসারত খান (৮ সংখ্যক ব্যক্তি) — ১৭৬৫-১৭৭৮ খ্রি.

১২. হাসমত জঙ্গ — ১৭৭৮-১৭৮৫ খ্রি.

১৩. নুসরজ জঙ্গ — ১৭৮৫-১৮২২ খ্রি.

১৪. শমসুদ্দেলাহ — ১৮২২-১৮৩১ খ্রি.

১৫. কমর-উদ-দৌলাহ — ১৮৩১-১৮৩৪ খ্রি.

---

[১] Ahmed Hasan Dani, *op. cit.*, p. 50

[২] A. C. Banerjee, "Naib-Nazims of Dhaka", *Bengal: Past and Present*, Vol. LI, 1940, Pp. 17-29

১৬. গাজী-উদ-দ্বীন-হায়দার — ১৮৩৪-১৮৪৩ খ্রি.

এ কথা সত্য যে, সুবা বাংলার রাজধানী শহর হিসাবে মর্যাদা হারানোর পরই ঢাকার অবনতি ঘটে।[১] গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থাপনাসমূহ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে ঢাকা নায়েব-নাজিমদের আবাসস্থলে পরিণত হয়। ঢাকার নিয়াবত প্রদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ, বলা যায় আধুনিক বাংলাদেশের অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ করতো। এই সময়ে বণিক ও ব্যবসায়ীদের কর্মতৎপরতা, বিশেষত ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের কর্মতৎপরতা দ্রুত অপসারিত হয়। ঢাকা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের রপ্তানি প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পায়।[২] রাজধানী স্থানান্তরের কারণে ঢাকা শহরের অবনতি হয়েছে, এ কথা পুরোপুরি সত্য নয়। অবশ্য অনেক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছিলো। তখন নায়েব-নাজিমগণ ইসলাম খান চিশতীর কেল্লা বা দুর্গের মধ্যে বসবাস করতেন। কোম্পানির দিওয়ানি লাভের পর ইসলাম খানের কেল্লা ইংরেজ কর্মকর্তারা দখল করে নেয়। সে সময় নায়েব-নাজিম বড় কাটরা প্রাসাদে চলে যান।[৩] নিমতলী প্রাসাদ (তৎকালীন ঢাকা মিউজিয়ামের পাশে সেই প্রাসাদ আজ আর নেই। কিন্তু এর ফটক কক্ষে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যালয় অবস্থিত) নির্মিত হওয়ার পরে নায়েব-নাজিমগণ সেখানে চলে যান।[৪] এই সময়ের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পর্কে একটি তথ্য জানা যায়। ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে মির্জা লুৎফুল্লাহ (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান) চকবাজার নির্মাণ করেন।[৫] আরমানিটোলার মসজিদ নির্মিত হয় ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে।[৬] এছাড়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভের পর নিমতলী প্রাসাদ নির্মিত হয়।[৭]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমল (১৭৬৫-১৮৫৭ খ্রি.) এবং ব্রিটিশ আমল (১৮৫৭-১৯৪৭ খ্রি.) নামে দুটি আলাদা সময়কাল ভাগ করা হলেও ঢাকার পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবেচনায় বেশি পার্থক্য প্রতীয়মান হয় না। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যু হলে বাংলার রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ষড়যন্ত্রের মূল খলচরিত্র মীর জাফর আলী খান মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে পুতুল নবাব-এ পরিণত হন। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি ও ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে

---

[১] Ahmed Hasan Dani, *op. cit.,* p. 50

[২] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৩] F. B. Bradley, *op. cit.,* p. 220; Ahmed Hasan Dani, *op. cit.,* p. 201

[৪] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৫] Journal of the Asiatic Soceity of Pakistan, Vol. VII, No. 2, Pp. 300-301; আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৬] Ahmed Hasan Dani, *op. cit.,* p. 195

[৭] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times,* Pp. 98-99

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে কোম্পানি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে। ঢাকা নায়েব-নাজিমের পদ বহাল থাকলেও ক্রমশ তাঁরা ক্ষমতা হারিয়ে উপাধি-সর্বস্ব ও অনুদান-ভোগী নবাবে পরিণত হন। নায়েব-নাজিম গাজী উদ-দ্বীন হায়দার নিঃসন্তান হওয়ায় উক্ত পদ ও উপাধি বিলুপ্ত হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 'সিপাহী বিদ্রোহ' শুরু হলে ঢাকাতেও তার ছোঁয়া লাগে। ইংরেজ শাসক এ দেশের সিপাহীদের জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর দিয়ে কঠোর হস্তে তা দমন করে। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। এই সময় কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করলে ব্রিটিশ শাসনামল শুরু হয়। ভারতবাসী মহারাণীর প্রজায় পরিণত হয়।[১]

এদিকে ঢাকার মুকুটহীন নায়েব-নাজিমের পদ বিলুপ্ত হলে তাঁদের অবশিষ্ট গৌরব, শান-শওকত, ঐতিহ্যও ক্রমশ অস্তমিত হয়। পর্যায়ক্রমে ইংরেজরাই সর্বত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজকে সহযোগিতা দান করে ঢাকার নব্য ধনী ও জমিদার পরিবারের সদস্য আবদুল গণি ১৮৬৫ সালে নবাব উপাধি লাভ করেন। যা ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বংশানুক্রমে ব্যবহারের সুযোগ পান। এ পরিবারের সন্তান নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব আহসান উল্লাহ ঢাকার আধুনিকায়নে ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২]

মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলাদেশ ও সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। গভীরতর অর্থে এই ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের জন্য গৌরবের। বাংলাদেশে সেই গৌরবময় কালের কিছু মুঘল স্থাপত্য, প্রত্ন-সম্পদ ও মুঘল চিত্রকলা আজও টিকে আছে।

৩.৩ বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলা

বাংলাদেশে বস্তুত চারটি প্রতিষ্ঠানে আকর মুঘল চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া গেছে। সংরক্ষিত সেসব মুঘল চিত্রকর্মসমূহের অল্পসংখ্যক প্রদর্শিত এবং অধিকাংশ অপ্রদর্শিত অবস্থায় আছে। চারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে:

(ক) লালবাগ দুর্গ জাদুঘর

(খ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

(গ) বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ও

(ঘ) সরকারি সা'দত কলেজ গ্রন্থাগার।

উল্লিখিত চারটি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের তালিকা ও পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলো।

---

[১] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৩.৩.১ লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলা

লালবাগ দুর্গ পরিচিতিঃ

মুঘল ঐতিহ্যমণ্ডিত ও সিপাহিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান লালবাগ দুর্গ। মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা ওয়ালাজাহ মুহম্মদ আজম শাহ বাহাদুর ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুলাই মুঘল সুবা বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় আগমন করেন। এখানে বসবাসের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মুঘল প্রাসাদ দুর্গের মধ্যে বিদ্যমান এটিই একমাত্র নিদর্শন। আদিতে দুর্গটি কেল্লা-ই-আওরঙ্গাবাদ নামে পরিচিত ছিলো। কেল্লা আরবি শব্দ, এর অর্থ দুর্গ। আর আওরঙ্গাবাদ অর্থ দিল্লির মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বসতি। প্রকৃতপক্ষে এই প্রাসাদ দুর্গটি আওরঙ্গজেবের নামে শায়েস্তা খান ও যুবরাজ আজম ঢাকার সুবাদার থাকাকালীন (১৬৬৪-১৬৮০ খ্রি.) নির্মাণ করেছিলেন।[১] দুর্গটি বুড়িগঙ্গার পাড়ে পুরনো ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। উনিশ একর স্থান জুড়ে আয়তাকার এই দুর্গে রয়েছে তিনটি প্রবেশপথ। দুর্গের মূলকেন্দ্রে নির্মিত হয়েছে পরীবিবির[২] সমাধি। এই সমাধির পূর্বদিকে হাম্মাম কমপ্লেক্সসহ দরবার কক্ষ এবং পশ্চিমদিকে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। দরবার কক্ষের পূর্বদিকে রয়েছে একটি বিশালাকার পুকুর।[৩]

আলোকচিত্র ৩.১: লালবাগ দুর্গ জাদুঘর

---

১ Syed M. Ashfaque, *Lalbagh Fort: Monuments and Museum*, Karachi: Department of Archaeology & Museums, 1970, p. 5

২ পরীবিবি ছিলেন নবাব শায়েস্তা খানের কন্যা, প্রিয়দর্শিনী হিসেবে ঢাকায় তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিলো। তাঁর প্রকৃত নাম ইরান দুখত। 'দুখত' শব্দের অর্থ কন্যা। অর্থাৎ ইরানের কন্যা। কিন্তু ঢাকাবাসী গভীর ভক্তি থেকে তাঁর নাম দিয়েছিলেন পরীবিবি। পরীবিবির সঙ্গে শাহজাদা মুহম্মদ আজমের বিবাহ হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু ১৬৮৪ সালে পরীবিবির অকালমৃত্যু হয়। Syed M. Ashfaque, *Ibid*, p. 5

৩ Ahmed Hasan Dani, *Dacca: A Record of Its Changing Fortunes*, *op. cit.*, Pp. 181-187

শায়েস্তা খানের সময়ে সম্প্রসারণ ও নির্মাণ উভয় ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়।[১] বাংলাদেশে মুঘল আমলের স্থাপনার ক্ষেত্রে ঢাকার লালবাগ দুর্গ শীর্ষস্থানীয়। ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজম বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় এসে এই দুর্গের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বলে জানা যায়। কিন্তু দুর্গ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার আগেই মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাদশাহ তাঁকে ডেকে নিয়ে যান। ফলত অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পড়ে তাঁর পরবর্তী সুবাদার নওয়াব শায়েস্তা খানের ওপর। শায়েস্তা খান দুর্গে অনেক কাজ করলেও বিশেষ কোনো কারণে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেননি বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন। শায়েস্তা খান এখানে বসবাস করতেন বলে জানা যায়।[২] অবশ্য এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

লালবাগ দুর্গের পুকুরের ৩৯.৫ মিটার পশ্চিমে আয়তাকারে নির্মিত যে দ্বিতল ইমারতটি আছে, তার নিচের তলার আয়তন ৩২.৪৪ মিটার × ৬.১৮ মিটার। লালবাগ দুর্গে থানা থাকাকালীন এ গৃহের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়েছিল। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক এ গৃহটিকে যথাসম্ভ পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা (restored) হয়েছে।[৩]

এই ইমারতটি মূলত দরবার গৃহ ও হাম্মামখানার জন্য নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এটি লালবাগ দুর্গ জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জাদুঘরের দোতলার দরবারগৃহে ১১টি মুঘল চিত্রকর্ম দেয়ালে স্থাপিত দুটি প্রদর্শনী আঁধারে সংরক্ষিত আছে। কাচের তৈরি দুটি প্রদর্শনী আধারে চিত্রকর্মগুলো প্রদর্শনের জন্য সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে। সরেজমিন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উল্লিখিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের তালিকা ও পরিচিতি দেয়া হলো।

৫৮ নম্বর প্রদর্শনী আধার

১. সিংহাসনে বসা সম্রাট আওরঙ্গজেব (Portrait of Emperor Aurangzeb Seated on a Throne)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ২৩ × ১৭ সে.মি.

২. আসফ জাহ বাহাদুরের প্রতিকৃতি (Portrait of Asaf Jah Bahadur)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ২৫ × ১৬.৭৫ সে.মি.

---

[১] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[২] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৫১৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০

৩. শাহজাদা আজম শাহের প্রতিকৃতি (Portrait of Prince Azam Shah)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ২২.৫ × ১৫.৭৫ সে.মি.

সংগৃহীত নম্বর: N. M. P. 1958561

৪. দুরদানার প্রতিকৃতি (Portrait of Durdana)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ২২ × ১৬ সে.মি.

সংগৃহীত নম্বর: N. M. P. 1957 1017/7

৫. সিংহাসনে বসা জনৈক রাজার প্রতিকৃতি (Portrait of a King Seated on a Throne)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ২৪.৫ × ১৬ সে.মি.

সংগৃহীত নম্বর: N. M. P 1957 1017/4

৫৭ নম্বর প্রদর্শনী আধার

৬. মধুমতি অঙ্কিত একটি চিত্র (Portrait of Two Women by Madhumati)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ২৬ ১৭ সে.মি.

৭. বন্যজন্তু (A Scene of Animals in a Forest)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ৩৩ × ২২.৫ সে.মি.

সংগৃহীত নম্বর: N. M. P 1962 233/4

৮. উটের নাচ (A Scene of Dancing Camels)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ১৮ × ১৮ সে.মি.

৯. যুবরাজ ও রাজ-তনয়ার অশ্বচালনা (A Scene of a Prince and Princess Galloping Their Horses)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ২৩ × ১৭ সে.মি.

১০. অমাত্যদের আঘাতে রক্তাক্ত দুটি মানুষকে অবলোকন (A Scene depicting a Bull Goring two persons being watched by a Group of Nobles)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ২৮.৪ × ১৮.৮ সে.মি.

সংগৃহীত নম্বর: N. M. P. 1954 146/7

১১. বৃক্ষছায়ায় চিন্তামগ্ন খাজা হাফিজ সিরাজ (Khawaja Hafiz Shiraj Meditating Beneath a Tree)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ২৫ × ১৭ সে.মি.

উল্লিখিত ১১টি মুঘল চিত্রকর্ম ব্যতীত একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপিও লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। টেবিলে স্থাপিত অন্য একটি প্রদর্শনী আধারে উক্ত পাণ্ডুলিপিটি প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

পরিচিতি: **বাহার-ই-দানিশ**

চিত্রিত পাণ্ডুলিপি

এনায়েত উল্লাহ রচিত

একটি রোমান্টিক উপাখ্যান

১০৭০ হিজরি

লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত এগারোটি মুঘল চিত্রকর্ম সম্পর্কে যৎসামান্য তথ্য পাওয়া যায়। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব পাকিস্তান-এর তৎকালীন পরিচালক আহমদ নবী খানের বরাত দিয়ে জানা যায়, লালবাগ দুর্গ জাদুঘরের মুঘল চিত্রসমূহ লাহোর মিউজিয়াম থেকে এখানে সংগৃহীত হয়েছে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ রাজ্য থেকে লাহোর মিউজিয়াম কয়েকটি মুঘল চিত্রকলার মুরাক্কা সংগ্রহ করে। দেশভাগের পরে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের

(বর্তমান বাংলাদেশ) লালবাগ দুর্গ জাদুঘরের সংগ্রহ ভাণ্ডার সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১টি মুঘল চিত্রকর্ম প্রেরণ করে। লাহোর মিউজিয়ামের সংরক্ষিত মুঘল মুরাক্কা থেকে বন্টন হওয়া চিত্রকর্মের বৃহৎ অংশ লাহোর মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়। ক্ষুদ্র অংশটি লালবাগ দুর্গ জাদুঘরের জন্য বরাদ্দ করা হয়।[১]

৩.৩.২ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিচিতিঃ

আলোকচিত্র ৩.২: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ঢাকা জাদুঘর এর পরিবর্তিত নাম বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। শাহবাগে অবস্থিত এ জাদুঘরটি বাংলাদেশের প্রধান এবং সর্ববৃহৎ জাদুঘর। আলেকজান্ডার ফর্বেস ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ঢাকায় একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে রয়েছে ১৮৬৪ সালে ঢাকায় ইকোনমিক এক্সিবিশন প্রদর্শিত কৃষি-সরঞ্জাম ও উৎপাদিত পণ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। আরো রয়েছে, ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রাচীন সৌধমালা সংরক্ষণ আইন পাশ এবং ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে শিলং থেকে 'শিলং-কেবিনেট অব রয়েলস' প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর ও এর জন্য সংরক্ষণাগার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাসহ বিবিধ ঘটনা, অতঃপর ১৯১০ সালের ১ মার্চ সরকারের অবৈতনিক মুদ্রাবিদ এইচ. ই. স্টাপলটনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ১৯১২ সালের ২৫ জুলাই নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত তৈরি বিষয়ক সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে ১৯১৩ সালের ৫ মার্চ ঢাকায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়।

[১] গত শতাব্দীর ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় সার্ক আর্কিওলজিক্যাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় অধ্যাপক নাজমা খান মজলিশ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব পাকিস্তান-এর পরিচালক আহমদ নবী খানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ওই সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, লালবাগ দুর্গ জাদুঘরের মুঘল চিত্রকলাসমূহ সংগ্রহের প্রকৃত ইতিহাস।

এই সংশ্লিষ্ট গেজেট প্রকাশের পর ৩০ সদস্যের একটি প্রভিশনাল জেনারেল কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন এম. বনহামকার্টার, সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, সৈয়দ আওলাদ হাসান, বি. কে. দাস, খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ, হাকিম হাবিবুর রহমান, সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর, আবুল হাসনাত প্রমুখ। পদাধিকার বলে কমিটির সভাপতি ছিলেন ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার নিকোলাস ডি বিটসন বেল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ঢাকা জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ইতিমধ্যে প্রভিশনাল কমিটি অর্পিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে জাদুঘর পরিচালনার একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করলে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর বাংলা সরকার সেটি অনুমোদন করে। এ নীতিমালা অনুসারে জাদুঘর পরিচালনার জন্য গঠিত হয় সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ। পদাধিকার বলে দুই পরিষদেরই সভাপতি ছিলেন ঢাকার তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার এফ. সি. ফ্রেঞ্চ। ১৯১৪ সালের ৩ মার্চ সাধারণ পরিষদে জাদুঘরের জন্য অর্থবরাদ্দের দাবি উত্থাপন, ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯মে নির্বাহী পরিষদের এক সভায় কিউরেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত এবং ১৯১৪ সালের ৬ জুলাই ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে প্রথম কিউরেটর নিয়োগের মধ্য দিয়ে ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট এ জাদুঘরটি দর্শকদের জন্য প্রথম উন্মুক্ত করা হয়। পূর্ববাংলা এবং আসাম সরকারের সচিবালয় হিসাবে পরিচিত বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের নির্ধারিত কক্ষে স্থাপিত জাদুঘরের সংগ্রহে প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছিল মাত্র ৩৭৯টি নিদর্শন। সংগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে নিমতলির বারোদুয়ারিতে ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত করে ঢাকা জাদুঘর কমিটি নামে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতি এবং জাদুঘরের কিউরেটর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর অবৈতনিক কিউরেটর নিযুক্ত হন ড. আহমদ হাসান দানী। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে এ দায়িত্ব পালন করেছেন আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, সিরাজুল হক, মফিজুল্লাহ কবীর প্রমুখ। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল ঢাকা মিউজিয়াম অর্ডিন্যান্স পাশ হলে ঢাকা জাদুঘর একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর অধীনে ন্যস্ত হয়। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অর্ডিন্যান্স পাশ হলে পূর্বের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর বিলুপ্তি ঘটে। এরপর জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠিত হয়। জাদুঘরের নতুন নাম 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর' নির্ধারণ করা হয়। ঢাকার শাহবাগ এলাকায় স্থানান্তরিত আধুনিক বৃহদায়তনের দৃষ্টিনন্দন ইমারতটি ১৯৮৩ সালের ১৭ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয়। ৪ তলাবিশিষ্ট ২০,০০০ বর্গমিটার আয়তনের ভবনটিতে ৪৪টি দর্শক গ্যালারি রয়েছে।[১]

[১] দেলওয়ার হাসান, জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ, ঢাকা কোষ (সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ১৪৩-১৪৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে। সংগৃহীত নিদর্শনাদির প্রায় তেপ্পান্ন হাজার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুদ্রাসহ সাতষট্টি হাজার নিদর্শনের এক বিশাল সংগ্রহ রয়েছে এ বিভাগে। এগুলোর মধ্যে প্রত্ননিদর্শন, প্রাচীন ভাস্কর্য, স্থাপত্যাংশ, পোড়ামাটির ফলক, তাম্রলিপি, শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, ফরমান ও দলিলপত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের তৃতীয় তলায় ৩৩ নম্বর প্রদর্শনী কক্ষের (পাণ্ডুলিপি ও দলিলপত্র) কাচের প্রদর্শনী-আধারে ৬টি আকর (Original) মুঘল চিত্রকর্ম সংরক্ষিত রয়েছে। সেগুলোর তালিকা ও পরিচিতি দেয়া হলো। যথা-

১. **একজন দরবেশের প্রতিকৃতি Portrait of Seated Dervish** (Side View), Headgear, (Tasabi in left hand and book in right hand).
মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)
পরিমাপ: ৮.৫ × ৫.৫ ইঞ্চি
সময়কাল: আঠারো শতকের শেষভাগ
সংগৃহীত নম্বর: ২১৯০

২. **হেরেমের দৃশ্য (View of Harem)**
(এক তরুণীসহ শাহজাদা, হুকার নল শাহজাদার হাতে, সাতজন নর্তকীর মধ্যে পাঁচজন পশ্চাতে বাজনারত)
মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)
পরিমাপ: ৯.২৫ × ৮.৭৫ ইঞ্চি
সংগৃহীত নম্বর: ২১৯৭

৩. **মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্-এর প্রতিকৃতি (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)**
Portrait of The Mughal Emperor Muhammad Shah (1719-1748 A.C.)
মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)
পরিমাপ: ১১.২৫ × ৮.২৫ ইঞ্চি
সময়কাল: আঠারো শতকের শেষভাগ
সংগৃহীত নম্বর: ২১৮৭

৪. **দরবার দৃশ্য (Scene of Mughal Court)**
(সভাসদ পরিচারকসহ, তিনজন পশ্চাতে, সম্মুখে তিনজন ওমরাহ, দুজন প্রহরী)
মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ৯.১২৫ × ৭ ইঞ্চি

সময়কাল: আঠারো শতকের শেষভাগ

সংগৃহীত নম্বর: ২১৯৪

৫. একজন সভাসদ-এর প্রতিকৃতি

Portrait of Seated Courtiers (Side View)
(উপবিষ্ট সভাসদ, সাদা পাগড়ি ও গলায় হলুদ রঙের উত্তরীয়, দুহাতে একটি তরবারি ধরা)

মাধ্যম: কাগজে জলং (Gouache)

পরিমাপ: ৭.৫৭ × ৪ ইঞ্চি

সময়কাল: আঠারো শতকের শেষভাগ

সংগৃহীত নম্বর: ২১৯১

৬. পরিচারকসহ একজন অভিজাত ব্যক্তি

Scene of Meeting (Darbar)
(সভাদৃশ্য, কক্ষের বাইরে পাঁচজন ব্যক্তি, দুজন উপবিষ্ট এবং তিনজন দাঁড়ানো)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ৮.০৬২৫ × ৫.২৫ ইঞ্চি

সময়কাল: আঠারো শতক

সংগৃহীত নম্বর: ২১৯৩

উল্লিখিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহ তৎকালীন ঢাকা জাদুঘরের জন্য উপহার দিয়েছিলেন খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ও লেখক সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর।[১]

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ৩৩ নম্বর এই প্রদর্শনী কক্ষে আরও কিছু মুঘল চিত্রকলার নিদর্শন রয়েছে। যথা:-

(ক) পাণ্ডুলিপি: শাহনামা

(চিত্রিত, ঐতিহাসিক মহাকাব্য)

পরিমাপ: ৩৩ × ২২ সে.মি.

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

---

[১] সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর (১৮৮৫-১৯৭২ খ্রি.) লেখক; প্রাচীন নির্দশনাদির সংগ্রাহক এবং ঐতিহাসিক। ঢাকা জাদুঘরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি এর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন এ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য। তিনি তাঁর বহু ব্যক্তিগত সংগ্রহ জাদুঘরে দান করেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ২০৯টি প্রাচীন ও মুঘল মুদ্রা, প্রত্নসামগ্রী এবং পূর্ব ভারত হতে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র। ১৯৫২ সালে তৈফুর-এর *Glimpses of Old Dhaka* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এটি ঢাকার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ওপর গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ।

রচয়িতা: পারস্যের কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসী

লিপিকার: অজ্ঞাত

লিপিকাল: আনুমানিক আঠারো শতক

সৌজন্য: জনাব ইজতেবাউর রহমান খান

সংগৃহীত নম্বর: ০১.০১.০০৫.১৯৭৭.০০৪২৮

টেবিলের ওপর স্থাপিত কাচের প্রদর্শনী আধারের উক্ত পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত রয়েছে। এটি শাহনামার প্রথম খণ্ড। দর্শকদের সুবিধার্থে পাণ্ডুলিপিটি উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা রয়েছে। এতে ১৯টি চিত্রকর্ম আছে।

(খ) চিত্রিত শাহনামা

উক্ত চিত্রিত *শাহনামা*র ৮টি মুঘল চিত্রকর্ম গ্যালারির দেয়ালের প্রদর্শনীর জন্য স্থাপিত হয়েছে। জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী লেখা যায়- এই মিনিয়েচর চিত্রকর্মগুলো মূলত *শাহনামা* মহাকাব্যের চিত্রিত পৃষ্ঠা। এটি পারস্যের কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসী রচিত। গ্রন্থটি ১০৮৮ হিজরির। ১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কোল নিবাসী আবদুর রশীদ চিশতী কর্তৃক অনুলিখিত। চিত্রকরের নাম অজ্ঞাত।

এই ৮টি চিত্রকর্মের সংগৃহীত নম্বর: ই-২২০০, ২১৯৯, ২২০৩, ২২০৪, ২১৯৮, ২২০১, ২২০৫ ও ২২০২।

এই আটটি চিত্রকর্ম বাদে আরও ৩টি একই সিরিজের চিত্রকর্ম জাদুঘরের সংরক্ষণাগারে আছে। ওই তিনটি চিত্রকর্মের সংগৃহীত নম্বর: ২২০৬, ২২০৭ ও ২২০৮। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের (তৎকালীন ঢাকা জাদুঘর) জন্য এই এগারোটি *শাহনামা* পাণ্ডুলিপি চিত্রকর্ম সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর উপহার দিয়েছিলেন।[১] জাদুঘরের সংরক্ষণাগারে আরো কিছু আকর মুঘল চিত্রকর্ম আছে। যেগুলো একক চিত্র বলে ধারণা করা যায়। নিম্নে এই চিত্রকর্মগুলোর তালিকা ও পরিচিতি দেয়া হলো। যথা:

১. ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম গাজী-উদ-দ্বীন হায়দারের প্রতিকৃতি (১৮৩৪-১৮৪৩ খ্রি.)
Portrait of Naib-e-Nazim Gaziuddin Haider of Dhaka (1834-1843)
মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)
সংগৃহীত নম্বর: ২১৮২

২. ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নুসরত জঙ্গ বাহাদুরের প্রতিকৃতি (১৭৮৫-১৮২২ খ্রি.)
Portrait of Naib-e-Nazim Nusrat Jung Bahadur of Dhaka (1785-1822)

---

[১] Enamul Haque, *Islamic Art in Bangladesh (Catalogue of A special Exhibition in Dacca Museum, April 3-28, 1978),* Dacca: Dacca Museum, 1978, p. 20

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

সংগৃহীত নম্বর: ২১৮৩

৩. তৈমুরের প্রতিকৃতি

Portrait of Taimur

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ১০.৫ × ৮ ইঞ্চি

সময়কাল: ১৭৭০-১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দ

সংগৃহীত নম্বর: ২১৮৬

৪. মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতি

Portrait of The Mughal Emperor Shahjahan

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ৭.২৫ × ৪.৭৫ ইঞ্চি

সংগৃহীত নম্বর: ২১৮৮

৫. একজন শ্মশ্রুধারী অভিজাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি

Portrait of Aristocrat Bearded Man

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ১৯.৩৬ × ১১.০৯ সে.মি.

সংগৃহীত নম্বর: ২১৮৯

৬. হারেম দৃশ্য

View of Harem

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ১৯.০৫ × ১০.৭৯ সে.মি.

সংগৃহীত নম্বর: ২১৯২

৭. হারেম দৃশ্য

View of Harem

মাধ্যম: কাগজে নম্বর (Gouache)

পরিমাপ: ৯.২৫ × ৮.৭৫ ইঞ্চি

সংগৃহীত নম্বর: ২১৯৬

৮. ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম হাসমত জঙ্গের প্রতিকৃতি (১৭৭৮-১৭৮৫ খ্রি.)

Portrait of Hasmat Jung (1778-1785)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

সংগৃহীত নম্বর: ২২০৯

৯. ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নুসরত জঙ্গের প্রতিকৃতি

Portrait of Nusrat Jung

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

সংগৃহীত নম্বর: ২২১০

১০. একজন শাহজাদার প্রতিকৃতি (অজ্ঞাত)

Portrait of Unidentified Prince

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ৫ × ৩.৫ ইঞ্চি

সংগৃহীত নম্বর: ২২১১

১১. ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম কমর-উদ-দৌলাহর প্রতিকৃতি

Portrait of Kamrudawla

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ৫.৬২৫ × ৩.৬৮৭৫ ইঞ্চি

সংগৃহীত নম্বর: ২২১২

১২. নাদির শাহের প্রতিকৃতি

Portrait of Nadir Shah

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ৭ × ৪.৫ ইঞ্চি

সংগৃহীত নম্বর: ১৯১২৫

ঢাকার জলরং

মুঘল চিত্রকলার অনুসরণে সৃষ্টি হয়েছে ঢাকার জলরং শীর্ষক চিত্রমালা। এই চিত্রকর্মসমূহ অঙ্কনের পেছনে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস।

ঢাকার নায়েব নাজিম নুসরত জঙ্গ ছিলেন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। তিনি লিপিকলার সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন (Calligraphist)। চিত্রকলার প্রতি তাঁর ছিলো গভীর অনুরাগ। নিমতলী প্রাসাদে বসেই নওয়াব নুসরত জঙ্গ ঢাকার সর্বপ্রথম ইতিহাস গ্রন্থ *তারিখ-ই-নুসরত জঙ্গি* (অর্থাৎ নুসরত জঙ্গের

ইতিহাস) ফারসি ভাষায় রচনা করেন। সেসময় তাঁর আমলের অঙ্কিত চিত্রকলার বহু নিদর্শন ছিল। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বর্তমানে কিছু সংরক্ষিত আছে।[১]

উনিশ শতকের প্রারম্ভে নওয়াব নুসরত জঙ্গের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারি শিল্পীদের দ্বারা 'ঢাকার জলরং' চিত্রমালা অঙ্কিত হয়েছিল। দরবারি শিল্পীদের মধ্যে শুধু আলম মুসাব্বির (মুসাব্বির অর্থ শিল্পী) নামটিই পাওয়া যায়। 'ঢাকার জলরং' নামে সুখ্যাত এই চিত্রকর্মগুলো বস্তুত সেকালের ঢাকার ঈদ মিছিল ও মুহররম মিছিলের অসামান্য দলিলস্বরূপ। এগুলোই ঢাকায় সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলার সর্বশেষ নিদর্শন।[২]

নুসরত জঙ্গ তাঁর আমলের ঢাকার ঐতিহ্য ও স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার জন্য উল্লিখিত চিত্রকর্মগুলো দরবারি শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কন করিয়েছিলেন। উনিশ শতকের ঢাকার সমাজচিত্রের ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য দলিল হিসাবে ওই চিত্রকর্মসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩]

ঢাকার ঈদ মিছিল ও মুহররম মিছিলের বিষয়বস্তু সম্বলিত এই চিত্রকর্মগুলো সেকালের কোথায় প্রদর্শিত হত এবং পরবর্তীকালে কিভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে (তৎকালীন ঢাকা জাদুঘর) সংগৃহীত হল, সে সম্পর্কে কিছু গুরুত্ববহ তথ্য পাওয়া যায়।

ড. আহমদ হাসান দানী পুরনো ঢাকার বেচারাম দেউরীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসনাত আহমদের বাসা থেকে চিত্রগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মুহররম মাসে হাসনাত সাহেব বেচারাম দেওরীতে ছবিগুলোর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। এই প্রদর্শনীতে বিপুল দর্শক সমাগত হত। খান বাহাদুর আবুল হাসনাতের সঙ্গে আমহদ হাসান দানীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আরেক গুণী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর। হাসনাত সাহেব একদিন তাঁর বাসায় দানীকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালেন।

দানীর লেখায় এর বিবরণ এসেছে এভাবে-

> আতিথেয়তার জন্য ঢাকা ছিলো বিখ্যাত। এই খ্যাতির রেশ তখনও ফুরিয়ে যায়নি। হাসনাত সাহেব আমার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন ঐতিহ্যবাহী সব ঢাকাই খাবার। সে এক এলাহী কাণ্ড। যেন কোনো নবাবের বাড়িতে খেতে এসেছি। নৈশভোজের পর বলেছি, ঈদ ও মুহররম মিছিলের চিত্রকর্মগুলো দেখতে চাই। সেগুলো একটি কামরায় ঝোলানো ছিলো। হাসনাত সাহেব সে ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন- প্রফেসর দানী, এগুলো আপনার,

---

[১] Syed Muhammed Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka*, Dacca: Published by S. M. Pervez, 1956, p. 298

[২] *Ibid*, p. 298

[৩] Enamul Haque, *op. cit.*, p. 20

আপনি চাইলেই নিতে পারেন। আমি তো (দানী) হতবাক। আর হাসনাত সাহেব এমনই ভদ্রমানুষ যে, তিনি একবারও উল্লেখ করেননি চিত্রকর্মগুলো তাঁর দান হিসাবে জাদুঘরে গৃহীত হোক। জাদুঘরে তখন স্থানাভাব, তা সত্ত্বেও আমি (দানী) চিত্রকর্মগুলো নিয়ে এসে দেয়ালের বেশ উঁচুতে সেগুলো টাঙানোর ব্যবস্থা করেছি। এভাবেই ঢাকা জাদুঘরের সংগ্রহে এলো অমূল্য এক সম্পদ।[১]

উল্লেখ্য, আবুল হাসনাতের সংগ্রহের আসার পূর্বে চিত্রগুলো ছোট কাটরায় বসবাসরত ঢাকার নওয়াব শায়েস্তা খানের এক বংশধরের সংরক্ষণে ছিল।[২]

বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ঢাকার জলরং শীর্ষক চিত্রগুলো সংরক্ষিত রয়েছে।

মোট চিত্রকর্ম	: ৩৯টি
ঈদের মিছিল শীর্ষক চিত্র	: ২২টি
মুহররম মিছিল শীর্ষক চিত্র	: ১৭টি
গ্যালারিতে প্রদর্শিত চিত্র	: ১৭টি (৩৩নং গ্যালারি)
সংরক্ষণাগারে রয়েছে	: ২২টি
মাধ্যম	: কাগজে জল রং (Gouache)
পরিমাপ	: ২৪ × ১৮ ইঞ্চি
সংগৃহীত নম্বর	: ২৮৬০ (৩৯টি চিত্রকর্ম)
সময়কাল	: উনিশ শতক

খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসনাতের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

---

[১] মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান*, ঢাকা: ১৯৯১, পৃ. ৪০-৪১
রফিকুল ইসলাম রফিক, *যুগে যুগে ঢাকার ঈদ মিছিল*, ঢাকা: রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৪, পৃ. ৪৩

[২] Syed Muhammed Taifoor, *op. cit.*, p. 298

৩.৩.৩ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলা

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর পরিচিতিঃ

আলোকচিত্র ৩.৩: বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুঘর। এটি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির একটি বড় অর্জন। শরৎকুমার রায় এবং তাঁর সহযোগী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ প্রত্ন-অনুরাগী এই প্রতিষ্ঠান দুটি গড়ে তোলার জন্য নেপথ্যে বহু মূল্যবান সময় ও নিরলস শ্রম ব্যয় করেন। তাঁদের সারাজীবনের প্রয়াস ছিল বাংলার, বিশেষত বরেন্দ্র অঞ্চলের যে-সকল অমূল্য প্রত্নসম্পদ তখনও টিকে ছিল, তা জনসম্মুখে প্রদর্শন করা।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্নস্থল আবিষ্কারের লক্ষ্যে শরৎকুমার ১৯১০ সালের এপ্রিলে দেওপাড়া, পালপাড়া, মালঞ্চ, জগপুর, ইটাহার, চব্বিশনগর, মান্দইল, কুমারপুর, খেতুর ও বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। তাঁরা মান্দইল থেকে চণ্ডীর কয়েকটি প্রমাণসাইজ মূর্তিসহ প্রায় ৩২টি ভাস্কর্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। রাজশাহীতে ফিরে আসার পর শহরের গণ্যমান্য নাগরিকগণ শরৎকুমার ও তাঁর সহকর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং প্রত্নসামগ্রীসমূহ রাজশাহীতে সংরক্ষণের ওপর জোর দেন। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদে রাজশাহী জাদুঘর (পরবর্তীকালে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর) গড়ে ওঠে এবং প্রত্নসামগ্রী সংরক্ষণের জন্য শরৎকুমার প্রতিমাসে ২০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯১১ সালে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংগৃহীত সকল দুষ্প্রাপ্য ও অনন্য নমুনা কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর দাবি করলে বরেন্দ্র জাদুঘরের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ১৯১২ সালে রাজশাহীতে এসে সোসাইটির সংগ্রহগুলো দেখে মুগ্ধ হন। এর অল্পকাল পরেই বাংলার গভর্নর ১৯১৩

সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির ১১নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থানীয় জাদুঘরগুলোর সংগঠকদের প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সাধারণ্যে প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান করেন।

শরৎকুমার নিজ অর্থ ব্যয় করে তাঁর বড় ভাই দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায়ের দানকৃত জমির উপর জাদুঘরের জন্য ভবন নির্মাণ করেন। ১৯১৬ সালের ১৩ নভেম্বর লর্ড কারমাইকেল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯১৯ সালের ২৭ নভেম্বর সম্পাদিত দানপত্রের মাধ্যমে শরৎকুমার সম্পূর্ণ সুসজ্জিত ভবনটি জাদুঘর ও পাঠাগারের নিমিত্তে সোসাইটিকে প্রদান করেন। একই দিন গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে এটি উদ্বোধন করেন।[১]

১৯৩৭ সালের ৬ নভেম্বরের এক সরকারি প্রজ্ঞাপন মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত ম্যানেজমেন্ট কমিটির নিকট বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি বর্তমান বিল্ডিং-এর উপর এর স্বত্বাধিকার, সকল প্রত্নসংগ্রহ, মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি এবং আসবাবপত্র তুলে দেয়। নিদর্শনসমূহের তালিকায় অন্তর্গত ছিলো প্রস্তর ভাস্কর্য, ধাতুনির্মিত ভাস্কর্য, কাঠের ভাস্কর্য, মৃন্ময় ভাস্কর্য, কামান, অলঙ্কৃত ইট, পোড়ামাটির ফলক, চকচকে টালি, প্রস্তরলিপি, পোড়ামাটির লিপি, দলিলপত্র (কাগজ), ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত পাত্র (ধাতব), গহনা, স্বর্ণমুদ্রা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ।

১৯৩০ সালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং ১৯৪৬ সালে শরৎকুমার রায়ের মৃত্যুর ফলে জাদুঘরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ জাদুঘরের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তোলে। ১৯৪৯ সালে জাদুঘরটিকে মেডিক্যাল স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত জাদুঘরের উত্তরাংশ স্কুলের দখলে ছিল। দেশবিভাগের পর থেকে প্রায় ১৯ বছর জাদুঘরটি বলতে গেলে অচল অবস্থায় পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাউন্টেন্ট জেনারেল প্রমিজরি নোটসমূহ আটকে দিলে সেগুলো কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আনা সম্ভব হয়নি। ফলত, ট্রাস্টফান্ড থেকে জাদুঘর মাসিক ১১০০ টাকার যে সুদ পেত তা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট থেকে জাদুঘর যে সাময়িক অনুদান পেত তার ওপরই এটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই অনুদান দিয়েই প্রতিষ্ঠানটি তার প্রত্নসংগ্রহ ও লাইব্রেরিতে নতুন সংযোজন চালিয়ে যেতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে ১৯৫৮ সালে জাদুঘরটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আনুকূল্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে গবেষণা কর্মের প্রকাশনার জন্য দশ হাজার টাকার একটি অনুদান লাভ করে। একইসূত্রে এবং একই উৎস থেকে জাদুঘর ১৯৬১ সালে ত্রিশ হাজার টাকার একটি অনুদান পায়। এই অর্থপ্রদানের উদ্দেশ্য ছিল একটি লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ করা, যাতে জাদুঘরের স্থানাভাব দূর করা যায়। প্রাদেশিক সরকার এই আর্থিক অনুদানের পরিপূরক হিসাবে চৌদ্দ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ বরাদ্দ করে। ১৯৬১ সালে

---

[১] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, "বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর", *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ খণ্ড ৬ (প্রধান সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৩০৭

মেডিক্যাল স্কুলটি জাদুঘরের উত্তরাংশ জাদুঘরকে প্রত্যার্পণ করলে, প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে একই সালে বর্তমান গ্রন্থাগারে ভবনটি নির্মিত হয়।[১]

দেশবিভাগের পরও জাদুঘর-এর কার্যাবলির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু এ সত্য যে, জাদুঘরের মতো একটি প্রতিষ্ঠান অনিয়মিত সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার জাদুঘর পরিচালনা পর্ষদের ওপর শর্তারোপ করে যে, জাদুঘরটি প্রাদেশিক সরকারের হাতে তুলে দেওয়া না হলে জাদুঘরের উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হবে না। পরিচালনা পর্ষদ সরকারের নিকট জাদুঘর অর্পণ করা সমীচীন মনে করেনি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী জেলা প্রশাসন জাদুঘরটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অর্পণ করার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। হস্তান্তর পত্র যথারীতি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৬৪ সালের ১০ অক্টোবর এটি আইনসম্মত উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর পরিচালনার সকল আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর পরিচালিত হচ্ছে।[২]

এই জাদুঘরে কয়েকটি আকর মুঘল চিত্রকর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। নিম্নে সেগুলোর পরিচিতি দেওয়া হলো। যথা-

১. মুঘল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের আবক্ষ প্রতিকৃতি

Portrait of The Mughal Empress Mumtaz Mahal

মাধ্যম: হাতি দাঁতের ফলকে অঙ্কিত

পরিমাপ: আনুমানিক ৫০ সে. মি (উপবৃত্তাকার)

সংগৃহীত নম্বর: ভি আর এম ২৭৭৬

সময়কাল: আঠারো শতক

পুঠিয়ার রাণী এই চিত্রকর্ম শ্রী মণীন্দ্র মোহন চৌধুরীকে উপহার দিয়েছিলেন ২১ জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে।

২. ইতিমাদ-উদ-দৌলার প্রতিকৃতি

Portrait of Itimad-ud-Doulah

মাধ্যম: কাগজে জলরং

পরিমাপ: ৩৮ × ২৮ সে. মি.

সংগৃহীত নম্বর: ভি আর এম ২৬৩১

ড. আই. এইচ. জুবেরির মাধ্যমে এই চিত্রকর্মটি জাদুঘরে সংগৃহীত হয়।

---

[১] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

৩. বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতি (দ্বিতীয়)

A Portrait of the Emperor Shah Jahan II (Rafi'ud Daulah)

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ৩৬ × ২৪ সে. মি.

সংগৃহীত নম্বর: ভি আর এম ২৬৩২

ড. আই. এইচ. জুবেরির সৌজন্যে প্রাপ্ত চিত্রকর্ম।

৪. একজন অজ্ঞাত মুঘল অমাত্যের প্রতিকৃতি

Portrait of an Unidentified Mughal Grandee

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

পরিমাপ: ৩৪ × ২৭ সে. মি.

সংগৃহীত নম্বর: ভি আর এম ২৬৭৫

সময়কাল: আঠারো শতক

ড. আই. এইচ. জুবেরির সৌজন্যে প্রাপ্ত চিত্রকর্ম, ৩১ মার্চ ১৯৫৪ সাল।

শাহনামা পারস্যের কিংবদন্তি কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসীর অমর মহাকাব্য। *শাহনামা* মুঘল চিত্রকলার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মুঘল চিত্রকলায় *শাহনামার* পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ন ও মুরাক্কা বিভিন্ন সময় অব্যাহত ছিল।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে *শাহনামার* তিনটি মুরাক্কা চিত্র সংরক্ষিত রয়েছে। ওই তিনটি চিত্রকর্মের সংগৃহীত নম্বর যথাক্রমে- ভি আর এম- ২৬৭৬; ভি আর এম- ২৬৭৭ ও ভি আর এম- ২৬৭৮। মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)। পরিমাপ: ৩৫ × ২৫ সে. মি.। ড. আই. এইচ. জুবেরির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩.৩.৪ সরকারি সা'দত কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত শাহনামা

সরকারি সা'দত কলেজ পরিচিতি:

আলোকচিত্র ৩.৪: সরকারি সা'দত কলেজ

টাঙ্গাইলের সরকারি সা'দত কলেজ বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে করটিয়া সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বলা হয়, অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের উদ্যোগে স্থাপিত প্রথম কলেজ এটিই। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভেই টাঙ্গাইলের করটিয়াতে কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ শুরু হয়। ওয়াজেদ আলী খান পন্নী তাঁর সুবিশাল জমিদারির একটা বড় অংশ কলেজের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। তাঁকে কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা করেন অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ।

ওয়াজেদ আলী খান ও ইব্রাহিম খাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৬ সালের মে মাসে করটিয়াতে কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেয়। প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ওয়াজেদ আলী খানের পিতামহ সা'দত আলী খান পন্নীর নামানুসারে। ওই একই বছর জুলাই মাসে নয়টি বিভাগ, আটজন শিক্ষক ও ১০৮ জন ছাত্র নিয়ে সা'দত কলেজের যাত্রা শুরু হয়। শুরু থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান এলাকায় পরিচিতি লাভ করে। সেই সুনাম এখনো আছে। বর্তমানে এই কলেজে ১৮টি বিষয়ে সম্মান, ১৩টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও স্নাতক (পাস) কোর্স চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার।[১]

[১] কামনাশীষ শেখর, "টাঙ্গাইল সরকারি সাদত কলেজ: তারুণ্যে ভরপুর", *প্রথম আলো*, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ঢাকা: ২০১৬, পৃ. ৪

এই কলেজ-গ্রন্থাগারের দোতলায় কাচের প্রদর্শনী আধারে সংরক্ষিত আছে *শাহনামা*র চিত্রিত পাণ্ডুলিপির একটি আকর কপি।

শাহনামা (চিত্রিত পাণ্ডুলিপি)

(পারসিক কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসীর মহাকাব্য)

মাধ্যম: কাগজে কালি ও কলম, জলরং এবং স্বর্ণচূর্ণের রং

পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠার পরিমাপ: ৫২ × ৩২ সে. মি.

প্রতিটি চিত্রকর্মের পরিমাপ: ২১ × ১৯ সে. মি.

দৃশ্যগ্রাহ্য চিত্রকর্মের সংখ্যা: ৫০টি

সময়কাল: আঠারো শতক

ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সৌজন্যে সংগৃহীত।

গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিটি কয়েক যুগ ধরে অযত্নে-অবহেলায় এখনো টিকে আছে। যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত না হওয়ায় এই পাণ্ডুলিপিটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। পাণ্ডুলিপির সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগের অনেকগুলো পৃষ্ঠা খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনেক পৃষ্ঠা চিত্রকর্মসহ ছিঁড়ে গেছে। তবে পাণ্ডুলিপির মধ্যভাগের কিছু অংশ এখনো ভালো অবস্থায় রয়েছে। কিছু চিত্রকর্ম সুন্দরভাবে অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। উল্লেখ্য *শাহনামা*র এই কপিটির মতো এত উৎকর্ষমণ্ডিত চিত্রিত পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশের আর কোনো প্রতিষ্ঠানে নেই। নিঃসন্দেহে এ এক অসামান্য নিদর্শন।

৩.৪ মুঘল রাজধানী ঢাকা থেকে বিলুপ্ত হওয়া মুরাক্কা

ইসলামী চিত্রকলার ইতিহাসে মুরাক্কা (*Muraqqa*) বা চিত্রকর্ম ও লিপিশিল্পের (Calligraphy) অ্যালবাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মুঘল রাজধানী ঢাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একটি মুরাক্কা সম্পর্কে অধ্যাপক নাজমা খান মজলিশের গবেষণা প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। মুঘল রাজধানী ঢাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া রাজকীয় মুরাক্কার সন্ধানে শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি উল্লিখিত মুরাক্কা ও তার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি মুঘল মিনিয়েচর নিয়ে আলোকপাত করেছেন।[১] তিনি লিখেছেন:

> "১৯০৯ সালে সয়্যদ আহমেদ প্রণীত *Echos From Old Dhaka* শীর্ষক গ্রন্থে ঢাকার নতুন নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ এর সংগ্রহে থাকা একটি মুঘল মুরাক্কার কিছু নান্দনিক ও চিত্তাকর্ষক চিত্র প্রকাশ করেছেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থটির লেখক সয়্যদ আহমেদ ছিলেন অবিভক্ত ভারতের জনৈক প্রথিতযশা অভিজাত ব্যক্তি। যিনি একদিকে ছিলেন প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী নেতা, যাঁর দেশপ্রেম ছিলো অতুলনীয়। তিনি ছিলেন ঢাকার নবাব আবদুল লতিফের জামাতা এবং ঢাকার রইস মীর আশরাফ আলীর নিকটাত্মীয়। পণ্ডিত জওহরলাল

[১] নাজমা খান মজলিশ, "মুঘল রাজধানী ঢাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া রাজকীয় একটি মুরাক্কার সন্ধানে", *সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা*- ২০১৬, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬, পৃ. ৪০

নেহেরু সয়্যুদ আহমেদকে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত ইন্ডিপেন্ডেট পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেন।"

সয়্যুদ আহমেদ তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন অতিবাহিত করেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ভারতে ও বহির্বিশ্বে ভারতের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ইতিহাস ও ঐহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৯ সালে তিনি মিশরে ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদ অলঙ্কৃত করেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থটিতে মুঘল মুরাক্কার সংগৃহীত কয়েকটি চিত্র চয়ন করে আলোচনার কারণ এই যে, মুরাক্কার এই চিত্রগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।[১]

মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, তুরস্ক ও ভারতবর্ষের রাজদরবারের চিত্র কারখানায় মুরাক্কা তৈরি করা হতো। ভারতবর্ষে ইসলামী চিত্রকলার গৌরবময় ধারাবাহিকতার অনুসরণে মুরাক্কা চিত্রণের একটি উন্নততর পরম্পরা ও ঐহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল। তৃতীয় মুঘল বাদশাহ আকবরের শাসনামল থেকে শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত এই ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।[২]

প্রধানত মুঘল বাদশাহগণের চিত্তাকর্ষক প্রতিকৃতি রাজমহিষী, শাহজাদা, শাহজাদি, নর্তকী, সংগীতজ্ঞ, সভাসদ, সাধু-সন্ন্যাসী ও সূফি-দরবেশদের প্রতিকৃতির সঙ্গে লিপিকলা ও আরব্য নকশা সংযোজন করে অত্যন্ত নান্দনিকরূপে মুঘল মুরাক্কা তৈরি করা হতো। মুঘল রাজধানী ঢাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মুরাক্কাটি উল্লিখিত মুরাক্কা চিত্রণের ঐতিহ্যিক ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যবহ। সে অর্থে এর গুরুত্ব অসামান্য। লেখক সয়্যুদ আহমেদের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত মুরাক্কায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মুঘল চিত্রকর্মের বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] যথা-

(ক) বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতি

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

(খ) বাদশাহ ফররুখ সিয়র (অশ্বারোহী)

মাধ্যম: কাগজে জলং (Gouache)

(গ) ফররুখ সিয়রের রাজমহিষীর প্রতিকৃতি

মাধ্যম: কাগজে জলরং (Gouache)

অধ্যাপক নাজমা খান মজলিশের প্রবন্ধে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, ঢাকার বিলুপ্ত হওয়া ওই মুরাক্কায় পরবর্তীকালে ঢাকার নতুন নবাবগণ তাঁদের প্রতিকৃতি চিত্র সংযোজন করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো

[১] নাজমা খান মজলিশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

ছিলো বস্তুত পাশ্চাত্য ঘরানার তৈলচিত্র ও আলোকচিত্র। সেসব প্রতিকৃতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নওয়াব আবদুল লতিফ, নওয়াব আবদুল গণি এবং নওয়াব সয়্যুদ মোহাম্মদ।

এই অমূল্য মুরাক্কাটি বর্তমানে ঢাকায় কোনো প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত নেই। নতুন নবাবদের আমলে তা কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বর্তমানে আদৌ সুরক্ষিত আছে কিনা, তা অত্যন্ত রহস্যাবৃত। এর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।[১]

৩.৫ মাদ্রাসা-ই-আলিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত শাহনামা

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া পরিচিতিঃ

ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার দাপ্তরিক নাম মাদ্রাসা-ই-আলিয়া। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে বাংলার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্বে প্রশাসন পরিচালিত হতো প্রচলিত ফারসি ভাষায় রচিত আইন অনুসারে। ফলত প্রশাসনের জন্য, বিশেষত বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজন ছিল আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা। এছাড়া মুসলিম আইনের ব্যাখ্যা ও মামলায় রায় দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক মৌলবি ও মুফতির। একই সঙ্গে মৌলবি ও মুফতিদের ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান থাকারও প্রয়োজন ছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মুসলমানদের জন্য একটি মাদ্রাসা ও হিন্দুদের জন্য একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন মাওলানা মাজদুদ্দীন।

১৭৮১ থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত আলিয়া মাদ্রাসা 'বোর্ড অব গভর্নরস' দ্বারা এবং ১৮১৯ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সেক্রেটারি ও মুসলমান সহকারি সেক্রেটারির অধীনে 'বোর্ড অব গভর্নরস' দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৮৫০ সালে আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হলে ড. এ. স্প্রেংগার মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সাল থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত ইংরেজ কর্মকর্তাগণ এ পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৭ সালে শামসুল উলামা খাজা কামালউদ্দীন আহমদ সর্বপ্রথম এ মাদ্রাসায় মুসলমান অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন।[২]

কলকাতা মাদ্রাসা শুরু থেকেই লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গি মহলের প্রখ্যাত আরবি স্কুল দারসে নিয়ামিয়ার মডেল অনুসরণ করে পাঠদানের কোর্স প্রণয়ন করে। ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসার পাঠক্রমে ফারসি ভাষা মুখ্য স্থান দখল করে। তখনকার দিনে মূর্তি পূজার ভাষা হিসাবে ঘৃণিত বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। ত্রৈরাশির দ্বৈত নিয়ম অর্থাৎ অনুপাত ও সমানুপাত পর্যন্ত গণিত শিখানো হতো।

---

[১] নাজমা খান মজলিশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

[২] http://bn.banglapedia.org/index.php?little=আলিয়ামাদ্রাসা&oldid=8454, Dhaka: 3 November 2016

ইউক্লিডের শুধু একটি পাঠ পড়ানো হতো। মাদ্রাসার সিলেবাসে ইতিহাস, ভূগোল, এমনিক তাফসির ও হাদিসেরও কোনো স্থান ছিল না। অ্যারিস্টটলের পুরাতন দার্শনিক মতের অনুরূপ চিন্তাধারার আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের কোর্সসমূহ যেমন-তেমনভাবে পড়ানো হতো।[১]

আলোকচিত্র ৩.৫: মাদ্রাসা-ই-আলিয়া

আলিয়া মাদ্রাসায় ১৮২৯ সালে ইংরেজি বিভাগ খোলা হয়। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৪ বছর এ বিভাগে ১৭৮৭ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করেন। এঁদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। ১৮৬৩ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় এফ. এ. পর্যায়ের ক্লাস সংযোজিত হয়। ১৮৫৪ সালে মাদ্রাসায় একটি পৃথক ইনস্টিউট হিসাবে ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ভর্তির সময় শরাফতনামা (উচ্চবংশে জন্মের সনদপত্র)-র উপর জোর দেওয়া হতো। ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইঙ্গ-ফারসি বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের এন্ট্রাস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলা। ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৮২১ সালে মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাদ্রাসায় প্রথাগত পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৮৫৪ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত 'ডেস্পাচ'-এ কলকাতা মাদ্রাসাকে প্রস্তাবিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসার ইঙ্গিত থাকলেও মাদ্রাসাটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়নি। ১৯০৭ সালে মাদ্রাসায় তিন বছর মেয়াদি কামিল কোর্স চালু হয়।

১৯৪৭ সালে আলিয়া মাদ্রাসা কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন খান বাহাদুর মাওলানা জিয়াউল হক। ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট

[১] বি. আর. খান. "কলকাতা মাদ্রাসা", *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ খণ্ড ২ (প্রধান সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ২০০

কলেজ (বর্তমানে নজরুল কলেজ)-এ মাদ্রাসার কার্যক্রম চলতে থাকে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ১৯৫৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকার বখশীবাজারে মাদ্রাসার চারতলাবিশিষ্ট নতুন ভবন ও ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৬১ সালে মাদ্রাসা লক্ষ্মীবাজার থেকে বখশীবাজারে স্থানান্তরিত হয়। মাদ্রাসাটির রয়েছে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, কম্পিউটার ল্যাব, খেলার মাঠ এবং ছাত্রাবাস। ২০০৬ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়।[১]

আলিয়া মাদ্রাসা গ্রন্থাগারের সংরক্ষিত রয়েছে *শাহনামা*র মূল খণ্ড এবং মিনিয়েচর চিত্রমালায় বর্ণিত *শাহনামা*। মূল ভবনের দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ পাশে রয়েছে মাদ্রাসার নিজস্ব গ্রন্থাগার। এখানে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, গবেষণাধর্মীসহ ২১ হাজারের বেশি বই সংগৃহীত আছে। বেশিরভাগই অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বই। এসব দুষ্প্রাপ্য বইয়ের একটি পারস্যের কিংবদন্তি কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসির *শাহনামা*। মাদ্রাসা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কপিটি ইরানে বিশেষভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, *শাহনামা*র শুদ্ধ ও প্রসিদ্ধতম পাণ্ডুলিপি অনুসারে এটি প্রকাশ করা হয়। সারাবিশ্বে এই সংস্করণের কেবল দুটি এখনো অক্ষত অবস্থায় আছে। যার একটি রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং অপরটি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর কলকাতা মাদ্রাসার আনুমানিক ১৭ হাজার বইয়ের সঙ্গে *শাহনামা*র এই কপিটিও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় আনা হয়। এটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এর একটি ভাগে মূল কাহিনি এবং বাকি চারভাগে পারসিক চিত্রকলা ও মুঘল চিত্রকলার অনুরূপ চিত্রকর্ম ও বিবরণ রয়েছে। উল্লেখ্য *শাহনামা*র মূল পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে 'চাপে তাপান'।

*শাহনামা*র এই অসামান্য সংস্করণটি সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি বিভাগের অধ্যাপক কুলসুম এ বাশার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। ইরানের আমির-এ-কায়সার প্রকাশনী থেকে ১৩৪১ হিজরির বসন্তে এটি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ করেছেন মোহাম্মদ বাহারমি। ফেরদৌসির রচিত মূল পাণ্ডুলিপি অনুসরণে এটি সংকলন করেছেন বেকে আহসারি। উল্লেখ্য, কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসীর *শাহনামা* মহাকাব্য প্রকাশিত হওয়ার এক হাজার বছর পূর্তি হয়েছে ২০১০ সালে।[২]

---

[১] আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, http://bn.banglapedia.org/index.php?little=আলিয়ামাদ্রাসা&oldid=8454, Dhaka: 3 November 2016

[২] আদিত্য মাহমুদ, "আলিয়া মাদ্রাসায় শাহনামা", *প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০১১, ঢাকা: ২০১১

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

৪.১ লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলার বিষয়বস্তু

সিংহাসনে বসা সম্রাট আওরঙ্গজেবঃ

মুঘল সাম্রাজ্যের ষষ্ঠ বাদশাহ মুহি-উদ-দ্বীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) উল্লিখিত প্রতিকৃতি চিত্রটি অত্যন্ত নান্দনিক এবং ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মুঘল চিত্রকর্মটি আওরঙ্গজেবের দরবারি চিত্র কারখানায় অঙ্কিত যে কোনো রাজসিক প্রতিকৃতি চিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। চিত্রে আওরঙ্গজেবের মস্তক ঘিরে রয়েছে একটি বৃত্তাকার আলোকের বলয় বা জ্যোতিশ্চক্র (halo)। এই আলোক বলয় বাদশাহের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, রাজকীয় মর্যাদা ও বীরোচিত শক্তিমত্তার প্রতীক হিসাবে অঙ্কিত হয়েছে। ছবিতে বাদশাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। সিংহাসনের উপরে লাল রঙের শামিয়ানা বা ছত্রী স্থাপন করা হয়েছে। এতে সোনালী সীমারেখার সঙ্গে ফুল ও লতা-পাতার নকশা চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। মেঝেতে লালচে বেগুনী রঙের গালিচায় পুষ্পশোভিত নকশার বুনন আকর্ষণীয়।

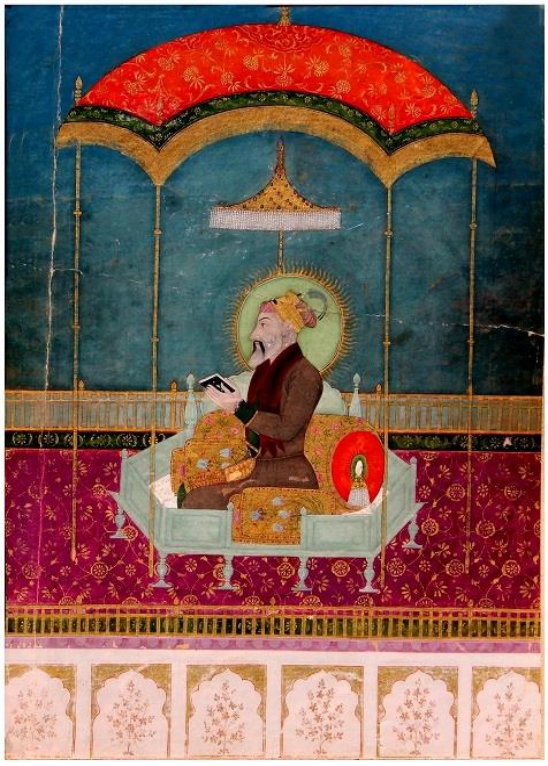

আলোকচিত্র ৪.১: সিংহাসনে বসা সম্রাট আওরঙ্গজেব

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আলোচ্য পার্শ্বপ্রতিকৃতি চিত্রে (profile) শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়ব অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে। মুঘল দরবারি চিত্রকলার প্রকৃত করণকৌশল ও শৈলী এতে সুচারুরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। চিত্রকর এই ছবির সূক্ষ্ম ও অনুপুঙ্খ অংশে লিপিশিল্পের কায়দায় 'একবাল কলম' ব্যবহার করেছেন। মুঘল পুরুষ প্রতিকৃতি চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে ছবির মূল নায়ক বা কুশীলবের হাতে সাধারণত ফুল, বই, সুরাপাত্র এবং তরবারি-এর যেকোনো একটি অনষঙ্গ হাতে ধরা থাকে।

আলোচ্য চিত্রকর্মে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাতে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পবিত্র কুরআন লক্ষণীয়। ষড়ভুজাকৃতির সিংহাসনে বিছানো আছে পারসিক ও ভারতীয় নকশা শোভিত আরামদায়ক তাকিয়া। চিত্রকর্মে বাদশাহের প্রতিকৃতি ও অভিব্যক্তি প্রায় বাস্তবানুগ কিন্তু অন্যান্য অনুষঙ্গ কিছুটা কল্পনার মিশেলের অঙ্কিত হয়েছে। যেমন বিলাসবহুল তাকিয়া, সিংহাসন ও গালিচা যতোটা মূল্যবান মনে হয় বাদশাহের পোশাক-পরিচ্ছদ সে তুলনায় অত্যন্ত সাধারণ।

প্রকৃতঅর্থেই বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পোশাক-পরিচ্ছদ ও যাপিত জীবন তাঁর পূর্ববর্তী তিন বাদশাহ- আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের তুলনায় অত্যন্ত সাদামাটা ও জৌলুসহীন ছিলো। আওরঙ্গজেবের গভীর ধর্মানুরাগ, চর্চা ও সাধনা এবং বিলাসবহুল জীবনের প্রতি নির্মোহ মনোভাব পূর্ববর্তী বাদশাহগণের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। ইতিহাসও এর সাক্ষ্য দেয়।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন যে, আওরঙ্গজেব স্বহস্তে একটি উইল (will- অমোঘ ইচ্ছার প্রকাশ) লিখে রেখে গেছেন। *আহকাম-ই-আলমগিরি*তে পাওয়া সে উইলের অংশবিশেষ থেকে জানা যায়- তিনি টুপি সেলাই করতেন। টুপি সেলাইয়ের মাধ্যমে উপার্জিত চার টাকা দুই আনা তিনি মহলদার আইয়া বেগের নিকট গচ্ছিত রেখেছিলেন। ওই টাকা দিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর যেন দাফনের জন্য কাফনের কাপড় ক্রয় করা হয়, এমন নির্দেশনাও তিনি লিখে গেছেন। আওরঙ্গজেব স্বহস্তে পবিত্র কুরআনের প্রতিলিপি লিখতেন। কুরআনের প্রতিলিপি লিখনের মাধ্যমে উপার্জিত তিনশত পাঁচ টাকা রাখা ছিল আওরঙ্গজেবের থলিতে। নির্দেশনা ছিল, ওই অর্থ যেন তাঁর মৃত্যুর পর ফকিরদের মাঝে সুবন্টিত হয়। তিনি আরো লিখেছেন, তাঁর কবর যেন অত্যন্ত সাধারণ থাকে। কবরের উপর কোনো ছাউনী বা ছত্রী না রাখারও নির্দেশনা ছিল।[২] আওরঙ্গজেবের এই মরমি বাসনার মধ্য দিয়ে তাঁর মহান অনুভবের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

---

[১] Najma Khan Majlis, "Miniatures in the Lalbagh Fort Museum, Dhaka: An Attempt at Indetification and Fixation of Date" (ed. Nazmul Ahsan Chowdhury) in the *Proceedings of Fourth South Asia Archaeology*, Dhaka: Directorate of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, People's Republic of Bangladesh, 1991, Pp. 116-117.

[২] Bamber Gascoigne, *A Brief History of the Great Moghuls*. London: Constable & Robinson Ltd., 2002, p. 240.

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্র রাজদরবারে চিত্রকারখানায় অঙ্কিত হয়েছে। গোয়াশ বা ঘন জলরং মাধ্যমে অঙ্কিত এই চিত্রকর্মে তরল সোনার রং লক্ষ করা যায়। মুঘল চিত্রকলায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পুরো ছবিতে প্রয়োজন অনুযায়ী রয়েছে অনুপুঙ্খ কাজ (detail)। সবুজাভ নীল রঙে চিত্রিত পটভূমি ছবিতে চমৎকার আবহ তৈরি করেছে।

আসফ জাহ বাহাদুরের প্রতিকৃতিঃ

আসফ জাহ বাহাদুর ছিলেন মুঘল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রধান উজির। লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রসমূহে এটি পরিমাপ অনুযায়ী সর্ববৃহৎ। চিত্রকর্মে লক্ষ করা যায়, আসফ জাহ ডান হাতে ফুল এবং বাম হাতে তরবারি ধরে দৃঢ় প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর মস্তক ঘিরে আছে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আলোকের বলয় (halo)। বস্তুত এটি প্রতীকী, যা ক্ষমতা, মর্যাদা ও শক্তিমত্তা প্রকাশ করেছে। চিত্রকর্মে আসফ জাহ বাহাদুরের পার্শ্বপ্রতিকৃতি (profile) এবং তিন-চতুর্থাংশ দেহাবয়ব অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর পরিধানে রয়েছে বুটিদার নকশাযুক্ত সফেদ-মসলিন জামা। এই প্রতিকৃতির পটভূমির বিন্যাস এবং প্রকাশভঙ্গিতে বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের দরবারি মুঘল চিত্ররীতির সঙ্গে তেমন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। ছবির একমাত্র এবং মূল কুশীলব আসফ জাহ বাগানের মাঝখানে চমৎকার ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছেন। তাঁর আশেপাশে জালিকা নকশাযুক্ত ও স্বল্প উচ্চতাসম্পন্ন প্রাচীরের দেখা মেলে। সম্মুখভাবে লাল বেলেপাথরের নকশা খচিত প্রাচীর ছবিতে পরিসর বিভাজন ও রঙ বিন্যাসে চমৎকার ভূমিকা রেখেছে। বাগিচায় নির্মিত তিনটি কৃত্রিম ঝর্ণা আলঙ্কারিক অনুষঙ্গ হিসাবে চিত্রের সামগ্রিক বিন্যাসে প্রাণের সঞ্চার করেছে। ঝর্ণাত্রয়ের দু'পাশে বেড়ে ওঠা গোলাপ গাছ ও বাহারি রঙের ফুলগাছের ঝোপ চিত্রের নান্দনিকতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। পটভূমিতে সবুজাভ নীল রঙের পরত ও প্রাচীরের ওপাশের ফুলগাছ অত্যন্ত দৃষ্টিসুখকর।

আসফ জাহের শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়ব ও মুঘল পাগড়ির সৌন্দর্য ছবির মূল ফোকাসে রয়েছে। এতে অনুপুঙ্খ অঙ্কন ও রং প্রয়োগে শিল্পীর মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান করা হয়, আসফ জাহ বাহাদুরের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্র তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁরই চিত্রকারখানায় অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিকদের মতে আসফ জাহের কোনো নিজস্ব চিত্রকারখানা ছিল না। সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য চিত্রকর্ম বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারি চিত্রকারখানায় অঙ্কিত হয়েছে বলে অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করা হয়। উল্লেখ্য বাদশাহ আকবরের মুঘল চিত্রকলার ঐতিহ্য অনুসরণ করেই বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁর শাসনামলে মুঘল চিত্রকলার সর্বোচ্চ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।[১]

[১] Najma Khan Majlis, *op.cit.*, p. 117.

আলোকচিত্র ৪.২: আসফ জাহ বাহাদুরের প্রতিকৃতি

শাহজাদা আজম শাহের প্রতিকৃতিঃ

(সংগৃহীত নম্বরঃ N.M.P 1958 561)

শাহজাদা আজম শাহের প্রতিকৃতি চিত্রটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। তিনি ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র। আজম শাহ বাদশাহ কর্তৃক ১৬৭৮ সালে বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এক বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়কালের জন্য (১৬৭৮-১৬৭৯ খ্রি.) তিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন। উল্লেখ্য আজম শাহ তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদার আজম খান কোকার মৃত্যুর পর সুবাদার পদে নিযুক্তি পেয়েছিলেন এবং সে মোতাবেক তিনি ১৬৭৮ সালের ২০ জুলাই ঢাকায় আগমন করেন।[১]

[১] আবদুল করিম, 'মুহম্মদ আজম (যুবরাজ)', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ- খণ্ড ৬, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৪ (প্রথম পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ২৮৩

আজম শাহের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রে তিন মুঘল বাদশাহ- আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের চিত্ররীতির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি লক্ষ করা যায়। চিত্রে শাহজাদা আজম ডান হাতে ফুল ও বাম হাতে তরবারি ধারণ করে আছেন। শাহজাদার পোশাকে রাজসিক মুঘল ঐতিহ্যের হলুদাভ বাদামী রঙের জমিনের ওপর বুটিদার নকশার চমৎকার বিন্যাস আছে। চিত্রকর্মে পার্শ্বপ্রতিকৃতি এবং তিন-চতুর্থাংশে দেহাবয়ব যথাযথ বিন্যাসের মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছে। শ্মশ্রুমণ্ডিত শাহজাদা আজমের মুখাবয়ব এবং দৃঢ় প্রত্যয়ে দণ্ডায়মান তাঁর দেহের অঙ্গভঙ্গিতে শাহি আদব-কায়দা ও মুঘল ঐতিহ্য সমুজ্জল রয়েছে। আওরঙ্গজেবের চিত্রকারখানায় কিছু উন্নততর প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উক্ত প্রতিকৃতি চিত্র তার সাক্ষ্য বহন করে।[১]

আলোকচিত্র ৪.৩: শাহজাদা আজম শাহের প্রতিকৃতি

শাহজাদা আজম শাহের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রে অত্যন্ত সুচারুরূপে প্রতিভাত হয়েছে মর্যাদাবোধ, উন্নত ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা এবং রাজকীয় সৌন্দর্য। সরু হাশিয়াতে ফুল-লতা-পাতার নকশা আকর্ষণীয়। আজম শাহের প্রতিকৃতি চিত্র আলোচ্য বিষয় হলেও প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর সুবাদার জীবনের কিছু কথা উল্লেখযোগ্য।

[১] Najma Khan Majlis, *op. cit.,* p. 116.

শাহজাদা আজমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব ছিল কামরূপ পুনরাধিকার। ইসলাম খান চিশতী কামরূপ অধিকার করেছিলেন, তবে মীর জুমলার মৃত্যুর পর তা হাতছাড়া হয়ে যায়। অহোম রাজ উদয়াদিত্যের মৃত্যুর পর (১৬৭৩ খ্রি.) অহোম রাজ্যে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। রাজা নির্বাচনকারীর ভূমিকা পালনকারী, উচ্চাভিলাষী ও বিবেকহীন মন্ত্রীগণ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে একদল প্রাধান্য লাভ করে এবং অপর দল হতাশ হয়ে বাংলার মুঘল সুবাদারের সাহায্য প্রার্থনা করে।

শাহজাদা মুহম্মদ আজম শাহ অনতিবিলম্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং হস্তচ্যুত হওয়ার বারো বছর পর ১৬৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুঘলগণ পুনরায় কামরূপ জয় করে।

শাহজাদা আজম তৎকালীন লালবাগে একটি দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন। যা তখন আওরঙ্গাবাদ দুর্গ নামে এবং বর্তমানে লালবাগ দুর্গ জাদুঘর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই শাহজাদাকে বদলি করা হয়। দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখে অনুমান করা যায় যে, শুধুমাত্র শাহজাদার বাসস্থান হিসাবেই নয়, একটি দুর্গ হিসাবেও এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদটিও শাহজাদা আজম নির্মাণ করেছিলেন।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পুত্র হওয়ায় কোনো সামন্ত প্রধান বা জমিদার তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে মাথা তোলার বা কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করার সাহস পায়নি। কোনো সরকারি সংবাদদাতার মধ্যে তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে কিছু লেখার মতো অবিমৃষ্যকারিতা ছিল না। রাজস্ব আদায়ের জন্য শাহজাদা আজম জনৈক মীর মাওলাকে তাঁর দিওয়ান এবং মুলুক চাঁদকে হুজুর-নবিশরূপে নিয়োগ করেন। তাঁদের ওপর প্রশাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনে তিনি কিছুটা উন্নাসিক ছিলেন। শিকার করে সে সময় তিনি দিনযাপন করতেন। এমতাবস্থায় বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। শাহজাদা আজম ১৬৭৯ সালের ৬ অক্টোবর ঢাকা ত্যাগ করেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহজাদা আজম মুঘল সিংহাসন দখলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরাধিকার যুদ্ধে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা মুয়াজ্জমের নিকট পরাজিত হন।[১] শাহজাদা আজমের ঢাকার সুবাদারকাল স্বল্পস্থায়ী হলেও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত শাহজাদার প্রতিকৃতি চিত্রটি ঢাকার ইতিহাসের অমূল্য স্মারক স্বরূপ।

[১] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-২৮৪

দুরদানার প্রতিকৃতিঃ

(সংগৃহীত নম্বরঃ N.M.P 1957 1017/7)

লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের মধ্যে 'দুরদানার প্রতিকৃতি' শীর্ষক চিত্রটির বিশেষ সৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। একটি কোমল অনুভবে আচ্ছাদিত এই ছবি। মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রে প্রধানত বাদশাহগণের ব্যক্তিত্ব, রুচিবোধ ও চিন্তাশীল মনের অভিব্যক্তি রূপায়িত হয়েছে। একই কথা নারী প্রতিকৃতি চিত্রসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একথা সত্য যে, প্রতিকৃতি চিত্রের সুবাদে কিছু ঐতিহাসিক নারী চরিত্র যেমন- সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, মমতাজমহল, বিভিন্ন মুঘল শাহজাদী, নর্তকী ও অন্তঃপুরবাসিনীদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়।[১]

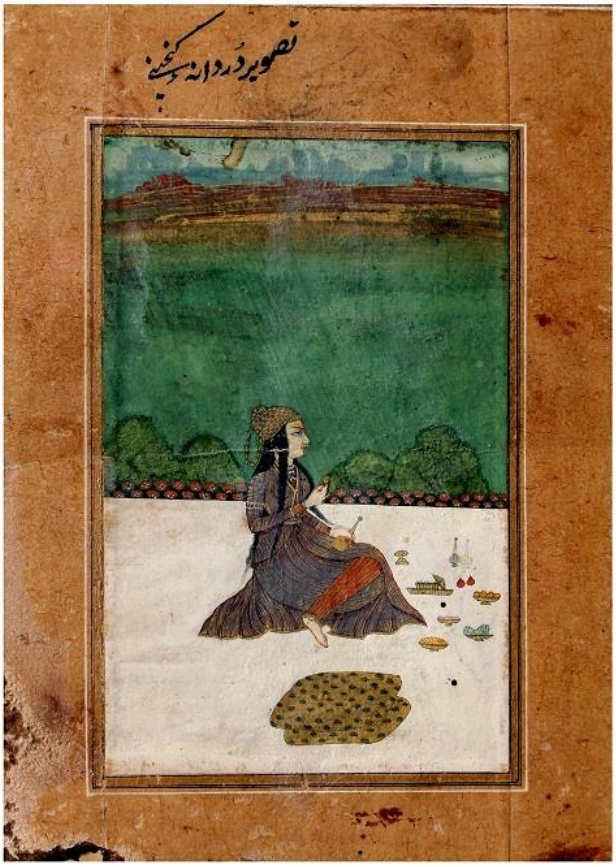

আলোকচিত্র ৪.৪: দূরদানার প্রতিকৃতি

'দুরদানার প্রতিকৃতি' শীর্ষক চিত্রটির প্রধান ও একমাত্র কুশীলব হচ্ছেন দুরদানা। 'দুরদানা' একটি ফারসি শব্দ। এর বাংলা অর্থ 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নারী'। ছবিতে দুরদানা উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি কোনো শাহজাদী বা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সদস্য ছিলেন। চিত্রে তাঁর পূর্ণ দেহাবয়বসহ পার্শ্ব-প্রতিকৃতি (profile) অঙ্কিত হয়েছে।

[১] Najma Khan Majlis, *ibid,* p. 116

প্রতিকৃতিতে ভারতীয় শৈলীর অনুসরণে পদ্মপাপড়ির ন্যায় চোখের অঙ্কন লক্ষ করা যায়। দুরদানা ডান হাতে একটি ফুল ও বাম হাতে একটি পাত্র ধারণ করে আছেন। পাত্রটি একটি শিশি বা ক্ষুদ্র বোতল, যাতে আতর বা সুগন্ধি আছে বলে ধারণা করা যায়।

দুরদানার পাশে মেঝেতে রাখা আছে দুটি তাকিয়া। হালকা হলুদ বর্ণের তাকিয়ায় স্নিগ্ধ বাদামী রঙের পাতার নকশা (motif) সহজেই দৃষ্টি কাড়ে। দুরদানার বেণী করা দীর্ঘ কেশবিন্যাস নিতম্বের কাছাকাছি নেমে গেছে। তাঁর পরিধানে রয়েছে হালকা বেগুনী রঙের মসলিন ঘাগরা। মাথায় আছে নকশাদার টুপি। এই টুপি অনেকাংশে পারসিক রীতি অনুসরণে তৈরি করা হয়েছে। দুরদানার সম্মুখে মেঝেতে কয়েকটি পাত্রে রাখা আছে বিভিন্ন উপাদেয় ফল ও খাবার। মেঝের রং প্রায় সাদা, যা মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছে বলে নির্দেশ করে। পটভূমির সবুজ রং নিসর্গের দারুণ আবহ সৃষ্টি করেছে। ছবির পরিসর বিভাজন, অঙ্কনশৈলী ও রঙের ব্যবহারে শিল্পীর মুনশিয়ানার সাক্ষাৎ মেলে। চিত্রের প্রায় মধ্যভাগে অঙ্কিত মেঝের সীমান্তে জালিকা সম্বলিত মার্বেল পাথরের প্রাচীর নকশার সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের মুঘল চিত্রকলায় চিত্রের পটভূমি সাধারণত সমতল রাখা হতো। পরবর্তীকালে বাদশাহ শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনামলে চিত্রের পটভূমি সাধারণত কালচে সবুজ লক্ষ করা যায়। মুর্শিদাবাদ শৈলীতে প্রায়শ দিগন্তের সমান্তরাল গোলাকার জালিকা সম্বলিত প্রাচীর অঙ্কিত হতো। আলোচ্য চিত্রকর্মে আকাশ চিত্রণে অনেকাংশে ইউরোপীয় বাস্তববাদী শৈলীর খোঁজ মেলে। চিত্রের সকল বৈশিষ্ট্য ও শৈলী পর্যবেক্ষণ করে মনে হতে পারে যে, এটি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলের পূর্বে অঙ্কিত হয়নি। অন্যদিকে চিত্রের সামগ্রিক বিন্যাস বিষয়বস্তু, উপবিষ্ট দুরদানার মোহনীয় ভঙ্গি, রঙের ব্যবহার প্রভৃতি দিক বিবেচনা সাপেক্ষে ধারণা করা যায় যে, এ চিত্র বাদশাহ শাহজাহানের আমলের শেষ ভাগে অঙ্কিত হয়েছে।[১]

দুরদানার সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। দুরদানার পুরো নাম দুরদানা বেগম। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের নওয়াব শুজা-উদ-দ্বীনের কন্যা।

শুজা-উদ-দ্বীনের সময় থেকে মুর্শিদকুলী খান ২য় (রুস্তম জঙ্গ বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত) উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুর্শিদকুলী খান ২য় ছিলেন দুরদানা বেগমের স্বামী।[২] সে সময়ের প্রভাবশালী নারীদের মধ্যে দুরদানা ছিলেন অন্যতম। উড়িষ্যার জনগণ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। দুরদানা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন। আলিবর্দীর নিকট দুরদানার ভ্রাতা সরফরাজের পতন ঘটলে, তিনি তাঁর স্বামী দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন।[৩]

---

[১] Najma Khan Majlis, *Ibid,* Pp. 115-116.

[২] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ২১৩

[৩] কে এম করিম, 'নবাবি আমলে সমাজকাঠামো', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (সম্পা. সিরাজুল ইসলাম), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, পৃ. ৩৪.

এই প্রেক্ষিতে আলিবর্দী খান তাঁর বিরুদ্ধে গমন করেন। মুর্শিদকুলী খান ২য় পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিজাম-উল-মুলকের আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১] দুরদানা বেগম সেখানে 'বাঙালি বেগম' নামে পরিচিত ছিলেন।[২]

সিংহাসনে বসা জনৈক রাজার প্রতিকৃতিঃ

(সংগৃহীত নম্বরঃ N.M.P 1957 1017/4)

এই প্রতিকৃতি চিত্রে একজন রাজা বা বাদশাহকে মসনদে উপবিষ্ট অবস্থায় অঙ্কন করা হয়েছে। ফারসিতে বলা হয় 'Tasnirudar rajah'। এর অর্থ একজন রাজার প্রতিকৃতি। বিষয়ের নাম চিত্রকর্মে হয়তো পরে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। কারণ এতে শিল্পীর স্বাক্ষর ও তারিখ নেই। চিত্রকর্মে রাজা কলম হাতে নিয়ে মসনদে উপবিষ্ট রয়েছেন। মসনদের গদি আরামদায়ক লাল মখমল কাপড় দিয়ে আঁটা হয়েছে। মসনদের উপরে চারটি সরু খুঁটির মাধ্যমে শামিয়ানা প্রস্তুত করা আছে। শামিয়ানাও মসনদের ন্যায় লাল রঙের মখমল কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দুটিতেই রয়েছে কালো কাপড় দিয়ে সেলাইযুক্ত সীমানা। সীমানায় ফুলের নকশা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

রাজার পরিধানে রয়েছে হলুদাভ সোনালী রঙের শাহি পোশাক-পরিচ্ছদ। এতে বুটিদার ফুলের নকশা দারুণ উদ্ভাসিত হয়েছে। কটিদেশ বাঁধা আছে লাল-হলুদের ডোরাকাটা কটিবন্ধ দিয়ে। রাজা হেলান দেয়ার জন্য একটি বড় তাকিয়া ও দু'পাশে দু'টি ক্ষুদ্র তাকিয়া বা বালিশ মসনদে রাখা আছে।

মসনদের উপর খাপবন্ধ তরবারি রাজার হাতের নাগালেই রয়েছে। এটি সামাজিক পদমর্যাদার নির্দেশনা দেয়। ছবিতে রাজাকে একান্ত বিশ্রামরত বা অবকাশ যাপনের অবস্থায় চিত্রিত করা হয়েছে। রাজা এখানে সদ্য যুবক হিসাবে দৃশ্যমান। ধারণা করা যেতে পারে যে, এটি মুঘল বাদশাহ আকবর অথবা মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুবক বয়সের প্রতিকৃতি চিত্র। এই ধারণাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।[৩]

---

[১] আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

[২] কে এম করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৩] Najma Khan Majlis, *ibid,* p. 116

আলোকচিত্র ৪.৫: সিংহাসনে বসা জনৈক রাজার প্রতিকৃতি

আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রটি বিশেষ মূল্যবান। কারণ এর অঙ্কনশৈলী, বিষয়বস্তু ও রঙের ব্যবহারের মুর্শিদাবাদ শৈলীর গুণাগুণ খুঁজে পাওয়া যায়। এ নিয়ে চিন্তার সুযোগ আছে। চিত্রকর্মে রাজার পার্শ্ব-প্রতিকৃতি (profile) এবং তিন-চতুর্থাংশ দেহাবয়ব অঙ্কিত হয়েছে। শাহি পাগড়িসমেত মুখাবয়বয়ের অভিব্যক্তি চিত্তাকর্ষক।

মধুমতি অঙ্কিত একটি চিত্রঃ

উল্লিখিত চিত্রকর্মে বস্তুত দু'জন রমণীর একটি বিশেষ মুহূর্তকে ধরা হয়েছে। ছবির মূল কুশীলব এই দুই রমণী। তাদের দেহাবয়ব ও অঙ্গভঙ্গি ছবিতে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ভাববিলাসী ও কল্পনাসমৃদ্ধ চিত্রকর্ম। মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত একটি দ্বিতল সাদা ইমারতের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন নারী। অপর নারী কুশীলব ইমারতের উঠোন থেকে সদর দরজার সিঁড়িতে একটি পা স্থাপন করে দরজার অভ্যন্তরে দাঁড়ানো নারীকে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দেখাচ্ছিলেন। ইমারতের প্রাচীর ঘেঁষে রয়েছে একটি বয়সী বৃক্ষ। বৃক্ষের ডানে দুই জোড়া সারস পাখির উপস্থিতি চিত্রে ভিন্ন একটি মাত্রা যোগ করেছে। দরজার বহিরাঙ্গনে দাঁড়ানো রমণীর পোশাক-পরিচ্ছদ কুঁচিযুক্ত-স্ফীত ঘাগরা, পূর্ণ আস্তিনের ব্লাউজ এবং চুড়িদার পায়জামা লক্ষণীয়। কটিদেশে

বিছার ন্যায় একটি অলঙ্কার শোভা পেয়েছে। দরজার অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে থাকা রমণীর পরিধানেও ঘাগরা রয়েছে। তবে তার ব্লাউজের আস্তিন হাতের কনুই অবধি ঢঙে নির্মিত হয়েছে। সাধারণত রাজপুত চিত্রশৈলীতে এরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ দেখা যায়। সতের শতকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্রকর্মে এই ধরনের সুশ্রী রাজপুত নারীর দেহাবয়ব বিশেষ লক্ষ করা যায়। বিষয়বস্তু ও চিত্রশৈলীর আলোকে উক্ত চিত্রকর্মটি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলের শেষভাগে অঙ্কিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। চিত্রকর্মে দুই রমণীর অঙ্গভঙ্গি ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের বিশেষ রাগ 'মধুমাধবী রাগিনী'র সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই রাগিনীর মধ্য দিয়ে প্রেমিকের জন্য প্রেমিকার উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে।[১]

আলোকচিত্র ৪.৬: মধুমতি অঙ্কিত একটি চিত্র

লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত এটিই একমাত্র মুঘল চিত্রকর্ম, যেখানে ছবির নিম্নাংশে শিল্পীর স্বাক্ষর লক্ষ করা যায়। তিনি রাজ-দরবারের শিল্পী ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।[২]

বন্যজন্তু

(সংগৃহীত নম্বর: N.M.P. 1962 233/4)

---

[১] *ibid*, p. 118

[২] Najma Khan Majlis, *ibid*, p. 118

এই চিত্রকর্ম পর্যবেক্ষণ কালে *কালিলা ওয়া-দিমনা*[১] (*Kalila wa-Dimna*) শীর্ষক গ্রন্থের কথা প্রথমে স্মরণে আসে। অবশ্য তা অত্যন্ত আলঙ্কারিক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আলোচ্য ছবিতে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, বন্যশূকর, হরিণ, শৃগালসহ বিবিধ ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণির চমৎকার বিন্যাস ঘটেছে। ফুল-লতাপাতার নকশাধর্মী পুনরাবৃত্তি রয়েছে পুরো চিত্রজুড়ে। যার জঙ্গলের ইমেজ তৈরি করেছে।

ধারণা করা যেতে পারে যে, বন্যপ্রাণিদের বিন্যাসমূলক উক্ত চিত্রকর্ম হয়তো কোন ধাতব শিল্পকর্ম বা ট্রাপেস্ট্রির (বয়নশিল্প) খসড়া বিশেষ (lay-out)। এখানে ছবির পটভূমি হালকা সবুজ রঙে চিত্রিত হয়েছে। গাছের পাতাগুলো গাঢ় সবুজ ও গোলাপগুলো লাল, গোলাপী এবং অন্য একটি ফুল বেগুনী রঙে অবয়ব লাভ করেছে। লাল, হলুদ, নীলচে বেগুনী এবং গাঢ় বাদামী রং চিত্রে তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য সৃষ্টির পাশাপাশি দারুণ ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

আলোকচিত্র ৪.৭: বন্যজন্তু

চিত্রের অঙ্কনশৈলী, রং ও বিন্যাস প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার ন্যায়। এটি মুর্শিদাবাদ শৈলীর হতে পারে বলে ধারণা করা যায়।[২]

---

[১] *Kalila wa-Dimna* -আরব্য গ্রন্থটি বস্তুত সংস্কৃতে লেখা হয়, সম্ভবত কাশ্মীরে। চতুর্থ শতকে সংস্কৃত ভাষায় এটিকে বলা হত *পঞ্চতন্ত্র*। এতে প্রাণিজগতের অনেক গল্প লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর চিত্রায়ন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এতে বিভিন্ন প্রাণির সমাবেশ লক্ষ করা যায়।
www.muslimheritage.com/article/kalila-wa-dimna on 28 December 2016.

[২] Najma Khan Majlis, *ibid.,* p. 119

উটের নাচ

এই চিত্রকর্মটি মুঘল শাসনামলের শেষভাগে অঙ্কিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এখানে ছয়টি উটকে একপ্রকার নৃত্যের মুদ্রায় ছন্দবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। একটি বৃত্তাকার পরিসর ঘিরে রয়েছে ছয়টি উটের দল। উটগুলোর দেহাবয়ব জ্যামিতিক আদর্শে অঙ্কিত হয়েছে। ফুল যেমন একটি কেন্দ্র থেকে সকল পাপড়িকে উন্মোচিত করে, ঠিক তেমনি আলোচ্য ছবিতে একটি কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে ছয়টি উট বৃত্ত রচনা করেছে। প্রতিটি উটের আকার, অনুপাত, মুদ্রা, অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তি অভিন্ন। এ যেন একটি উটের পুনরাবৃত্তি। প্রতিসমরূপে (symmetrically) অঙ্কিত এই ছবির উটদল একটি বৃত্তের অনুসরণে ফুলের ন্যায় ইমেজ তৈরি করেছে। এটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

আলোকচিত্র ৪.৮: উটের নাচ

ছবির ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে একটি ছয় পাপড়িবিশিষ্ট লাল রঙের ফুল লক্ষণীয়। এই ফুলকে ঘিরে রয়েছে ছয়টি বৃহৎ পাপড়িসমেত অপর একটি গোলাপী রঙের ফুল। এরপর ওই ছয়টি পাপড়ির প্রান্ত ছুঁয়ে অঙ্কিত হয়েছে ছয়টি পদ্মফুল। আবার এই ছয়টি পদ্মফুলের কিনারা থেকে উদ্ভূত হয়েছে ষড়কোণবিশিষ্ট একটি হলুদ রঙের তারকা (star)। এই তারকার প্রান্তসীমা লাল রঙের। আর এই তারকার ছয়টি কোণে বিভাজিত পরিসরে ক্রমান্বয়ে সুবিন্যস্ত হয়েছে আলোচ্য চিত্রকর্মে মূল কুশীলব ছয়টি উট।

উট ও হাতির এরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত নৃত্যমুদ্রার ছবি ভারতের বোম্বে নগরীর (বর্তমান মুম্বাই) প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়াম (সাধারণত *Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya* নামে পরিচিত) এবং জয়পুরের মহারাজা সাওয়াই মানসিংহ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হয়েছে। সেগুলো মুঘল শাসনামলের শেষদিকে রাজদরবারের চিত্র কারখানায় অঙ্কিত হয়েছে বলে জানা যায়।[১]

রাজপুত শৈলীর কিছু চিত্রকর্মে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতীকসমূহ এবং অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলী অঙ্কিত হয়েছে। সেগুলো অনেকাংশে পরাবাস্তব আবহের ছবি। ঢাকার লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত 'উটের নাচ' শীর্ষক চিত্রকর্মের মধ্যভাগে অঙ্কিত তারকা জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনো প্রতীক হতে পারে বলে অনুমান করা যায়। নিশ্চয়ই এর কোনো নিগূঢ় অর্থ রয়েছে।[২]

যুবরাজ ও রাজ-তনয়ার অশ্বচালনাঃ

আলোচ্য চিত্রকর্মে একজন শাহজাদা ও একজন শাহজাদীকে ঘোড়সওয়ার হয়ে গিরিপথে যেতে দেখা যায়। মুঘল চিত্রকলায় এরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত চিত্রকর্ম কিছু সংখ্যক অঙ্কিত হয়েছে, তবে তা বিরল। ছবির গাঢ় অন্ধকার পটভূমি রাত্রিকাল নির্দেশ করে। শাহজাদা ও শাহজাদী তাদের নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ি পথ পাড়ি দিচ্ছেন। অত্যন্ত কাব্যিক ও ভাববিলাসী আবহের মধ্য দিয়ে এই চিত্রকর্মের অন্তর্গত গল্প দর্শকের মনে বিশেষ কৌতূহল তৈরি করেছে।

ছবিতে ঘোড়া দুটি সমান্তরালভাবে সম্মুখপথে ধাবমান। ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে শাহজাদা ও শাহজাদী একে অপরের সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন রয়েছেন। এই ভাবপ্রবণ বা রোমান্টিক আবহ এবং শাহজাদা ও শাহজাদীর উদ্বেগজনক অভিব্যক্তি তাদের অন্তর্গত প্রেমিক-প্রেমিকার সত্ত্বাকে দারুণ বাঙময় করে তুলেছে। দর্শকের মনে এমন বোধ হতে পারে যে, শাহজাদা ও শাহজাদী হয়তো গভীর প্রণয়ঘটিত কারণে কোথাও গমন করেছেন। ছবির নায়ক অর্থাৎ শাহজাদা উজ্জ্বল হলুদ রঙের জামা এবং নায়িকা শাহজাদী হালকা লালচে বেগুনী রঙের জামা পরিহিত রয়েছেন। নায়কের ডান হাতে বর্শা এবং বাম হাতে ঘোড়ার দড়ি ধারণ করা আছে। তাদের উভয়ের মস্তকে রয়েছে বাদশাহি পাগড়ি। নায়কের পাগড়ি জামার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ উজ্জ্বল হলুদ রঙের এবং এতে মূল্যবান কালো পালক গোঁজা রয়েছে। এরূপ পাগড়ি সাধারণত মুঘল বাদশাহদের মস্তকে শোভা পায়। শাহজাদা ও শাহজাদীর চলার পথে অর্থাৎ চিত্রের সম্মুখভাগে তরঙ্গায়িত গিরি শৈলি ও গাছগাছালি পরিলক্ষিত হয়।

---

[১] Najma Khan Majlis, *ibid,* p. 118

[২] Najma Khan Majlis, *ibid,* p. 118

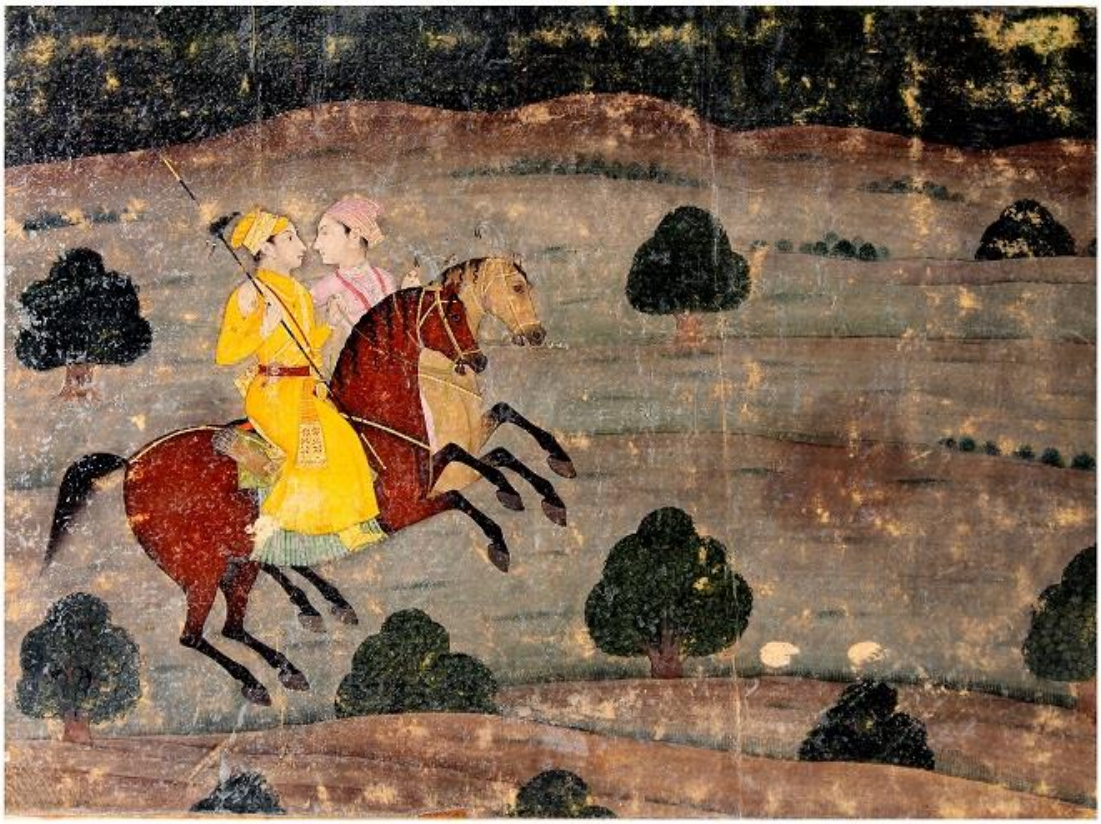

আলোকচিত্র ৪.৯: যুবরাজ ও রাজ-তনয়ার অশ্ব-চালনা

বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে এরূপ চিত্রকর্ম অঙ্কিত হয়েছে। অবশ্য চিত্রের গাঢ় কালচে সবুজ পটভূমি শাহজাহানের আমলের চিত্রকর্মের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১] লেখক Mario Bussagli তাঁর *Indian Miniatures* গ্রন্থে প্যারিসের গিমে জাদুঘরে সংরক্ষিত একটি অশ্বারোহী বিষয়ক মুঘল চিত্রকর্মের প্রতিলিপি পেশ করেছেন।[২] যা আলোচ্য চিত্রকর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরূপ অশ্বারোহী ও আবহ সম্বলিত ছবি প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল।[৩]

আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত মুর্শিদাবাদ শৈলীর একটি প্রসিদ্ধ চিত্রকর্ম 'আলিবর্দী খানের শিকারের দৃশ্য'। ওই ছবিতে নবাব আলিবর্দী ধাবমান ঘোড়া থেকে খাঁড়িতে প্রাণভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া একটা হরিণ শিকারে তৎপর রয়েছেন।[৪] এই ছবির অঙ্কনশৈলী এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে আলোচ্য 'যুবরাজ ও রাজ-তনয়ার-অশ্বচালনা' শীর্ষক চিত্রকর্মের বিশেষ সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। এসবের ভিত্তিতে ধারণা করা যেতে পারে যে, উক্ত চিত্রকর্ম মুর্শিদাবাদ শৈলীর অন্তর্ভুক্ত।

---

১ Najma Khan Majlis, *ibid*, p. 118

২ Mario Bussagli, *Indian Miniatures.* London: Paul Hamlyan, 1969, p. 64

৩ Najma Khan Majlis, *Ibid*, p. 118

৪ Robert Skelton, *Murshidabad Paintings' Marg*, Vol. X, No. 1, Bombay: 1956, p. 12

অমাত্যদের আঘাতে রক্তাক্ত দুটি মানুষকে অবলোকন

(সংগৃহীত নম্বর: N.M.P. 1954 146/7)

আলোচ্য চিত্রকর্ম পর্যবেক্ষণে বোঝা যায় যে, এর ভূ-দৃশ্য নগরকেন্দ্রিক নয়। ধারণা করা যায় এটি শহরতলীর ছবি। চিত্রের পটভূমিতে রয়েছে ছোট-বড় গিরি বা প্রস্তরবিশেষ। বামপাশে মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত প্রাচীরের অভ্যন্তরে রয়েছে একাধিক শুভ্র ইমারত। পুরো ছবির জমিনজুড়ে রয়েছে মোট এগারোটি মনুষ্য অবয়ব। চিত্রের ঠিক মধ্যভাগে দুটি মানুষ আহতাবস্থায় ভূমিতে পড়ে আছে। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেহ থেকে খসে পড়েছে। হিংস্র ষাঁড়ের আঘাতে এমন অবস্থা হয়েছে। এর প্রমাণ মেলে ছবির সম্মুখভাগে, কালো রঙের হিংস্র ষাঁড়টি এখানেও একইভাবে অপর দুটি মানুষকে ভয়ানক আঘাতে ভূমিতে ফেলে দিয়েছে। এদের একজন রক্তাক্ত অবস্থায় রয়েছেন।

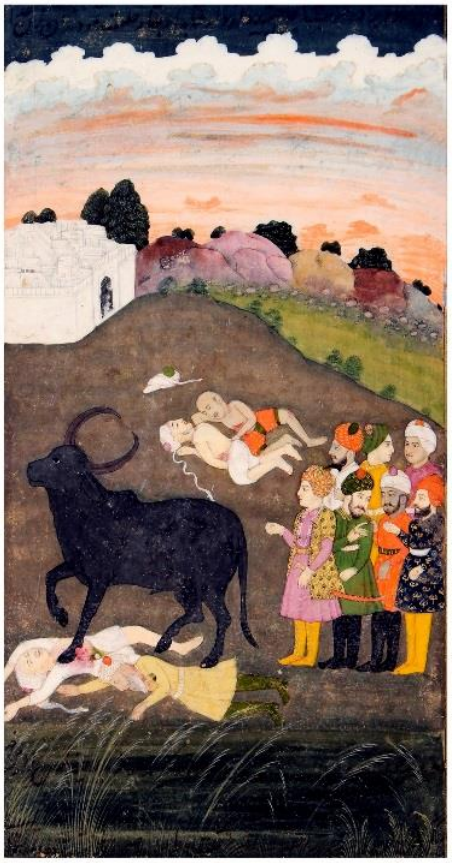

আলোকচিত্র ৪.১০: অমাত্যদের আঘাতে রক্তাক্ত দুটি মানুষকে অবলোকন

এই বীভৎস দৃশ্য পাশে দাঁড়িয়ে অবলোকন করছেন সাতজন অমাত্য। তাঁরা নিজেদের মধ্যে এই দুর্ঘটনা নিয়ে কথা বলছেন, তা বোঝা যাচ্ছে। ছবির মূলকেন্দ্রের জমিনে রয়েছে ধূসর-সবুজ রং।

পটভূমির আকাশ ও ভুবনভাঙার অঙ্কনশৈলীতে ইউরোপীয় বাস্তববাদী ধারার বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিতের আভাস রয়েছে। এই চিত্রকর্ম বাদশাহ শাহজাহান বা আওরঙ্গজেবের আমলের হতে পারে।[১]

উল্লম্বভাবে সুবিন্যস্ত আলোচ্য ছবির বিষয়বস্তু একটি শঙ্কাজনক ঘটনার বিবরণস্বরূপ। যার সর্বত্র ভীতি-রস সঞ্চারিত হয়েছে। ছবিতে হিংস্র ষাঁড়ের অভিব্যক্তি অমাত্যদের দুর্ঘটনা অবলোকনের দৃশ্যে শিল্পীর বিশেষ মুনশিয়ানার পরিচয় মেলে। চিত্রে বিভাজিত পরিসর জটিল কিন্তু চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ।

বৃক্ষছায়ায় চিন্তামগ্ন খাজা হাফিজ সিরাজ

মহাকবি হাফিজ সিরাজীর চরিত্র অবলম্বনে অঙ্কিত হয়েছে অসামান্য এই চিত্রকর্ম। সুশীতল সবুজ মাঠে বৃক্ষছায়ায় বসে চিন্তামগ্ন রয়েছেন হাফিজ- বস্তুত এই হচ্ছে চিত্রের মূল উপজীব্য।

আলোকচিত্র ৪.১১: বৃক্ষছায়ায় চিন্তামগ্ন খাজা হাফিজ সিরাজ

ছবির ভূ-দৃশ্যে লক্ষ করা যায়, অপরূপ এক পাহাড়ি অঞ্চল। পটভূমিতে আকাশের নীচে নীলচে-ধূসর রঙের ছোট-বড় পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের সানুদেশে কয়েকটি গাছ চমৎকারভাবে বেড়ে ওঠেছে। দূর

[১] Najma Khan Majlis, *ibid*, p. 119

পাহাড়ের ধারে দিগন্তের কাছাকাছি দেখা যায় মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত কয়েকটি ইমারত। নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায়, ওখানে লোকালয়। আরো দূরে দিগন্তের সঙ্গে আকাশের মেলবন্ধন ঘটেছে। সেখানে পাহাড় ও আকাশ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ছবির মধ্যভাগের মূলকেন্দ্রে রয়েছে একটি উপত্যকা।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া এই উপত্যকার সানুদেশে বৃক্ষছায়ায় বসে চিন্তামগ্ন রয়েছেন কবি হাফিজ। বৃক্ষের সঙ্গে হেলান দিয়ে বিশ্রামের ভঙ্গিতে আছেন তিনি। তাঁর বামহাতে কবিতার খাতা আর ডান হাতের ওপর মস্তক এলিয়ে দেয়া। সাধারণত গভীর চিন্তামগ্ন হলে মানুষ এরূপ ভঙ্গিতে থাকে। গাছের গোড়ায় আছে কয়েকটি পাথর। একটি পাথরের ওপর হাফিজ তাঁর পাগড়ির কাপড় রেখেছেন। এসবের পাশেই রয়েছে একটি বই বা খাতা এবং দোয়াত ও কলম। ছবির সম্মুখভাগে রয়েছে ছোট একটি হ্রদ। সেখানে বকপাখি ও হাঁসের বিচরণ দেখা যাচ্ছে। হাফিজের মুখাবয়বে উদাসভাবের অভিব্যক্তি বিশেষ লক্ষণীয়। তাঁর মস্তকের পেছনে রয়েছে একটি সবুজাভ সোনালী বলয়। জাহাঙ্গীরের আমলের চিত্রকর্মে এরূপ বলয় বেশি দেখা গেছে।[১] হাফিজের মুখাবয়ব তিন-চতুর্থাংশ দৃষ্টিকোণে রয়েছে। এরূপ মুখাবয়ব ও বৃক্ষ চিত্রণ পারসিক চিত্রশৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলোচ্য চিত্রকর্ম মুঘল শৈলীর অনুসরণে সৃষ্ট মুর্শিদাবাদ কলমের অন্তর্ভুক্ত।[২]

কবি হাফিজের সম্বন্ধে আরেকটু আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক। কারণ হাফিজ সম্পর্কে অন্তত কিছু প্রাথমিক তথ্য জানা থাকলে হাফিজের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্র পাঠে বিশেষ সুবিধা হবে। বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তি কবি হাফিজের পুরো নাম খাজা শামস-উদ-দ্বীন মুহম্মদ হাফিজ-ই-সিরাজী। 'হাফিজ' তাঁর 'তখল্লুস' অর্থাৎ কবিতার ভণিতায় ব্যবহৃত উপ-নাম। যাঁরা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করতে পারেন, তাঁদেরকে আরবি ভাষায় 'হাফিজ' বলা হয়। তাঁর জীবনী-লেখকগণ বলেছেন, হাফিজ তাঁর পাঠ্যাবস্থায় কুরআন শরীফ মুখস্থ-কণ্ঠস্থ করেছিলেন। পারস্যের তীর্থভূমি শিরাজ নগরের মোসল্লা নামক স্থানে হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। পারস্যের এক নিশাপুর (কবি ওমর খৈয়ামের জন্মভূমি) ব্যতীত আর কোনো নগরই শিরাজের মতো বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেনি। পারস্যের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কবিরই পূণ্যস্থান এই শিরাজ। পারসিকরা হাফিজকে ভক্তি করে 'বুলবুল-ই-শিরাজ' বা শিরাজের বুলবুলি বলে সম্বোধন করে। হাফিজের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা শুধু কবি বলেই নয়। তাঁরা হাফিজকে 'লিসান-উল-গায়েব' (অজ্ঞাতের বাণী), 'তর্জমান-উল-আসকার' (রহস্যের মর্মসন্ধানী) বলে অধিকতর শ্রদ্ধা করেন। হাফিজের সমাধি আজ শুধু পারস্যের (বর্তমান ইরান) জ্ঞানী-গুণীজনের শ্রদ্ধার স্থান নয়, সর্বসাধারণের কাছে 'দরগাহ' বা পীরের আস্তানা।

---

[১] Najma Khan Majlis, *ibid*, p. 119

[২] *ibid*, p. 119

হাফিজ তাঁর জীবিতকালে নিজের লেখা কবিতাসমূহ (দীওয়ান) সংরক্ষণ করেননি। হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু গুল-আন্দামই সর্বপ্রথম 'দীওয়ান' আকারে হাফিজের সমস্ত কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন। ধারণা করা হয় হাফিজের পঞ্চশতাধিক কবিতা পাওয়া গেছে। অসংখ্য কবিতা হারিয়ে গেছে। যেগুলো সংগ্রহ করা যায়নি। উল্লেখ্য হাফিজ ছিলেন উদাসীন সূফি। তাঁর নিজের কবিতার প্রতিও তিনি উন্নাসিক ছিলেন। হাফিজ যৌবনে হয়তো শারাব-সাকির অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সূফি-সাধকরূপে আবির্ভূত হন। হাফিজ সম্বন্ধে বিশ্ববিজয়ী বীর তৈমুর লঙকে নিয়ে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। হাফিজের জগদ্বিখ্যাত কবিতার দুটি লাইন নিয়ে সে কাহিনির সূত্রপাত হয়-

আগ্‌র্ আঁ তুর্কে শিরাজী বেদস্ত আরদ দিলে মারা,
বখালে হিন্দুয়শ্ বখ্‌শম্ সমরখন্দ ও বোখারা রা!!

অর্থাৎ

প্রাণ যদি মোর দেয় ফিরিয়ে তুর্কী সওয়ার মনচোরা প্রিয়ার মোহন চাঁদ কপোলের
একটি কালো তিলের লাগি বিলিয়ে দেব সমরকান্দ ও রত্নখচা এ বোখারা!

(অনুবাদ: কাজী নজরুল ইসলাম)

সেকালে তৈমুরের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সমরখন্দ। হাফিজ তাঁর প্রিয়ার গালের তিলের জন্য তৈমুরের সাম্রাজ্য ও রাজধানী বিলিয়ে দিতে চান। এ কথা শুনে তৈমুর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং পারস্য জয়ের সময় হাফিজকে ডেকে পাঠান। উপায়ান্তর না দেখে হাফিজ তৈমুরকে বলেন যে, তিনি ভুল শুনেছেন। শেষের লাইনের 'সমরখন্দ' ও 'বোখারা'র পরিবর্তে 'দো মন কন্দ' ও 'সি খোর্মারা' হবে।

'আমি তাহার গালের তিলের বদলে দু মণ চিনি ও তিন মণ খর্জূর দান করিব!'

কেউ কেউ বলেন, হাফিজ এরূপ উত্তর দেননি। তিনি নাকি দীর্ঘ কুর্নিশ করে বলেছেন, "সম্রাট! আমি আজকাল এই রকমই অমিতব্যয়ী হয়ে পড়েছি!" এই উত্তর শুনে তৈমুর বিপুল আনন্দ লাভ করেন যে, হাফিজকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে বহু মূল্যবান পারিতোষিক প্রদান করেন।[১]

আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। সুলতানি আমলের বাংলা সম্পর্কে হাফিজ অবগত ছিলেন। হাফিজের সঙ্গে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের[২] সৌহার্দ্যপূর্ণ পত্রালাপ ছিল। একবার সুলতান

---

[১] কাজী নজরুল ইসলাম, 'বুলবুল-ই-শিরাজ', *নজরুল রচনাবলী* (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ), চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ১৫৩-১৫৮.

[২] গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১১) বাংলার প্রথম ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান। রাজ্যের বিস্তৃতির চেয়ে তিনি রাজ্যকে সুদৃঢ় করার দিকে বেশি মনোযোগ দেন। তিনি তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে শুধু কামরূপ-এ অভিযান করে তা দখল করেন এবং কামরূপের উপর কয়েক বছর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁর আদর্শ চরিত্র, শিক্ষা পৃষ্ঠপোষকতা এবং সুশাসনের জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। আইনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অসামান্য বিদ্বান ও কবি ছিলেন। বিদ্বান লোকদের তিনি খুব সমাদর করতেন। প্রায়শ তিনি

হাফিজের নিকট কবিতার একটি চরণ লিখে পাঠান এবং কবিতাটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য কবিকে সবিনয়ে অনুরোধ জানান। একইসঙ্গে তিনি কবিকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণও জানান। হাফিজ দ্বিতীয় চরণটি রচনা করে কবিতাটির পূর্ণতা দেন এবং তা সুলতানকে পাঠান। তিনি সুলতানের নিকট একটি গজলও লিখে পাঠান।[১] কথিত আছে যে, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমন্ত্রণ পেয়ে মহাকবি হাফিজ বাংলায় আগমনের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু পারস্য উপসাগরের কূলে এসে তিনি যখন জাহাজে উঠতে যান, তখন ভীষণ ঝড় ওঠে। এই ব্যাপারটিকে হাফিজ দৈবের অশনিসংকেত ভেবে শিরাজে ফিরে যান। ফলত তাঁর আর বাংলা-ভারতবর্ষ সফর করা সম্ভব হয়নি।[২]

লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত 'বৃক্ষ ছায়ায় চিন্তামগ্ন খাজা হাফিজ সিরাজ' শীর্ষক চিত্রকর্মটি বাংলার সঙ্গে হাফিজের সম্পর্কের বিবেচনায় একটি অমূল্য নির্দশন বটে। এই চিত্র দর্শনে হাফিজের সূফি-সাধনার দিক ও তাঁর জীবনের বিবিধ ঘটনা প্রবাহ স্মরণে আসে। এটিই চিত্রের অন্তর্গত শক্তি।

বাহার-ই-দানিশ (চিত্রিত মুঘল পাণ্ডুলিপি)

লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে *বাহার-ই-দানিশ*'র চিত্রিত পাণ্ডুলিপির একটি কপি। এটি শায়খ এনায়েত উল্লাহ (জীবনকাল: ১৬০৮-১৬৭১) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ। তিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, লেখক ও ইতিহাসবিদ। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তবে *বাহার-ই-দানিশ* এনায়েত উল্লাহ রচিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

বাহার-ই-দানিশ (*Bahar-i-Danish*) ফারসি ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি। এর ইংরেজি অর্থ: The Springtime of Knowledge। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়: 'জ্ঞান-বসন্ত'। এনায়েত উল্লাহ ১৬৫১ সালে এই পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ সম্পন্ন করেন।[৩] *বাহার-ই-দানিশ* বস্তুত আদি ভারতীয় কাহিনি অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ। যেখানে রয়েছে একজন তরুণ ব্রাহ্মণের গল্প। এনায়েত উল্লাহ ফারসি ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করেন। ধারণা করা হয় লাহোরে এটি রচিত হয়। জাহান্দার সুলতান ও তার সহধর্মিণী ভারাওয়ার বানুর প্রেম-উপাখ্যানই *বাহার-ই-দানিশ*র মূল প্রাণ।

আরবি ও ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বাংলা সাহিত্যের উন্নতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রাখেন। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্য ইউসুফ *জোলেখা* রচনা করেন।

এ বি এম শামসুদ্দীন আহমদ, 'গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ-খণ্ড ৩, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪ (প্রথম পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১৬৯

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

[২] কাজী নজরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

[৩] Syed M. Ashfaque, *Lalbagh Fort: Monuments and Museum*, Karachi: Department of Archaeology & Museums, 1970, pl. 14

পরবর্তীকালে ১৭৬৮ বা ১৭৬৯ সালে লেখক আলেক্সান্দার উক্ত আলোচ্য পাণ্ডুলিপির ইংরেজি অনুবাদ করেন। তবে তা ছিল অসম্পূর্ণ। এরপর ১৯৭১ সালে জনাথন স্কট *বাহার-ই-দানিশ*র সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করেন। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে তাঁর রাজদরবারে চিত্র কারখানায় *বাহার-ই-দানিশ*র পাণ্ডুলিপি চিত্রণের কাজ শুরু হয়। এতে খ্যাতিমান শিল্পী গোবর্ধন ছবি এঁকেছেন।[১]

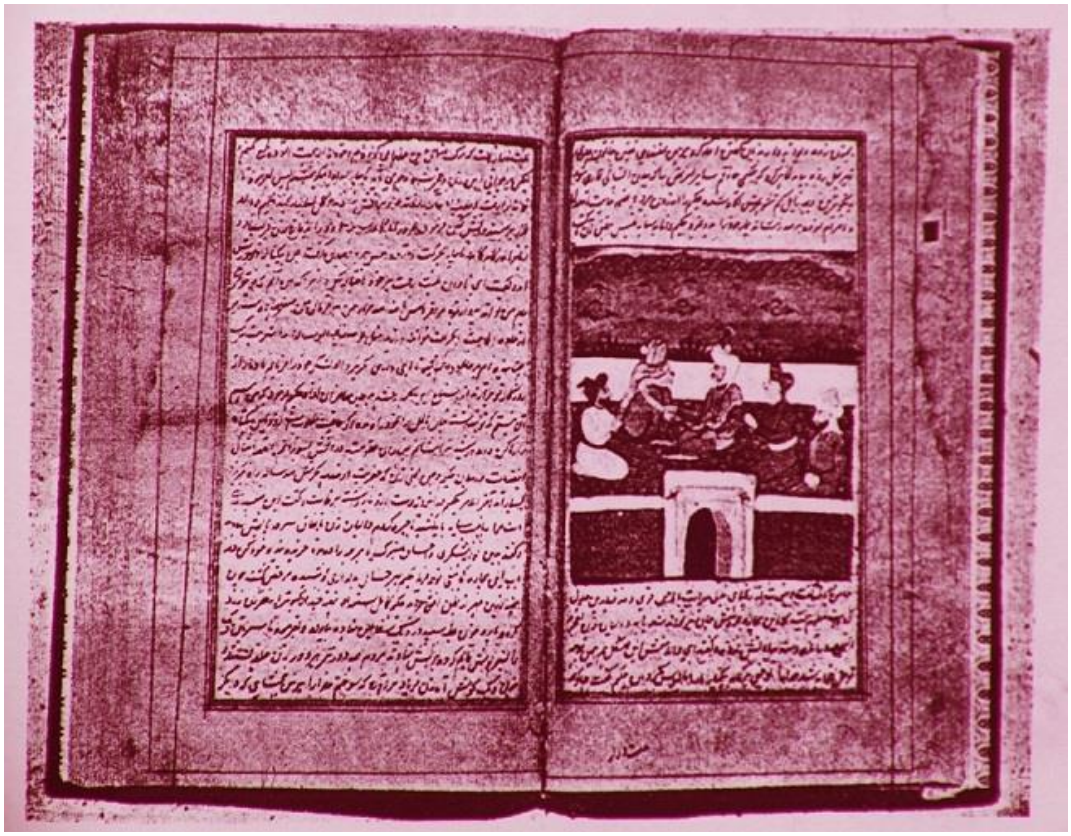

আলোকচিত্র ৪.১২: বাহার-ই-দানিশ (চিত্রিত মুঘল পাণ্ডুলিপি)

লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত *বাহার-ই-দানিশ*র চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে উন্মুক্ত পৃষ্ঠায় একটি মিনিয়েচর চিত্রকর্ম শোভা পাচ্ছে। ছবিতে পাঁচজন সভাসদ দরবারে বসে আলাপচারিতায় রয়েছেন। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদে বাদশাহি আমেজ লক্ষ করা যায়। অত্যন্ত বর্ণিল এই চিত্রকর্ম। এতে লাপিস লাজুলি পাথরের অসামান্য নীল রং চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এর অঙ্কনশৈলী সম্পূর্ণরূপে মুঘল। মানুষের দেহাবয়ব ও উপবেশনের অঙ্গভঙ্গিতে রয়েছে শাহি আদব-কায়দা ও রীতি। সভাসদগণের পাগড়িগুলোও তাঁদের পদমর্যাদার প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের বিষয়বস্তু ও শৈলী বৈচিত্র্যময় ও নান্দনিক। এগুলো মুরাক্কা বা অ্যালবাম এবং চিত্রিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কয়েকটি চিত্রকর্ম যেমন: 'দুরদানার প্রতিকৃতি', 'সিংহাসনে বসা সম্রাট আওরঙ্গজেব', 'শাহজাদা আজম শাহের প্রতিকৃতি',

[১] https://en.wikipedia.org/wiki/Bahar-i-Danish, Dhaka: 5 January 2017

'আসফ জাহ বাহাদুরের প্রতিকৃতি' এবং 'বৃক্ষছায়ায় চিন্তামগ্ন খাজা হাফিজ সিরাজ' মুরাক্কা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া অপরাপর চিত্রকর্মসমূহ যেমন: 'উটের নৃত্য', 'অমাত্যদের আঘাতে রক্তাক্ত দুটি মানুষকে অবলোকন' এবং 'মধুমতি অঙ্কিত একটি চিত্র' এ তিনটি চিত্রকর্ম পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। উল্লেখ্য 'মধুমতি অঙ্কিত একটি চিত্র' শীর্ষক ছবিটির প্রকৃত শিরোনাম হবে 'মধুমাধবী রাগিনী'। 'বন্যজন্তু' শীর্ষক চিত্রকর্মটি কোনো বয়নশিল্পের (tapsetry) জন্য অঙ্কিত খসড়া (lay-out) হিসাবে বিবেচনা করা যায়।[১]

৪.২ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের বিষয়বস্তু

একজন দরবেশের প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৯০)

মুঘল চিত্রকলায় প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচ্য চিত্রকর্মে একজন দরবেশের প্রাত্যহিক জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তকে প্রতিভাত করা হয়েছে। লক্ষণীয়, দরবেশ উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। তাঁর ডান হাতে আল-কুরআন এবং বাম হাতে তসবিহ আছে। শুভ্র পোশাক-পরিচ্ছদ এবং একটি কালো চাদরে ঢাকা রয়েছে দরবেশের দেহাবয়ব। মস্তকে তাঁর সূফি-পাগড়ি, মুখাবয়ব শ্মশ্রুমণ্ডিত, কোমল এবং মায়াময়। দরবেশের পার্শ্বপ্রতিকৃতির (profile) চোখে-মুখে উদাস দৃষ্টি লেগে আছে। দুনিয়াবি সকল আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে এ যেন আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিবেদনের বহিঃপ্রকাশ।

মুঘল সাম্রাজ্যে শুরু থেকেই সূফি-দরবেশের বিশেষ মর্যাদা ও কদর ছিল। মুঘল বাদশাহগণ সূফি-সাধু বা দরবেশদের সর্বদা মর্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। মুঘল প্রতিকৃতিসমূহে রাজনৈতিক, সামাজিক ও নান্দনিক চাহিদার এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষণীয়। বস্তুত সামাজিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় এখানে প্রতিষ্ঠা পায়। বাদশাহ, যোদ্ধা, শাহজাদা, সাধু, কারিগর সকলেই এক বিশাল ঐতিহাসিক কাহিনির কুশীলব হিসাবে দর্শকের সম্মুখে আবির্ভূত হন। যুদ্ধের ময়দান, রাজদরবার, দরবেশের আশ্রম যেমন এই কাহিনির পটপরিবর্তনে বৈচিত্র্য আনে, ঠিক তেমনি মানুষগুলো এই বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে নিরলসভাবে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিকৃতিচিত্রগুলো দর্শকের ইতিহাসের ধারণাকেও নিয়ন্ত্রিত করে।[২]

---

[১] Najma Khan Majlis, *ibid*, p. 120

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরূপ: মুঘল চিত্রকলা*, কলকাতা: যীমা, ১৯৯৯, পৃ. ৭১

আলোকচিত্র ৪.১৩: একজন দরবেশের প্রতিকৃতি

আলোচ্য চিত্রকর্মে দরবেশের মস্তকের পেছনে রয়েছে সোনালী বলয়, যা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রতীক স্বরূপ। ছাদের সীমানা-প্রাচীরে (railing) জালিকা নকশার কারুকাজ এবং তার কিনারায় রয়েছে একাধিক ফুলগাছ। চিত্রের সম্মুখ অংশে একটি কৃত্রিম ঝর্ণা লক্ষ করা যায়। ঝর্ণার দুপাশে ফুলগাছের চারা। চিত্রের উপরের দিকে প্রায় অর্ধেক অংশজুড়ে আকাশ চিত্রিত হয়েছে। বাকি অর্ধেক অংশে দরবেশসহ বিবিধ অনুষঙ্গের দেখা মেলে। দরবেশ উপবিষ্ট রয়েছেন মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত শুভ্র ছাদে। এই ছবির অন্তর্গত সূফি-আবহ ও আধ্যাত্মিক সাধনার উত্তাপ বিশেষ অনুভব করা যায়। এরূপ চিত্রদর্শনে মনে একপ্রকার অপার্থিব শান্তি আসে। ছবির অঙ্কনশৈলী ও রং প্রয়োগের কুশলতায় মুর্শিদাবাদ শৈলীর গুণাগুণ স্পষ্ট।

হেরেমের দৃশ্যঃ

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৯৭)

আলোচ্য চিত্রকর্ম অত্যন্ত মোহনীয়। চিত্রে লক্ষ করা যায় অন্দর মহলের উন্মুক্ত চত্বরে (terrace) স্থাপিত পালঙ্কে উপবিষ্ট আছেন যুবক বাদশাহ ও সম্রাজ্ঞী। অথবা বলা যায় কোনো নবাব ও তাঁর সহধর্মিণী। তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পাঁচজন গৃহ-পরিচারিকা। বাদশাহের হাতে গড়গড়ার নল। তাঁদের সম্মুখে মেঝেতে রাখা হয়েছে রাজসিক গড়গড়া, ফলমূলের পাত্র ও শরাবের পেয়ালা। চিত্রকর্মের ডানদিকে রয়েছেন সাতজন নর্তকীর দল। তারা যুবক বাদশাহ ও বেগমের সম্মুখে ধ্রুপদী

নৃত্য পরিবেশন করছেন। একজন নর্তকী বাদশাহের দিকে হাত প্রসারিত করে একটি অনুপম মুদ্রা তৈরি করেছেন। বাকিরাও ব্যস্ত রয়েছেন নৃত্যের তালে। তাদের পরিধানে রয়েছে বাহারি রঙের ঘাঘরা ও মূল্যবান অলঙ্কার। অনতিদূরে পার্শ্ববর্তী ইমারতের ছাদে কতিপয় রমণীকে আলাপচারিতায় দেখা যায়।

আলোকচিত্র ৪.১৪: হেরেমের দৃশ্য

চিত্রের উপরিভাগে সুন্দর নীল আকাশ। ছবির সামগ্রিক বিন্যাস ও বিষয়বস্তুর অনুপুঙ্খ অঙ্কনশৈলী চমৎকার। চিত্রটিতে মুর্শিদাবাদ কলমের বৈশিষ্ট্যসমূহ উজ্জ্বল।

মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্-এর প্রতিকৃতি (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ):

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৮৭)

মুহম্মদ শাহ্ ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেব পরবর্তী মুঘল বাদশাহগণের একজন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন The Later Mughal বা পরবর্তী মুঘল বাদশাহ। বাদশাহ বাবুরের ধারাবাহিকতায় তাঁর স্থান ছিল দ্বাদশতম। বাদশাহ মুহম্মদ শাহের উল্লিখিত প্রতিকৃতি চিত্রে মুঘল চিত্রকলার মৌলিক রীতি মোতাবেক বাদশাহের ভাব-গাম্ভীর্য ও পারিপার্শ্বিক আবহ চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। রাজদরবারের সিংহাসনে বাদশাহ মুহম্মদ শাহ উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর পরিধানে সোনালি রঙের রাজসিক পোশাক-

পরিচ্ছদ শোভা পাচ্ছে। মস্তকে রয়েছে আকর্ষণীয় কারুকাজ-সম্বলিত শাহি পাগড়ি। বাদশাহের মস্তক ঘিরে থাকা হলুদাভ সোনালি আলোকবলয় তাঁর ক্ষমতা ও শক্তিমত্তার প্রতীক হিসাবে অঙ্কিত হয়েছে।

সিংহাসনের উপরে পারসিক নকশায় সজ্জিত শামিয়ানা স্থাপন করা হয়েছে। গৃহতলে (floor) ফুল ও পাতার নকশা লক্ষণীয়। সিংহাসন থেকে কিছুটা দূরত্বে রয়েছে মর্মর প্রস্তরের সীমানা-প্রাচীর। প্রাচীরের ঊর্ধ্বে দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে চোখে পড়ে বাগানের আভাস।

সামগ্রিক বিবেচনায় আলোচ্য চিত্রকর্মে মুঘল মিনিয়েচরের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও অঙ্কনশৈলীর দেখা মেলে। বাদশাহের পার্শ্বপ্রতিকৃতির মধ্যে শাহি ব্যক্তিত্ব ও মেজাজ দারুণভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাদশাহের গলায় মণিমুক্তার মূল্যবান মালা এবং কটিদেশ-বন্ধনীতে নকশাদার ছুরি গোঁজা আছে। তাঁর ডান হাতে তরবারি এবং বাম হাতে পানপাত্র লক্ষণীয়। চিত্রকর্মে শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই। এতদসত্ত্বেও অঙ্কনশৈলী, রঙ ও বিন্যাসে অজ্ঞাত শিল্পীর অসামান্য দক্ষতা ও বিশিষ্টতার পরিচয় অনুভব করা যায়।

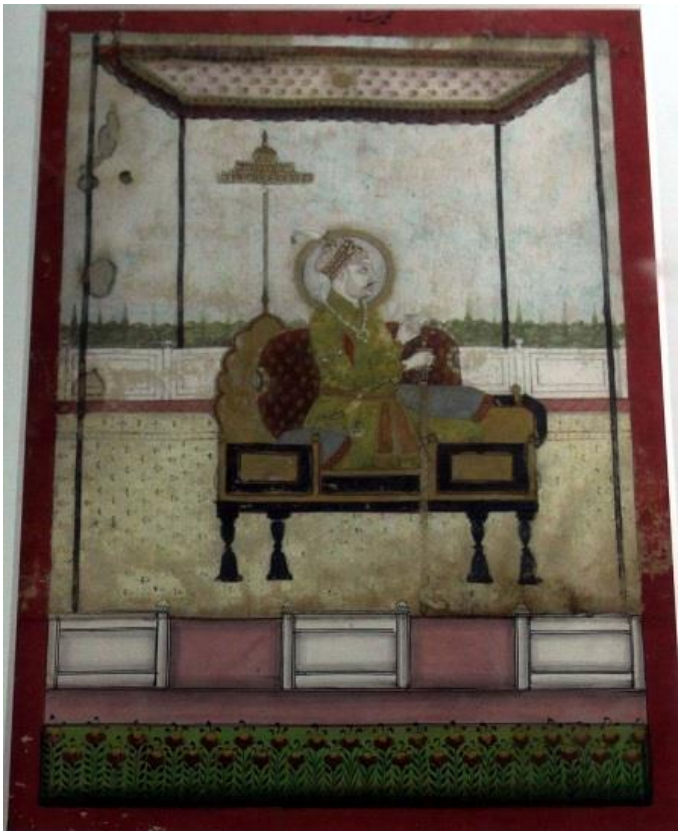

আলোকচিত্র ৪.১৫: মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্-এর প্রতিকৃতি (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)

মুহম্মদ শাহ সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য। বলা হয়ে থাকে, সৈয়দ ভাইদের অনুগ্রহে ফররুখশিয়রের চাচাতো ভাই (জাহান শাহের পুত্র) রওশন আখতার বা মুহম্মদ শাহ আঠারো বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। তবে তিনি সৈয়দ ভাইদের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ১৭২২ সালে তিনি সেই চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। তবে সৈয়দ হোসেন আলী নিহত

হওয়ার পর সৈয়দ আবদুল্লাহ রফিউশ্বানের অন্য এক পুত্র ইব্রাহিমকে বসিয়ে মুহম্মদ শাহকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হন মুহম্মদ শাহ। ইব্রাহিমকে হত্যা করা হয়। পূর্বসুরী তিনজন বাদশাহের চেয়ে তিনি কিছুটা বেশি সময় ক্ষমতায় থাকতে পেরেছিলেন। তবে তিনি যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তা কাজে লাগাতে পারেননি।

বিলাসী জীবনযাপনের জন্য তাঁকে 'রঙিলা' মুহম্মদ শাহ নামে ডাকা হতো। তাঁর দরবার শেষবারের মতো মুঘল ঐশ্বর্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। জাঁকজমকের সাথে আলোকসজ্জা, আতশবাজিযোগে ঈদ, মুহররম, বসন্ত উৎসব, হোলি, দিপালী, পূজা পালিত হতো। মুহম্মদ শাহের শাসনামলে দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা, বাংলা প্রভৃতি প্রদেশ কার্যত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আলিবর্দী খান তাঁর আমলেই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। তিনিই ফতেহচাঁদকে 'জগৎ শেঠ' (পৃথিবীর মহাজন) উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর আমলেই পারস্যের নাদির শাহ দিল্লি লুণ্ঠন করেন এবং কোহিনূর ও ময়ূর সিংহাসনসহ বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে যান (১৭৩৯ খ্রি.)।[১]

প্রকৃত অর্থেই, মুহম্মদ শাহ মুঘল সাম্রাজ্যের করুণ পরিণতির প্রত্যক্ষকারী এক অসহায় বাদশাহ্ ছিলেন।

দরবার দৃশ্যঃ

(সংগৃহীত নম্বরঃ ২১৯৪)

উল্লিখিত চিত্রকর্মে একাধিক কুশীলবের উপস্থিতি এক ধরনের নাটকীয় আবহ তৈরি করেছে। চিত্রের মধ্যভাগে রাজসিক আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন একজন তরুণ বাদশাহ বা শাহজাদা। তাঁকে ঘিরে আছেন আটজন মানুষ। এঁদের মধ্যে উজির, ভৃত্য ও প্রহরীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। বাদশাহের আসনের পেছনে একজন উজির ও ব্যজন হাতে দুজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছেন । সম্মুখভাগে অপর এক ব্যক্তি বাদশাহের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে কিছু একটা তুলে দিচ্ছেন। এছাড়াও আরো চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে দুজনকে সাধু-পুরুষের ন্যায় মনে হয়। বাকি দুজন তরবারি ও লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

[১] হাসান শরীফ, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, ঢাকাঃ অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১০, পৃ. ১৩০

আলোকচিত্র ৪.১৬: দরবার দৃশ্য

আলোচ্য চিত্রকর্মে অঙ্কিত চরিত্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথনের আমেজ পাওয়া যায়। ছবির নিচের অংশের নকশা ও উপরের অংশের নিসর্গ দৃশ্য নান্দনিকতা বৃদ্ধি করেছে। ধারণা করা যায়, এটি প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকর্ম।

একজন সভাসদ-এর প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৯১)

উক্ত চিত্রকর্মের মুখ্য এবং একমাত্র বিষয় হচ্ছে একজন সভাসদ। ছবির ঠিক মধ্যভাগে উপবিষ্ট রয়েছেন জনৈক সভাসদ। তাঁর মস্তকে অনাড়ম্বর সাদা রঙের পাগড়ি। গলায় ঝোলানো রয়েছে গেরুয়া রঙের উত্তরীয়। পরিধানে আছে সাদা পাঞ্জাবী এবং ডোরাকাটা ধূসর পায়জামা। সভাসদ তাঁর কোলের ওপর দু'হাতে ধারণ করেছেন একটি তরবারি।

আলোকচিত্র ৪.১৭: একজন সভাসদ-এর প্রতিকৃতি

মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত উন্মুক্ত গৃহতলে সভাসদ উপবিষ্ট রয়েছেন। ছবিতে দৃশ্যমান তাঁর পার্শ্বপ্রতিকৃতি শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং চিন্তাযুক্ত। মনে হতে পারে, কোনো ঈপ্সিত লক্ষে পৌঁছানোর জন্য বা কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই সভাসদ চিন্তামগ্ন রয়েছেন। এই ছবিটিও প্রাদেশিক মুঘল রীতির আওতাভুক্ত।

পরিচারকসহ একজন অভিজাত ব্যক্তি:

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৯৩)

এই চিত্রকর্মে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা কুশীলব হচ্ছেন একজন সূফি-সাধক বা পীর সাহেব। মর্মর প্রস্তরে নির্মিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষের গৃহতলে তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর আপাদমস্তকে শুভ্র পোশাক-পরিচ্ছদ শোভা পাচ্ছে।

আলোকচিত্র ৪.১৮: **পরিচারকসহ একজন অভিজাত ব্যক্তি**

সূফি-সাধকের আস্তানা বা গৃহটি বস্তুত ষড়ভূজাকৃতির। এর ছাদের উপরে মসজিদের স্থাপত্যশৈলীর আদর্শে নির্মিত একটি গম্বুজ ও কয়েকটি মিনার দেখা যায়। কক্ষের বহিস্থঃগৃহতলে (floor) চারজন খাদেম বা শিষ্যের উপস্থিতি চিত্রের মধ্যে নাটকীয় আবহ তৈরি করেছে। খাদেমগণের মধ্যে ডানদিকের দুজন উপবিষ্ট এবং বামদিকের দুজন দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন। চিত্রের একদম সম্মুখভাগের বামদিকের কিনারায় ঘোড়াসহ অপর এক খাদেমের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ছবিতে ঘোড়ার শুধু মস্তকের অংশটুকুই সুবিন্যস্ত হয়েছে। ছবির পটভূমিতে ধূসর-নীল আকাশ এবং ইমারতের দু'পাশে রয়েছে গাছ।

আলোচ্য চিত্রকর্মে বস্তুত একজন অভিজাত সূফি-সাধকের প্রাত্যহিক জীবনের কিছু মুহূর্ত প্রতিভাত হয়েছে। মুঘল সমাজে সূফি-দরবেশদের বিশেষ গুরুত্বের কারণেই মুঘল চিত্রকর্মেও তাঁরা বিষয় হয়েছেন বারবার।

পাণ্ডুলিপি- শাহনামাঃ

(সংগৃহীত নম্বরঃ ০১.০১.০০৫.১৯৭৭.০০৪২৮)

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত *শাহনামার* যে পাণ্ডুলিপিটি গ্যালারিতে দেখা যায়, তা *শাহনামার* প্রথম খণ্ড। পারস্যের মহাকবি হাকিম আবুল কাশেম ফেরদৌসী *শাহনামা* রচনা করেছেন। তিনি কিংবদন্তিতুল্য কথাশিল্পী ও পারস্যের গৌরবের প্রতীক। তাঁর মর্যাদার এই বিশালত্বের কারণে তাঁর জীবন কাহিনি রূপকথার সাথে মিশে গেছে। ফেরদৌসীর জীবন সম্পর্কে প্রাচীনতম যে সূত্রটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে নিজামী আরুজীর 'তাযকেরায়ে চাহার মাকালে'। এটি হিজরী ৫৫০ (১১৫৫ খ্রি.) সালে রচিত হয়, যা ফেরদৌসীর মৃত্যুর আনুমানিক দেড়'শ বছর পর। তিনি কবিতা সম্পর্কিত প্রবন্ধের (দ্বিতীয় প্রবন্ধ) নবম কাহিনিতে তাঁর জীবনাল্লেখ্য সম্বন্ধে লিখেছেন, ওস্তাদ আবুল কাশেম ফেরদৌসী তুসের কৃষক ছিলেন। তাঁর গ্রামের নাম ছিল 'বায', যা তাবরান এলাকায় অবস্থিত ছিল।[১]

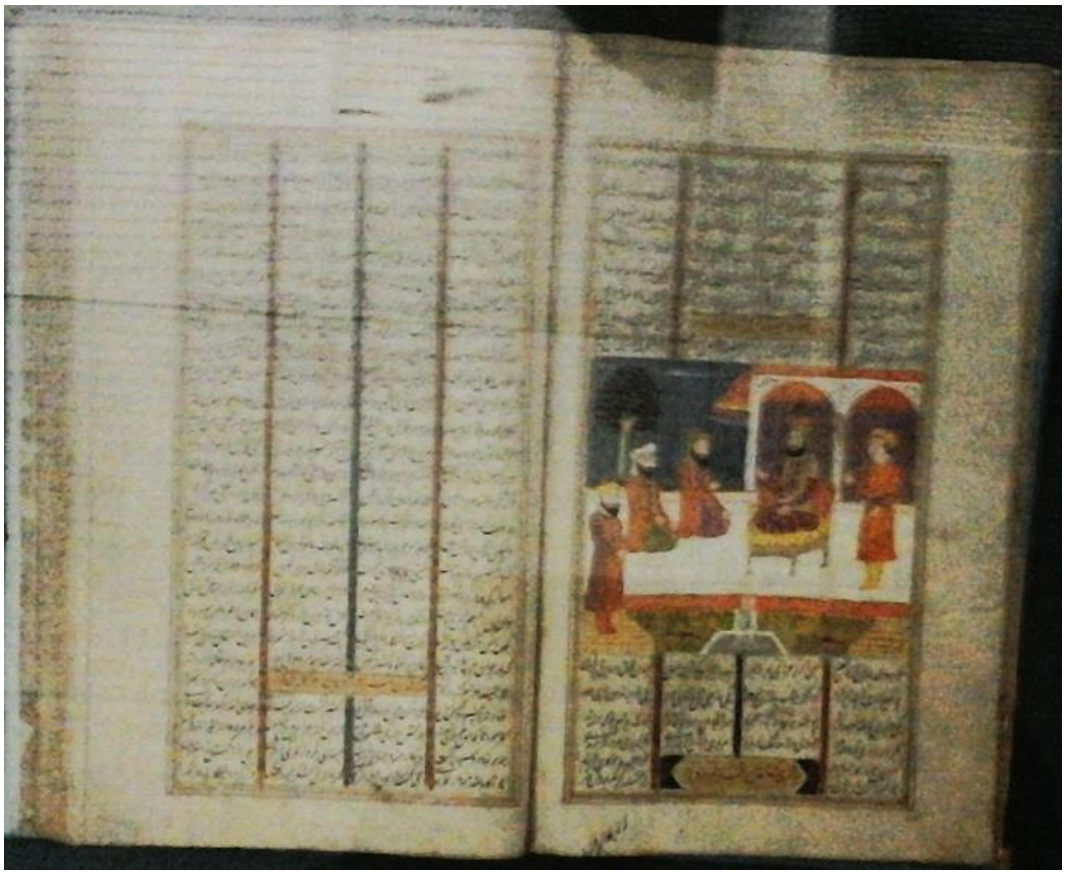

আলোকচিত্র ৪.১৯: পাণ্ডুলিপি- *শাহনামা*

ফেরদৌসীর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *শাহনামা*। তিনি *শাহনামা*'র তাঁর কিতাবের নাম হিসাবে কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন- 'নামেয়ে বাস্তান' (পৌরাণিক গাথা), 'নামওয়ার নামেয়ে বাস্তান'

[১] আহ্‌মাদ তামীমদারী, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, (বাংলা অনুবাদঃ তারিফ জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী), ঢাকাঃ আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭, পৃ. ১২৫

(পৌরাণিক গৌরবগাথা), 'নামেয়ে নামওয়ারে শাহরিয়ার' (রাজন্য সুখ্যাতি গাথা), 'শাহরিয়ারনামে' এবং 'শাহরিয়ারাননামে' (রাজাধিপতিগণ)। কারণ, 'নামে' শব্দের একটি অর্থ ছিল 'গ্রন্থ'। কাজেই আজকের দিনে 'শাহনামা' বলতে যে প্রসিদ্ধ মহাকাব্যকে বোঝায়, সে নাম ফেরদৌসীর দেয়া নয়। *শাহনামার* শ্লোক বা চরণ সংখ্যা ৬০ হাজার। কথিত আছে যে, ফেরদৌসী নিজেও এই সংখ্যাটির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি *শাহনামার* শ্লোকের সংখ্যা ছয় বীভার (প্রতি দশ হাজারের অর্থ ১ বীভার) বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

'শাহনামা' ফারসি শব্দ। এর অর্থ 'রাজাদের বই'। ফেরদৌসী (৯৩৭-১০২০ খ্রি.) ৯৭৭ থেকে ১০১০ সালের মধ্যে ৩০ বছরের অধিক সময় ব্যয় করে এই মহাকাব্য রচনা করেন। *শাহনামা* হচ্ছে প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন কাব্যগাথা। এতে ৯৯০টি অধ্যায় এবং ৬২টি কাহিনি রয়েছে। সমগ্র মহাকাব্যে ৬০ হাজার বার অন্ত্যমিল আছে। *শাহনামা* ৭ খণ্ডে রচিত হয়েছে। এর ছন্দ প্রকরণ হচ্ছে ফাউলুন, ফাউলুন, ফাউনুল ও ফাউল। ফারসি ভাষার প্রসিদ্ধ ছন্দরীতির ছকে দ্বিপদী কাব্যে এটি রচিত হয়েছে। কারণ এই রীতিটি কাহিনি কাব্যের জন্য খুবই উপযোগী। ফেরদৌসীর কাহিনিকাব্যের রীতিটি হচ্ছে- তিনি শুরুতে 'বারআতে ইস্তেহ্লাল' (শুরুতে মূল বিষয় উপস্থাপনা) ধরনের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, যা মূলত বর্ণিতব্য কাহিনি সম্পর্কে ফেরদৌসীর মতামতের নির্যাস। সাধারণত মানবীয় মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। কখনো কখনো সেখানে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাবধারাও উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন- *শাহনামায়* 'রুস্তম ও সোহরাব' এবং 'রুস্তম ও ইস্ফান্দিয়ার'-এর কাহিনির শুরুতে এই নিয়মটি অনুসৃত হয়েছে। *শাহনামায়* সমুন্নত কাব্যরীতি ছাড়াও পৌরাণিক কাহিনি বর্ণনায় আমানতদারি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি, রণাঙ্গন, বীরযোদ্ধাদের পরিচিতি বর্ণনা এবং উপদেশ, নীতিকথা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তির উপস্থাপনা লক্ষণীয়। অবশ্য ফেরদৌসী *শাহনামায়* কাহিনি বর্ণনায় যে শিল্প সৌকর্যের অবতারণা করেছেন, তা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। *শাহনামায়* উপমা-উৎপ্রেক্ষা, দৃশ্যপট ও কল্পচিত্রের কেন্দ্রীয় বিষয়টি হচ্ছে বীরত্ব ও সাহাসিকতা। কাজেই প্রাকৃতিক ও বীরত্বব্যঞ্জক উপমা-উৎপেক্ষা হচ্ছে *শাহনামার* অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও উপজীব্য বিষয়। উল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়াও রূপকথা পরিচিতি, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ও *শাহনামায়* প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।[২]

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত *শাহনামার* খণ্ডটি কাচের প্রদর্শনী আধারে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। এতে ১৯টি চিত্রকর্ম রয়েছে। পাখির পালকের তৈরি নিব দ্বারা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত লিপিকলা (Calligraphic Art) লিখিত হয়েছে। এতে সোনালী, নীল ও কমলা রঙের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

---

[১] আহ্মাদ তামীমদারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪

আলোকচিত্র ৪.২০: পাণ্ডুলিপি-*শাহনামা*

উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির একটি চিত্রকর্মে তুরানের রাজা আফরাসিয়াব ও রুস্তমের পৌত্র বার্জুকে ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।[১] চিত্রের জমিনে যুদ্ধের আবহ বিরাজমান। কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে যুদ্ধরত অবস্থায় লক্ষ করা যায়। চিত্রকর্মে মোট ১৪ জন মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। এদের সকলেই অশ্বারোহী এবং যোদ্ধার সাজে সজ্জিত। সকলের মস্তকে রয়েছে শিরস্ত্রাণ। চিত্রকর্মে লাল, হলুদ, নীল, সবুজ ও বেগুনী রঙ প্রাধান্য পেয়েছে। এর অঙ্কনশৈলী, লিপিকলা, রঙ ও বিন্যাসে পারসিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বিদ্যমান।

চিত্রিত শাহনামা

(সংগৃহীত নম্বর: ই- ২২০০, ২১৯৯, ২২০৩, ২২০৪, ২১৯৮, ২২০১, ২২০৫, ২২০২, ২২০৬, ২২০৭, ২২০৮)

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে 'চিত্রিত শাহনামা'র ১১টি মিনিয়েচর চিত্র সংরক্ষিত রয়েছে। বস্তুত এগুলো ছিল পাণ্ডুলিপি চিত্র। *শাহনামা*র কাহিনি অবলম্বনে চিত্রগুলো অঙ্কিত হয়েছে। এই চিত্রকর্মগুলোর চিত্রকরের নাম পাওয়া যায়নি। তবে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, এগুলোর লিপি-শিল্পী ছিলেন কোল নিবাসী আবদুর রহমান চিশতী। অধ্যাপক নাজমা খান মজলিশের লেখায় 'কোল'

[১] Enamul Haque, Islamic Art in Bangladesh (Catalogue of A Special Exhibition in Dacca Museum, April 3-28, 1978), Dacca: Dacca Museum, 1978, p. 19.

সম্বন্ধে একটি বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায়। তিনি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের রচনা থেকে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের উত্তর প্রদেশের আধুনিক আলিগড়ের একটি প্রাচীন অঞ্চলের নাম 'কোল'।[১]

আলোকচিত্র ৪.২১: চিত্রিত শাহনামা-১

আলোকচিত্র ৪.২২: চিত্রিত শাহনামা- ২

আলোচ্য চিত্রকর্মগুলোর প্রতিটির পরিমাপ ১২×৭.৩৭৫ ইঞ্চি। এগুলোর মূল পাণ্ডুলিপির সংগৃহীত নম্বর ছিল ২৮৫২।[২] সাফাভী ও মুঘল চিত্রশৈলীর চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছে আলোচ্য চিত্রকর্মসমূহে। *শাহনামার* কাহিনি অনুসারে এগুলোতে অনেক চরিত্রের সমাগম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঘোড়সওয়ার, যোদ্ধা, যুদ্ধের ময়দান, উত্তোলিত পতাকা, যুদ্ধে আহত ও নিহত সেনাপতি, তীরন্দাজ, রাজসিক হাতি এবং ঘোড়া প্রভৃতি বিষয়বস্তু ও অনুষঙ্গের সমাবেশে চিত্তাকর্ষক একটি আবহ নির্মিত হয়েছে চিত্রকর্মসমূহে। এগুলোর অঙ্কনশৈলী, অনুপুঙ্খতা, রং ও বিন্যাস শিল্পীর মুনশিয়ানার সাক্ষ্যবহ।

---

[১] Irfan Habib, *The Atlast of the Mughal Empire,* Najma Khan Majlis, 'Islamic Paintings in Dhaka', *Dhaka: Capital of Islamic Culture in the Asian Region for 2012* (ed. Firoz Mahmud, Shahida Khatun), Dhaka: Bangla Academy, 2012, p. 139

[২] Enamul Haque, *op. cit.,* p. 20

আলোকচিত্র ৪.২৩: চিত্রিত শাহনামা-৩

আলোকচিত্র ৪.২৪: চিত্রিত শাহনামা- ৪

শাহনামার পাণ্ডুলিপি মোতাবেক ১৬৬৫ থেকে ১৬৭৫ শ্লোকের মধ্যে একটি কাহিনি বর্ণিত আছে। এই কাহিনিতে তিনটি প্রধান চরিত্র রয়েছে। কাহিনির প্রধান চরিত্র (বস্তুত সমগ্র শাহনামার প্রধান চরিত্র) বীর 'রুস্তম' ৫০০ বছরের অধিক বয়সের অধিকারী। অপর চরিত্র ইসফান্দিয়ার হচ্ছেন লৌহমানব, অর্থাৎ রৌপ্য দেহবিশিষ্ট বীরপুরুষ। যিনি যারতুশত ধর্মের প্রবক্তা এবং রুস্তমের প্রতিপক্ষ। তিনি যেমন রাজপুত্র ঠিক তেমনি বীরপুরুষও। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ দ্বৈত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। তাঁর একমাত্র প্রত্যাশা হলো, নিজের বীরত্ব ও বিক্রমের সাহায্যে রাজত্ব লাভ করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হন। গুশতাসাব হচ্ছেন লুহরাসাবের পুত্র এবং ইসফান্দিয়ারের পিতা। তিনি পিতা হবেন নাকি বাদশাহ হবেন এমন জটিল পরিস্থিতির মাঝে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তত্ত্বজ্ঞানী 'জামাসাব' বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও জেনে-শুনেই তিনি ইসফান্দিয়ারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন। এসব চরিত্র ছাড়াও এই কাহিনিতে আরো কয়েকটি চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে উল্লিখিত তিনটি চরিত্রের গুরুত্বই সর্বাধিক।[১]

[১] আহ্‌মাদ তামীমদারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫

আলোকচিত্র ৪.২৫: চিত্রিত শাহনামা- ৫

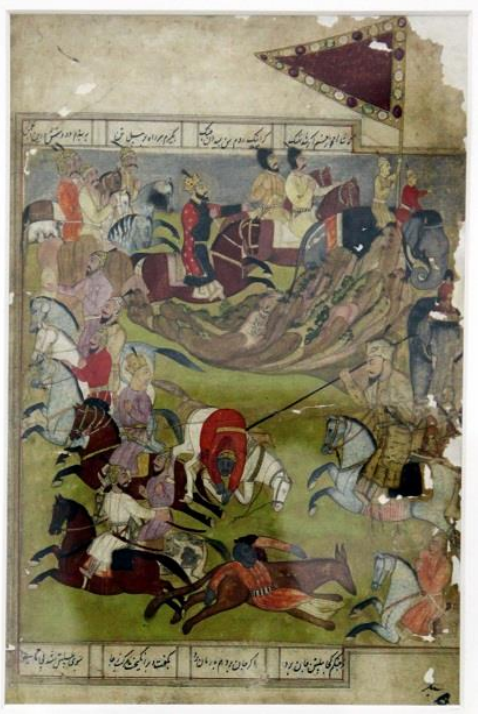

আলোকচিত্র ৪.২৬: চিত্রিত শাহনামা- ৬

চিত্রিত শাহনামার আলোচ্য **১১**টি চিত্রকর্মও এরূপ কাহিনি অবলম্বনে সৃষ্ট। কাহিনির ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে আরো উপকাহিনি। প্রকৃত প্রস্তাবে, *শাহনামা* মুঘল চিত্রকলার এক বিশেষ নিদর্শন।

আলোকচিত্র ৪.২৭: চিত্রিত শাহনামা- ৭

আলোকচিত্র ৪.২৮: চিত্রিত শাহনামা- ৮

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণাগারে আরো কিছু আকর মুঘল চিত্রকর্ম রয়েছে। যৌক্তিক বিবেচনায় এগুলো একক চিত্র বলে ধারণা করা যায়। চিত্রকর্মগুলোর বিষয়বস্তু বর্ণিত হল।

ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম গাজী-উদ-দ্বীন হায়দারের প্রতিকৃতি (১৮৩৪-১৮৪৩ খ্রি.):

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৮২)

আলোকচিত্র ৪.২৯: ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম গাজী-উদ-দ্বীন হায়দারের প্রতিকৃতি (১৮৩৪-১৮৪৩ খ্রি.)

গাজী-উদ-দ্বীন হায়দার ছিলেন ঢাকার সর্বশেষ নায়েব-ই-নাজিম।[১] ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত ঢাকায় নায়েব-নাজিম পদ বহাল ছিল। তন্মধ্যে যাঁরা ১৭৬৫ থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত, তাঁরা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী এবং যাঁরা ১৮২২ থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত, তাঁরা উপাধিধারী এবং পেনশনভোগী ছিলেন।[২] এই তথ্যের ভিত্তিতে গাজী-উদ-দ্বীন হায়দার উপাধিধারী এবং পেনশনভোগী নায়েব-ই-নাজিম হিসাবে

---

[১] 'নায়েব' একটি ফারসি শব্দ। এর অর্থ প্রতিনিধি। কোনো কর্মকর্তা যিনি অন্য কোনো কর্মকর্তা বা প্রশাসকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করেন, অথবা যিনি কারও অনুপস্থিতিতে বা পরিবর্তে কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন তাঁকে 'নায়েব' বলা হয়। মুঘল আমলের শেষ দিকে কোনো অনুপস্থিত কর্মকর্তার জায়গায় কাজ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নায়েব বলা হতো। বাংলায়, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, কোনো অনুপস্থিত সুবাদার বা নাজিমের পক্ষে কর্ম পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি 'নায়েব' বলে অভিহিত হতেন। 'নায়েব' থেকে 'নওয়াব' শব্দের উৎপত্তি। উল্লেখ্য, মুর্শিদকুলী খান (১৭১৬-১৭২৭ খ্রি.) ও তৎপরবর্তী বাংলায় প্রত্যেক সুবাদারের নামের পূর্বে নওয়াব শব্দটি যুক্ত হতো।
আবদুল করিম, 'নায়েব', *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ খণ্ড ৫ (প্রধান সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, পৃ. ৭৮.

[২] আবদুল করিম, *মোগল রাজধানী ঢাকা* (বাংলা অনুবাদ: মোহাম্মদ মুহিবউল্ল্যাহ ছিদ্দিকী), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ১৯

বিবেচ্য। আলোচ্য চিত্রকর্মে চেয়ারে উপবিষ্ট ঢাকার শেষ নায়েব-নাজিমের একটি বিশেষ মুহূর্তকে ধরা হয়েছে।

ছবির একমাত্র এবং প্রধান চরিত্রই তিনি। তাঁকে চিত্র-জমিনের ঠিক মধ্যভাগে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর আসনের দুপাশে তেপায়া বিশিষ্ট টেবিলে দুটি ফুলদানি শোভা পাচ্ছে। গাজী-উদ-দ্বীন হায়দারের পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাদামাটা। তাঁর মস্তকে রয়েছে সাধারণ মানের টুপি। দেহাবয়ব কিছুটা প্রলম্বিত এবং শীর্ণকায় হওয়ার ফলে নায়েব-নাজিমের প্রতিকৃতির মধ্যে একপ্রকার বিষণ্ন ভাবের দেখা মেলে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গাজী-উদ-দ্বীন হায়দার 'পাগলা নওয়াব' রূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে ১৮৪৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিদারুণ অর্থাভাব ও কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি এত অমিতব্যয়ী ছিলেন যে, সরকারকে তাঁর জমিদারি একজন প্রতিনিধির হাতে তুলে দিতে হয়েছিল। তিনি উত্তরাধিকারীহীনভাবে মারা গেলে নায়েব-ই-নাজিম পদটি বিলুপ্ত হয়। এরপর তাঁর সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করা হয়।[১] সে সময় ঢাকার মদন মোহন বসাক পরিবার অনেক জিনিস ক্রয় করে নেয়। তাঁদের জন্মাষ্টমীর মিছিলে নায়েব-নাজিমের জমকালো হাওদাটি ব্যবহার করা হতো। এছাড়াও ঢাকার অনেক ধনী পরিবার তাঁদের পারিবারিক অলঙ্কারসমূহ ক্রয় করে নেয়।[২]

আলোচ্য চিত্রকর্মে প্রাদেশিক মুঘল রীতির আমেজ আছে। এতে বাড়তি কোনো জৌলুস নেই। ঢাকার শেষ নায়েব-ই-নাজিমের প্রতিকৃতি হিসাবে এর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নুসরত জঙ্গ বাহাদুরের প্রতিকৃতি (১৭৮৫-১৮২২ খ্রি.):

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৮৩)

ঢাকার নায়েব-ই-নাজিমগণের মধ্যে নওয়াব সৈয়দ আলী খান বাহাদুর নুসরত জঙ্গ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রতিকৃতি চিত্রের সূত্র ধরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি ছিলেন নওয়াব জেসারত খানের (১৭৬৫-১৭৭৮ খ্রি.) দ্বিতীয় পৌত্র। নুসরত জঙ্গ অত্যন্ত শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। চারুশিল্পের প্রতি বিশেষত চিত্রকলার প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। লিপিবিশারদ হিসাবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।[৩]

---

[১] কে এম করিম, 'নায়েব নাজিম', *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ খণ্ড ৫ (প্রধান সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, পৃ. ৮১

[২] রফিকুল ইসলাম রফিক, *যুগে যুগে ঢাকার ঈদমিছিল*, ঢাকা: রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৪, পৃ. ৪৮

[৩] রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০১ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৭৭

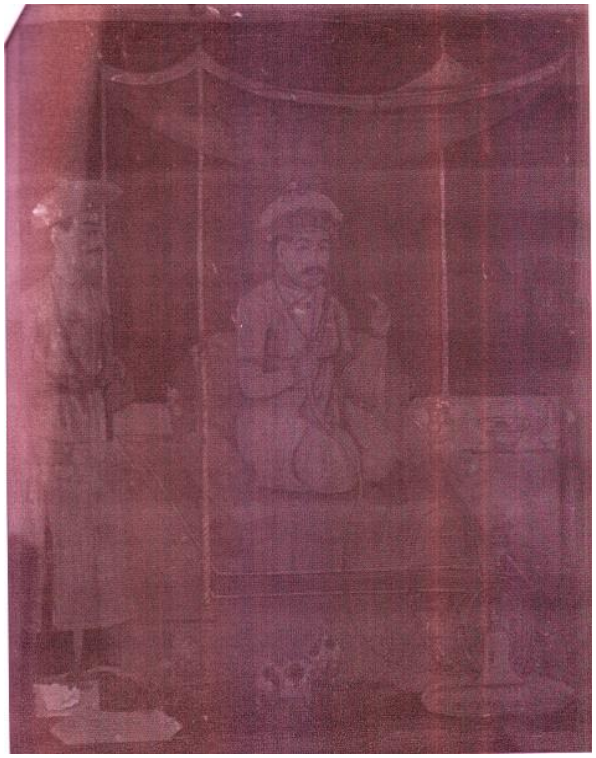

আলোকচিত্র ৪.৩০: ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নুসরত জঙ্গ বাহাদুরের প্রতিকৃতি (১৭৮৫-১৮২২ খ্রি.)

নুসরত জঙ্গ কর্তৃক রচিত হয় ঢাকা তথা বাংলার একটি অসমাপ্ত ইতিহাস *তারিখ-ই-নুসরত জঙ্গি*। ফারসি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থের পুরো নাম *তারিখ-ই-নুসরত জঙ্গি রিসালা দরবায়ন আহ্‌ল জাহাঙ্গীরনগর*। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক ইংরেজ বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে কিন্তু গবেষকদের মতে ঢাকার ইংরেজ আবাসিক প্রতিনিধি জন টেলর-এর অনুরোধে *তারিখ-ই-নুসরত জঙ্গি* রচনা করেন। গ্রন্থটিতে রচনাকালের উল্লেখ নেই। মুঘলদের ঢাকা অধিকারের পর থেকে গ্রন্থটির রচনাকাল পর্যন্ত ইতিহাস এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। *তারিখ-ই-নুসরত জঙ্গি* সম্ভবত বাংলা অঞ্চলের লিখিত প্রথম স্থানীয় ইতিহাস।[১]

নুসরত জঙ্গ তাঁর আমলে ঢাকার মুহররম মিছিল এবং ঈদ মিছিলের চিত্র অঙ্কনের জন্য শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। সেসব চিত্রমালায় মিছিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় অঙ্কিত হয়েছে। নওয়াব নুসরত জঙ্গ পাশ্চাত্য চিত্রকলার সমঝদার ছিলেন। ঢাকার কালেক্টার চার্লস ড'য়লি ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে নুসরত জঙ্গের সঙ্গে দেখা করেন। নওয়াবের তখন ষাট বছর বয়স। ড'য়লি নওয়াবের আচার-ব্যবহার ও চিত্রানুরাগের বিশেষ তারিফ করেছেন। নুসরত জঙ্গের প্রাসাদ প্রাচ্য

[১] দেলওয়ার হাসান, 'তারিখ-ই-নুসরত জঙ্গি', *ঢাকা কোষ* (সম্পাদক: শরীফ উদ্দিন আহমেদ), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ২১৩

রীতিতে সজ্জিত হলেও তাঁর দরবারের দেয়ালের পাশ্চাত্য চিত্রকর্মের অনেক সংগ্রহ ছিল। তিনি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। হোসেনী দালানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[১]

নওয়াব নুসরত জঙ্গের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রে নওয়াবকে মসনদে উপবিষ্ট অবস্থায় অঙ্কন করা হয়েছে। তাঁর ডান হাতে গড়গড়ার নল ধারণকৃত আছে। বাম হাতে একটি ফুল শোভা পাচ্ছে। মসনদের আরামপ্রদ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। মসনদের উপরে শামিয়ানা টাঙানো রয়েছে। নওয়াবের খুব নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন একজন উজির। যেন নওয়াবের কোনো হুকুম শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। নওয়াবের মুখাবয়বে দীর্ঘ গোঁফ আছে। তাঁর পরিধানে রয়েছে মুঘল পোশাক-পরিচ্ছদ এবং মস্তকে রয়েছে নওয়াবি পাগড়ি।

বস্তুত নুসরত জঙ্গের দরবারের একটি বিশেষ মুহূর্তই হচ্ছে এই চিত্রকর্মের উপজীব্য। প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার অনুসরণে এটি অঙ্কিত হয়েছে।

তৈমুরের প্রতিকৃতি:

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত 'তৈমুরের প্রতিকৃতি' শীর্ষক মুঘল চিত্রকর্মটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। দিগ্বিজয়ী তৈমুর ৯ এপ্রিল ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে সমরখন্দের অদূরবর্তী কেশ নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আমীর তুরঘাই এবং মাতা ছিলেন তাকিনাহ্ খাতুন। তৈমুরের পিতা তুর্কিদের বারলাস গোত্রের গুরখান শাখার একজন দলপতি ছিলেন।[২]

প্রথম জীবনে তৈমুরের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। দিগ্বিজয়ীদের সূতিকাগার মধ্য-এশিয়ায় তিনি ছিলেন সামান্য কিছু জমি ও গৃহপালিত পশুর সামান্য একজন মালিক মাত্র। তৈমুর ছিলেন না আলেকজান্ডারের মতো কোনো রাজপুত্র বা চেঙ্গিস খানের মতো কোনো দলপতির পুত্র। জীবনের সূচনাতেই দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার পেয়েছিলেন মেসিডোনিয়ার অধিবাসীদের বশ্যতা এবং চেঙ্গিস খান পেয়েছিলেন মোঙ্গলজাতির আনুগত্য। কিন্তু তৈমুর লঙকে সংগ্রহ করে নিতে হয়েছিল তাঁর নিজ অনুগত বাহিনী। তারপর তিনি বিজয় লাভ করেন প্রায় আধা-জাহানের সৈন্যবাহিনীর ওপর।[৩]

'তৈমুর' শব্দের অর্থ 'লৌহ'। জীবনের প্রাথমিক পর্বে কোনো এক দুর্ঘটনার ফলে তৈমুর তাঁর ডান হাত ও ডানপায়ে গুরুতর আঘাত পান। এরপর তিনি চিরদিনের জন্য খোঁড়া হয়ে যান। ফারসি

---

[১] রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[২] Percy Molesworth Sykes, *History of Persia,* London: Macmillan and Company Limited, 1921, p. 120

[৩] হ্যারল্ড ল্যাম্ব, *দিগ্বিজয়ী তৈমুর* (বাংলা অনুবাদ: আবুল কালাম শামসুদ্দীন), ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ, ২০১১, পৃ. ৭ (সূচনা)

ভাষায় 'ল্যাঙ্গ' শব্দের অর্থ খোঁড়া। একথা সত্য যে, কেবলমাত্র নিন্দাচ্ছলেই তাঁকে তৈমুর লঙ বলা হতো। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি অবশ্য তৈমুরল্যান নামেই সমধিক পরিচিত।[১]

তৈমুরের সঠিক কূলনির্ণয় একটি দুরূহ ব্যাপার। কারণ তৈমুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বা বংশের কোনো বিশেষ নাম ছিল না। এছাড়া তিনি নিজেও কোনো রাজকীয় উপাধি ধারণ করেননি। এশিয়ার ঐতিহাসিকগণ তাঁকে 'আমীর তৈমুর গুরিগান' বলে অভিহিত করেছেন। 'গুরিগান' শব্দের বাংলা অর্থ 'গৌরবময়'। তৈমুর মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। চাঘতাই মোঙ্গলদের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল। ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের মুঘলগণ ছিলেন তৈমুরেরই পৌত্রবংশীয়।[২]

আলোকচিত্র ৪.৩১: তৈমুরের প্রতিকৃতি

আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রে আমীর তৈমুরকে মসনদে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর পরিধানে বাদশাহি পোশাক-পরিচ্ছদ এবং মস্তকে পারসিক পাগড়ি রয়েছে। মসনদে আরামদায়ক তাকিয়া রাখা আছে। তৈমুরের ডান হাতে গড়গড়ার নল ধারণকৃত রয়েছে। বাম হাত কটিদেশের কাছে রাখা। পায়ের কাছে খাপসহ তরবারি লক্ষ করা যায়। তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়বে উন্নততর ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। পরিধানের রাজসিক শেরওয়ানি ও আচকান তাঁকে দারুণ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তৈমুরের গলায় রয়েছে মূল্যবান মণিমুক্তার মালাবিশেষ।

গৃহতলে বিছানো নকশাদার পারসিক গালিচা চিত্রের জমিন ও পরিসর বিভাজনে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। গালিচার ওপর গড়গড়ার পাত্র রক্ষিত আছে। তৈমুরের মসনদের ওপর শামিয়ানা

---

[১] আশরাফউদ্দিন আহমেদ, *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস*, ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৩, পৃ. ৯৮-৯৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

টাঙানো রয়েছে। মসনদের পেছনে ঈষৎ তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন তৈমুরের জনৈক উজির। আলোচ্য চিত্রকর্মে রঙের ব্যবহার, বিন্যাস এবং অঙ্কনশৈলীতে সুস্পষ্ট মুনশিয়ানার ছাপ আছে। যা দরবারি মুঘল চিত্রকলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৮৮)

মুঘল সাম্রাজ্যের পঞ্চম বাদশাহ ছিলেন আবুল মুজাফ্ফর-শাহাব-উদ-দ্বীন মুহম্মদ শাহজাহান (১৬২৮-১৭০৭ খ্রি.)। আলোচ্য চিত্রকর্মে তিনিই মূল কুশীলব। দণ্ডায়মান অবস্থান থাকা শাহজাহানের দুই-তৃতীয়াংশ দেহাবয়ব এতে অঙ্কিত হয়েছে। বাদশাহের ডান হাতে শাহি তরবারি ধারণকৃত আছে। বাম হাতে রয়েছে ফুল। বাদশাহি শেরওয়ানির কারুকাজ ও রত্নখচিত পাগড়ির জৌলুশ দেখে শাহজাহানের সৌন্দর্যপিয়াসী মন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাঁর মস্তকের পেছনের আলোকবলয়টি বাদশাহের ক্ষমতা, রাজশক্তি ও মর্যাদার প্রতীকস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। ছবির নীচের দিকে আছে নকশাখচিত মসনদ-সীমানা। শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত শাহজাহানের পার্শ্বপ্রতিকৃতি বস্তুত তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সময়কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলোকচিত্র ৪.৩২: মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতি

বাদশাহ শাহজাহান জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী হিসাবে ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি জাহাঙ্গীরের এক রাজপুত স্ত্রীর গর্ভে ১৫৯২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় খুররম। মেবার এবং আহমদনগর অভিযানে তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পিতা জাহাঙ্গীর তাঁকে 'শাহজাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন।[১] 'শাহজাহান' ফারসি শব্দ। এর অর্থ 'পৃথিবীর বাদশাহ'।

বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর আমলেই মুঘল সাম্রাজ্য ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এই সময় ভারতবর্ষ কোনো বিদেশি শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত বা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। বস্তুত উত্তরাধিকারের যুদ্ধের পূর্বে কেউই বাদশাহের সঙ্গে বিরোধে যেতে সাহস করেনি। শাহজাহানের রাজত্বকালে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে ভারতে বিদেশি ব্যবসা দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে। ইউরোপের সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যের দ্বারা ভারতের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সত্যিকার অর্থে এই সময় ছিল একটি উন্নতির যুগ। জমি ছিল উর্বর এবং রাষ্ট্রের আয়তন ছিল বিপুল।[২]

শাহজাহান ভারতের সকল শাসকদের মধ্যে একজন অসামান্য গুণসম্পন্ন বাদশাহ ছিলেন। একজন অনন্য স্থপতি ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর আমলে পারস্য-ভারতীয় নমুনার স্থাপত্য শিল্প সর্বোচ্চ বিকশিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাজমহল, শাহজাহানাবাদ বা দিল্লির লালকেল্লা, মোতি মসজিদ, দিওয়ান-ই-খাস, দিওয়ান-ই-আম, দিল্লি জামে মসজিদ, হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার এবং আগ্রার ঈদগাহ প্রসিদ্ধ।

শাহজাহান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তুর্কি, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। লিপিশিল্প (Calligraphy), চিত্রশিল্প ও সংগীতের জন্যও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। বলা হয়ে থাকে, কিছু বাদ্যযন্ত্র তিনি কৌশলের সঙ্গে বাজাতে জানতেন। তাঁর দরবারি কারখানায় নির্মিত বিভিন্ন প্রকারের আকর্ষণীয় বাদ্যযন্ত্রসমূহ তাঁর সৃজনীশক্তির পরিচয় বহন করে। প্রকৃতিগতভাবে তিনি শিল্প ও সৌন্দর্যের গভীর অনুরাগী ছিলেন। এছাড়া পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতেন।[৩]

বাদশাহ শাহজাহানের জীবন ঐশ্বর্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনের বিয়োগান্তক কাহিনি সবকিছুকে মর্মন্তুদ বেদনায় ঢেকে দেয়। শাহজাহানের সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী ছিলেন আরজুমান্দ বানু বেগম তথা

---

[১] কে এম করিম, 'শাহজাহান', *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ খণ্ড ৯ (প্রধান সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, পৃ. ৩২৩

[২] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১১ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২১৬

[৩] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-২১৮

মমতাজ মহল (প্রাসাদের আলো)। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহানের সঙ্গে মমতাজ মহলের বিবাহ হয়। ৩৯ বছর বয়সে চতুর্দশতম সন্তান প্রসবের সময় মমতাজ মহল বোরহানপুরে ৭ জুন ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১] প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে শাহজাহান গভীর শোকে ভেঙে পড়েন। তিনি এতো শোকাভিভূত হয়েছিলেন যে রাতারাতি তাঁর সব চুল ও শ্মশ্রু সাদা হয়ে গিয়েছিল। এ সময় শাহজাহানের বয়স ছিল মাত্র ৩৮ বছর। দু'বছর তিনি ভালো খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংগীত থেকে দূরে থেকেছেন। সকল প্রকার আনন্দ, বিনোদন ও বিলাসিতা বর্জন করেছেন।

মমতাজ মহলকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহান তাজমহল নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ সময় থেকে তিনি ক্রমশ স্বাভাবিক হতে থাকেন। ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাজমহলের নির্মাণ ও সাজসজ্জার কাজ সমাপ্ত হয়। বলা হয়ে থাকে, তাজমহলের নির্মাণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে গভীর দুঃসময়ে। তাই তাজমহল হলো বেদনার এক অনন্য স্মারক।[২] শাহজাহান ও মমতাজের স্মৃতিকে অমর করে তাজমহল সারা দুনিয়াবাসীর কাছে আজো সমুজ্জল হয়ে আছে।

বাদশাহ শাহজাহানের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রে তাঁর সাদা-শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়ব বাদশাহের দুঃসময়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শাহজাহানের প্রতিকৃতি চিত্র অধিকাংশই জাঁকজমকপূর্ণ। সে তুলনাই উক্ত প্রতিকৃতি চিত্র প্রায় সাদামাটা এবং অনাড়ম্বর। এ যেন শাহজাহানের দুঃসময়ের স্মৃতিকে ধারণ করে আছে।

একজন শ্মশ্রুধারী অভিজাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৮৯)

মুঘল চিত্রকলায় মসনদে বা আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রধানত বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহদের দেখা যায়। এছাড়াও অভিজাত ব্যক্তি, দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীদেরও উপবিষ্ট অবস্থার চিত্রকর্ম লক্ষণীয়। আলোচ্য চিত্রকর্মে বিশ্রামরত একজন অভিজাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। তিনি একটি আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। আরামপ্রদ তাকিয়ায় ঈষৎ হেলান দিয়ে উদাসমনে তিনি কিছু ভাবছেন। চিত্রকর্মে তাঁর পার্শ্বপ্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি পাশ ফিরে বসে আছেন। তাঁর উপবেশনের নির্ধারিত পরিসরে সুন্দর নকশার দেখা মেলে। এতে পারসিক ও ভারতীয় নকশার সংমিশ্রণ রয়েছে। ফুল ও লতাপাতায় অঙ্কিত এই নকশা।

---

[১] Bamber Gascoigne, *op. cit.*, Pp. 175-176; মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫-২০৬.

[২] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

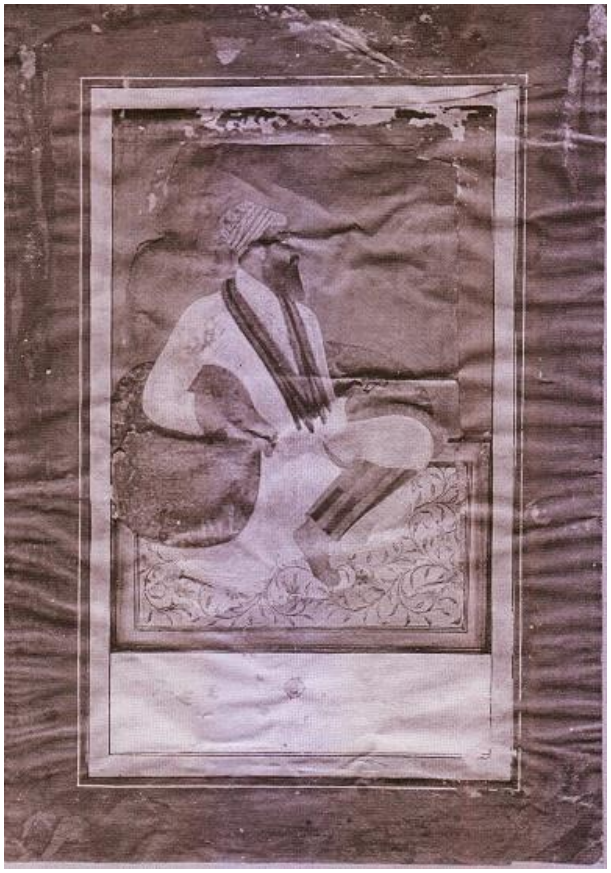

আলোকচিত্র ৪.৩৩: একজন শ্মশ্রুধারী অভিজাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি

অভিজাত ব্যক্তির মুখাবয়ব শ্মশ্রুমণ্ডিত। তাঁর গলায় উত্তরীয় ঝুলানো আছে। মস্তকে রয়েছে একটি সাধারণ পাগড়ি। মুঘল সমাজে অভিজাত ব্যক্তিবর্গের যাপিত জীবন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। কারণ তাঁদের অবস্থান ছিল বাদশাহ ও আমীর ওমরাহদের পরেই। আলোচ্য চিত্রকর্ম যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

হারেম দৃশ্যঃ

(সংগৃহীত নম্বরঃ ২১৯২)

আলোচ্য চিত্রকর্মে প্রাসাদের অন্তঃপুরের একটি নাটকীয় দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। ধারণা করা যেতে পারে যে, এতে জনৈক শাহজাদা ও তাঁর স্ত্রীর একটি অনুপম মুহূর্তকে প্রতিভাত করা হয়েছে। তাঁদের পেছনে একজন পরিচারিকার উপস্থিতি লক্ষণীয়। শাহজাদার মস্তকে মুঘল পাগড়ি শোভা পাচ্ছে। তাঁর পরিধানে রয়েছে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, যা মসলিন বস্ত্রের বলে অনুমিত। এছাড়া গলায় আছে মূল্যবান মণিমুক্তার মালা। শাহজাদার স্ত্রীর পরিধানে রয়েছে মুঘলাই ঘাগরা।

আলোকচিত্র ৪.৩৪: হারেম দৃশ্য (সংগৃহীত নম্বর: ২১৯২)

তাঁদের প্রাসাদের সাথে লাগোয়া একটি শুভ্র দ্বিতল ভবন লক্ষ করা যায়। এই ছবির অঙ্কনরীতিতে প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এছাড়া ছাদের সীমানা-প্রাচীরে পারসিক ও ভারতীয় নকশার সংমিশ্রণযুক্ত জালিকার নির্মিতি সবিশেষ লক্ষ করা যায়।

হারেম দৃশ্য:

(সংগৃহীত নম্বর: ২১৯৬)

আলোচ্য চিত্রকর্মটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। উল্লম্ব বিন্যাসে অঙ্কিত এই ছবির উপরিভাগের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশজুড়ে রয়েছে মুঘল নগর। মনে হতে পারে, দিল্লি বা আগ্রার ভূ-দৃশ্য। এই ভূ-দৃশ্যে বাদশাহি দুর্গ, বাগান, সাঁকো প্রভৃতি অনুষঙ্গের দেখা মেলে। দুপাশের দুটি দুর্গ থেকে হাতি ও ঘোড়ার সারি নিয়ে যোদ্ধারা ধাবমান রয়েছেন। সাঁকোর নীচে হ্রদের জলে ভাসছে শাহি বজরা। ছবির ভূ-দৃশ্য মুর্শিদাবাদেরও হতে পারে।

আলোকচিত্র ৪.৩৫: হারেম দৃশ্য (সংগৃহীত নম্বর: ২১৯৬)

চিত্রের নিম্নভাগের এক-তৃতীয়াংশ পরিসরে ছয়জন নারী শিল্পীকে দেখা যায়। তাঁদের হাতে সেতার, ঢোল, তানপুরাসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। এই পরিসরটি বস্তুত একটি প্রাসাদের ছাদ-চত্বর। অর্থাৎ এই ছাদ থেকেই অবলোকন করা যাচ্ছে নগরের ভূ-দৃশ্য।

চিত্রের সামগ্রিক বিন্যাস, বিষয়বস্তু এবং এর অনুপুঙ্খ কাজ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মুর্শিদাবাদ শৈলীর সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে।

ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম হাসমত জঙ্গের প্রতিকৃতি (১৭৭৮-১৭৮৫ খ্রি.):

(সংগৃহীত নম্বর: ২২০৯)

এই ছবিতে ডিম্বাকৃতির বা উপবৃত্তাকার (oval) পরিসরের মধ্যে ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম হাসমত জঙ্গের আবক্ষ প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে। হাসমত জঙ্গ ছিলেন নওয়াব জেসারত খানের (১৭৬৫-১৭৭৮ খ্রি.) পৌত্র। জেসারতের মৃত্যুর পরে হাসমত জঙ্গ বাহাদুরকে ভারতের গর্ভনর লর্ড কর্নওয়ালিস ঢাকার নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। তিনি সাত বছর ঢাকার প্রশাসক ছিলেন

(১৭৭৮-১৭৮৫ খ্রি.)। ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে হাসমত জঙ্গ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে নওয়াব জেসারত খানের কবরের পাশে দাফন করা হয়।[১]

আলোকচিত্র ৪.৩৬: ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম হাসমত জঙ্গের প্রতিকৃতি (১৭৭৮-১৭৮৫ খ্রি.)

হাসমত জঙ্গের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রে তাঁর নওয়াবি শানশওকত উপলব্ধি করা যায়। হাসমত জঙ্গের শাহি পোশাক-পরিচ্ছদ, মূল্যবান রত্ন-পাথরযুক্ত পাগড়ি, মণিমুক্তার মালা প্রভৃতি অনুষঙ্গ তার সাক্ষ্যবহ। খানদানি গোঁফসমেত হাসমত জঙ্গের প্রতিকৃতি চিত্রে প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ঢাকার নওয়াব-ই-নাজিম নুসরত জঙ্গের প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ২২১০)

নওয়াবি মসনদে ঢাকার নায়েব নাজিম নুসরত জঙ্গ (১৭৮৫-১৮২২ খ্রি.) উপবিষ্ট রয়েছেন। আলোচ্য চিত্রকর্মে এই হচ্ছে মূল উপজীব্য বিষয়। নুসরত জঙ্গের ডান হাতে গড়গড়ার নল এবং বাম হাতে একটি ফুল ধারণকৃত আছে। তাঁর মস্তকে জাঁকজমকপূর্ণ পাগড়ি রয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদে নওয়াবি আদর্শ লক্ষ করা যায়। এছাড়া গলায় রয়েছে মণিমুক্তার মালা। নুসরত জঙ্গের পুরু গোঁফসমেত মুখাবয়বে একপ্রকার দশাসই আমেজ আছে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে স্থিরতা ও গভীর চিন্তার আভাস

[১] রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

লক্ষণীয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, নুসরত জঙ্গ তাঁর বিবিধ গুণাবলী ও কৃতিত্বের জন্য ঢাকার নায়েব নাজিম হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন।

আলোকচিত্র ৪.৩৭: ঢাকার নওয়াব-ই-নাজিম নুসরত জঙ্গের প্রতিকৃতি

নুসরত জঙ্গের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্র বস্তুত রেখাপ্রধান। অর্থাৎ এর মধ্যে বলিষ্ঠ অঙ্কনই মুখ্য। ছবিটি অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ছবিটি এরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

একজন শাহজাদার প্রতিকৃতি (অজ্ঞাত):

(সংগৃহীত নম্বর: ২২১১)

আলোচ্য চিত্রকর্মে জনৈক শাহজাদাকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। বিলাসবহুল মসনদের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শাহজাদা বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর দেহাবয়বের পুরোটাই প্রায় সম্মুখভাগ অবস্থানে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ পার্শ্ব অবস্থানে লক্ষণীয়। শাহজাদার মস্তকে টুপি এবং পরিধানে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ বিদ্যমান। ধারণা করা যায়, এগুলো মখমল বস্ত্র দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

আলোকচিত্র ৪.৩৮: একজন শাহজাদার প্রতিকৃতি (অজ্ঞাত)

ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম কমর-উদ-দৌলাহর প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ২২১২)

কমর-উদ-দৌলাহ (১৮৩১-১৮৩৪ খ্রি.) ছিলেন নওয়াব শামসুদ্দৌলার (১৮২২-১৮৩১ খ্রি.) পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে কমর-উদ-দৌলাহ নায়েব-নাজিম পদ নিয়ে গদিতে আরোহণ করেন। কমর প্রথম বিবাহ করেছিলেন নুসরত জঙ্গের কন্যা কুদসিয়া বেগমকে। পরে তিনি তাঁর আস্তাবলের রক্ষক মীর জীয়নের সুন্দরী কন্যা হুসেনি বেগমকে বিবাহ করেন। ফলে মীর জীয়ন নওয়াব এবং তাঁর সম্পত্তির ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। নওয়াব কমর-উদ-দৌলাহ অত্যধিক পানাসক্ত ছিলেন। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য ব্যাপারেও দোষ ছিল। এর পরিণতিতে মহাজনের কাছে তাঁর সম্পত্তি বাধা পড়ে। অত্যধিক মদ্যপান তাঁর মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন করে। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র বায়ান্ন বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হোসেনী দালানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

[১] রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

আলোকচিত্র ৪.৩৯: ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম কমর-উদ-দৌলাহর প্রতিকৃতি

কমর-উদ-দৌলাহর আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্র দরবারি মুঘল চিত্রশৈলীর আদর্শে প্রাদেশিক মুঘল রীতিতে অঙ্কিত হয়েছে। কমরের মস্তকে রয়েছে অনুপম নওয়াবি পাগড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদ পূর্ববর্তী নওয়াবের মতোই সাদামাটা। গোঁফসমেত মুখাবয়ব সম্মুখ থেকে বাম দিকে কিছুটা পাশ ফেরানো। অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিকৃতি দেখা যায়। কমরের ডান হাত কটিদেশের কাছে রাখা আছে। গলায় রয়েছে মূল্যবান রত্ন-পাথরের মালা। ছবির পটভূমি শূন্য এবং সমতল।

এই চিত্রকর্মটিও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

নাদির শাহের প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ১৯১২৫)

আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রটি পারস্যের আফশারিদ বংশের দিকপাল, দিগ্বিজয়ী বীর নাদির শাহের (১৭৩৬-১৭৪৭ খ্রি.)। তিনি ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানের কালা কুহ্না নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইমাম কুলি ছাগলের চামড়া দ্বারা পোশাক তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নাদির শাহের প্রকৃত নাম ছিল নাদির কুলি। পারস্যের সিংহাসন লাভ করার পর তিনি নাদির শাহ উপাধি ধারণ করেন। নাদির কির্কলু গোত্রের লোক ছিলেন। কিন্তু এই গোত্রের লোকসংখ্যা অল্প থাকায় তাঁরা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। পরবর্তীতে কির্কলু গোত্রের লোকেরা আফশার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এজন্য নাদির শাহ আফশার গোত্রীয় বলেই পরিচিত। মেষ-চালক হিসাবে নাদির তাঁর শৈশব জীবন শুরু করেন।[১]

নাদির শাহ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, দুঃসাহসী এবং বিচক্ষণ। শূন্য থেকে তিনি বাদশাহ হন। তাঁর জীবন ছিল রোমাঞ্চকর এবং বর্ণাঢ্য। নাদির শাহের রাজ্য বিস্তারের মধ্যে তাঁর ভারতবর্ষ বিজয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নাদির ভারত আক্রমণ করেন। ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য এবং ধন-সম্পদের কথা নাদিরের জানা ছিল। এসবের লোভে তিনি ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। পারস্যে দীর্ঘকাল আভ্যন্তরীণ অরাজকতা বিরাজমান থাকার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছিল। ফলে নাদিরের সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। এই আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নাদির ভারত আক্রমণ করেন। দিল্লিতে এই সময় মুঘল বাদশাহ ছিলেন মুহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি.)। তিনি ছিলেন দুর্বলচেতা বাদশাহ। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নাদির শাহের বাহিনী ও মুঘল বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র দুই ঘন্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে মুঘল বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে মুঘলগণ হস্তিবাহিনী ব্যবহার করেছিল। কিন্তু পারসিকদের অগ্নিগোলক নিক্ষেপের ফলে হস্তিগুলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করে। বাদশাহ মুহম্মদ শাহ তাঁর নিশ্চিত পরাজয়ের কথা বুঝতে পেরে নাদির শাহের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নাদির শাহের দিল্লি আক্রমণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক রক্তাপ্লুত মর্মন্তুদ ঘটনা। নাদিরের কাছে মুহম্মদ শাহ পরাজিত হওয়ার ফলে ভারতে মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। এর ফলে সাময়িকভাবে মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। নাদির শাহ ভারত থেকে অগণিত ধনরাশিসহ বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত বিশ্বখ্যাত ময়ূর সিংহাসন (তখ্ত্-ই-তাউস) ও অমূল্য কোহিনূর মণিও তাঁর হস্তগত করে পারস্যে নিয়ে গেলেন।[২]

---

[১] আশরাফউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

[২] প্রাগুক্ত পৃ. ৪২৮-৪২৯

৫৭ দিন অবস্থানের পর নাদির শাহ দিল্লি ত্যাগ করেন। এর পূর্বে তিনি মুহম্মদ শাহকে সিংহাসনে রেখে যান। এর বিনিময়ে বাদশাহ মুহম্মদ শাহ সিন্ধু নদীর পশ্চিমের প্রদেশগুলো পারস্যের কাছে ছেড়ে দেন। এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত হলো কাশ্মীর থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এবং থাট্টা প্রদেশ ও তাঁর অধীনস্থ দুর্গসমূহ। বস্তুত নাদির শাহের ভয়ানক আক্রমণের আঘাতে মুহম্মদ শাহ ও তাঁর পারিষদবর্গ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। দু'মাস পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য একপ্রকার কার্যবিহীন ছিল। এই আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতিসহ এর পতনকে ত্বরান্বিত করে।[১]

আলোকচিত্র ৪.৪০: নাদির শাহের প্রতিকৃতি

নাদির শাহের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রে তাঁকে মসনদে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর পরিধানে রয়েছে পারসিক শেরওয়ানি। তিনি খাপ খোলার কায়দায় দু'হাতে তরবারি ধারণ করে আছেন। নাদির শাহের মস্তকে রয়েছে পারসিক-সাফাভি পাগড়ি। মস্তকের পেছনে পটভূমিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে সোনালি আলোক বলয়। যা নাদিরের শক্তি, ক্ষমতা ও বীরত্বের প্রতীক স্বরূপ। মসনদে রয়েছে আরামদায়ক তাকিয়া ও একটি সোনালি রঙের জলপাত্র। নাদির শাহের দেহাবয়ব এবং প্রতিকৃতি পার্শ্ব থেকে অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়বে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার ছাপ লক্ষ করা যায়। চিত্রের

[১] মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

পটভূমিতে- লাল, নীল ও কমলা রঙের সমতল বিন্যাস ব্যতীত কোনো অনুষঙ্গ নেই। এতে পারসিক ও মুঘল চিত্রশৈলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে।

নাদির শাহের শেষ জীবন ছিল ব্যর্থতা ও হতাশায় নিমজ্জিত। ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দাগেস্তানের বিদ্রোহী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে শায়েস্তা করতে অগ্রসর হয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন তিনি স্বগোত্রীয় কজন আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন।[১]

উল্লেখ্য, নাদির শাহ দিগ্বিজয়ী হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেও মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে খলচরিত্র হিসাবে কুখ্যাত হয়ে আছেন।

ঢাকার জলরংঃ

(সংগৃহীত নম্বর: ২৮৬০)

'ঢাকার জলরং' শীর্ষক চিত্রকর্মগুলো বস্তুত দুটি বিষয়কে ভিত্তি করেই অঙ্কিত হয়েছে। যথা- (ক) ঈদের মিছিল ও (খ) মুহররম মিছিল।

ঈদের মিছিল ঢাকার নিমতলী প্রাসাদ থেকে শুরু হয়ে তৎকালীন বড় সড়ক ও রাজপথগুলো অতিক্রম করতো এবং মুহররমের মিছিল ঢাকার বিখ্যাত ইমামবাড়া হোসেনী দালান থেকে শুরু হতো। চিত্রকর্মগুলো গভীর পর্যবেক্ষণ করে জানা যায়, নায়েব-নাজিমের ঈদ ও মুহররম মিছিলে নবাব কাটরা, দেওয়ান বাজার, হোসেনী দালান, বকশী বাজার, বেগম বাজার, বেচারাম দেউরী, বড় কাটারা, ছোট কাটারা, চকবাজার, গিরদা উর্দু রোড এইসব মহল্লাসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

একাধিক চিত্রকর্মে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মিছিলের সামনের সারিতে নায়েব নাজিম নুসরত জঙ্গ হাতির পিঠে উপবিষ্ট হয়ে মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বরদার (বাহক) কৃত্রিম মুক্তা ও রৌপ্য-তারের অলঙ্কারযুক্ত শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক ছাতা তার উপরে তুলে ধরেছেন। লাল মখমলের অনুপম বস্ত্র ও নানা বর্ণের জরি দ্বারা হাতিসমূহ সুসজ্জিত হয়েছে। এছাড়া ঘোড়সওয়ার, উটসওয়ার ও পালকি বাহকদের দেখা মেলে। মিছিলের মধ্যে জমকালো লাল, নীল, হলুদ, সবুজ নানা বর্ণের শত শত সিল্কের নিশান অনবদ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। মিছিলে নওয়াবদের সুসজ্জিত বাদ্যযন্ত্রের শিল্পীগণ বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোল, বাঁশি, কাড়া, নাকাড়া ও শিঙা চোখে পড়ে। ঈদ মিছিলে হাতির পিঠে হাওদায় উপবিষ্ট হয়ে নায়েব নাজিম নুসরত জঙ্গ বাহাদুর অভিবাদন জানাচ্ছেন। তাঁর পেছনের হাতিতে নওয়াবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শামসুদ্দৌলাহকে অবলোকন করা যায়। নওয়াবদের সঙ্গে হাতির পিঠে সওয়ার হয়েছেন ঢাকার জমিদার ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

[১] আশরাফউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০-৪৩১

নওয়াবদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া তৎকালীন ঢাকায় বসবাসরত কিছু বিদেশি ব্যক্তিকে মিছিলের মধ্যে লক্ষ করা যায়।[১]

আলোকচিত্র ৪.৪১: ঢাকার জলরং- ১

আলোকচিত্র ৪.৪২: ঢাকার জলরং- ২

[১] রফিকুল ইসলাম রফিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬

আলোকচিত্র ৪.৪৩: ঢাকার জলরং- ৩

কর্মকর্তারা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তৎকালীন ঢাকায় বসবাসরত কিছু বিদেশি ব্যক্তিকে মিছিলের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

আলোকচিত্র ৪.৪৪: ঢাকার জলরং- ৪

ঢাকার নায়েব নাজিমগণ মুঘলদের অনুসরণে জাঁকজমকপূর্ণ ঈদ ও মুহররমের মিছিলের ব্যবস্থার করতেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁদের সৌখিনতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধেও ধারণা পাওয়া যেত। সম্ভবত নায়েব-নাজিমরা যখন থেকে নিমতলি প্রাসাদে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন (আঠারো শতকে), তখন থেকেই এই দুই মিছিলের শুরু। ঢাকার ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের মতে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার নায়েব-নাজিমদের বংশ লুপ্ত হয়ে গেলে ঈদ ও মুহররমের মিছিলেরও সমাপ্তি ঘটে। কারণ ধনাঢ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নত রুচিবোধ ব্যতীত এ ধরনের মিছিল সংগঠিত করা দুরূহ ছিল।[১]

চিত্রকর্ম থেকে আরও অনুধাবন করা যায় যে, তৎকালীন ঈদের রাজকীয় মিছিল আনন্দের রঙে ঝলমল করে উঠত। হাতির পিঠে জমকালো হাওদায় সওয়ার হতেন নওয়াবি দরবারের রাজপুরুষগণ। মিছিলে শুধু দরবারের লোকজন অংশ নিতেন। সাধারণ মানুষ এখানে শুধুই দর্শক। রাস্তার দু'ধারে এবং ইমারতের ছাদে দাঁড়িয়ে জনসাধারণ মিছিলের দৃশ্য অবলোকন করতো।

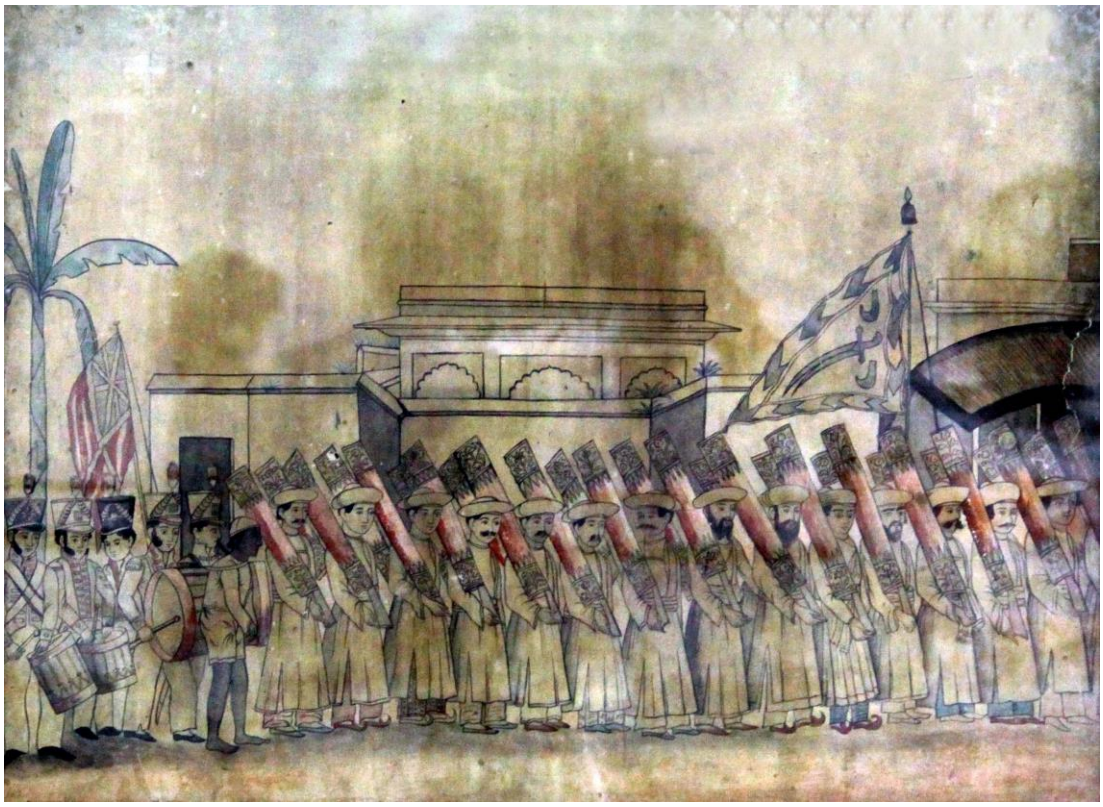

আলোকচিত্র ৪.৪৫: ঢাকার জলরং- ৫

[১] মুনতাসীর মামুন, 'ইতিহাসের আলোকে ঢাকার ধর্মীয় উৎসব', *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল*, দ্বিতীয় খণ্ড- অর্থনীতি ও সংস্কৃতি (সম্পাদক: এম মোফাখখারুল ইসলাম ও ফিরোজ মাহমুদ), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২, পৃ. ৩০৯

নওয়াবের হাতির পেছনে অশ্বারোহীর দলকে রাজকীয় ব্যান্ডের তালে তালে চলতে দেখা যায়। সুসজ্জিত আরব্য ঘোড়াগুলো যেন পা থামাতে চায় না। মিছিলের বিপুল শানশওকত দেখে জনসাধারণ মুগ্ধ। নগরের বিভিন্ন ইমারতের ছাদে দাঁড়িয়ে মিছিলের দৃশ্য অবলোকন করছেন সাধারণ নারী-পুরুষ। আতর, গোলাপ আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। মিছিল দেখতে আসা লোকজন ছড়িয়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো গোলাপ-পাপড়ি। হাতির পিঠে উপবিষ্ট নওয়াবের চারপাশে এসব পাপড়ি ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার ধারে ভিক্ষুক হাত উঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে। রাজপুরুষদের পথে আশরাফী বিতরণ করতে দেখা যায়।[১]

আলোকচিত্র ৪.৪৬: ঢাকার জলরং- ৬

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, শিল্পী আলম মুসাব্বির আলোচ্য ঈদ ও মুহররম মিছিলের চিত্রকর্মসমূহ অঙ্কন করেছেন। এগুলোতে উনিশ শতকের ঢাকার সমাজচিত্র, নওয়াবি আমলের শানশওকত এবং আবহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছে।

দেশীয় কাগজে অঙ্কিত এই চিত্রকর্মসমূহে প্রধানত লাল, হলুদ, সবুজ, বাদামী ও কালো রঙের দেখা মেলে। মুঘল চিত্রশৈলী ও ইউরোপীয় বাস্তববাদী চিত্ররীতির সংমিশ্রণে এগুলো অঙ্কিত হয়েছে।

[১] রফিকুল ইসলাম রফিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

শিল্পানুরাগী ঢাকার নায়েব নাজিম নুসরত জঙ্গের পৃষ্ঠপোষকতায় অঙ্কিত আলোচ্য ঈদ ও মুহররম মিছিলের চিত্রকর্মসমূহ তাঁর আমলের স্মৃতি ধারণ করে আছে।[১] কালের প্রকোপে এগুলোর রং অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। উনবিংশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবনের দলিল হিসাবে এবং নওয়াবি আমলের সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ উপাদান হিসাবে এই চিত্রকর্মসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। এই চিত্রকর্মসমূহে মূলত দুটি শৈলী সংমিশ্রণ হয়েছে। অর্থাৎ এগুলোতে মুঘল ও ইউরোপীয় বাস্তববাদী শৈলীর মিশ্রণ দেখা যায়। অবশ্য প্রধানত মুঘল চিত্র শৈলীর প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত মিছিলের আবহ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং এর বর্ণনাত্মক আমেজ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য মুঘল চিত্রকলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪.৩ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের বিষয়বস্তুঃ

মুঘল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের আবক্ষ প্রতিকৃতিঃ

(সংগৃহীত নম্বরঃ ভি আর এম- ২৭৭৬)

আলোকচিত্র ৪.৪৭: মুঘল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের আবক্ষ প্রতিকৃতি

[১] Najma Khan Majlis, 'Dhaka in Early Nineteenth Century Paintings', *Dhaka: Past Present Future* (ed. Sharif Uddin Ahmed), Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2009, Pp. 425-426.

মুঘল প্রতিকৃতি চিত্র হিসাবে আলোচ্য চিত্রকর্মটির অনুপম সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব রয়েছে। চিত্রকর্মে লক্ষ করা যায় সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের অপরূপ সুন্দর মুখাবয়ব। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে অতুলনীয় অবস্থানে আছে তাজমহল। যাঁর জন্য এই অভূতপূর্ব সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল, তিনি ইতিহাসে মমতাজ মহল নামে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আলিয়া বেগম আরজুমান্দ বানু। ১৫৯৩ সালে আগ্রা শহরে আরজুমান্দ বানু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আসফ খান ছিলেন বাদশাহ আকবরের অন্যতম মন্ত্রী মির্জা গিয়াস বেগের পুত্র। আরজুমান্দের মাতা দিওয়ানজী বেগম ছিলেন পারস্যের উচ্চবংশীয় রাজ সভাসদের কন্যা। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মির্জা গিয়াস বেগ (পরবর্তীকালে ইতিমাদ-উদ-দৌলা) প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন এবং তাঁর পুত্র আসফ খান অন্যতম সেনাপতি হিসাবে নিয়োজিত হন।[১]

মমতাজ মহলের আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রটি উপবৃত্তাকার (oval) পরিসরে হাতির দাঁতের ফলকের ওপর অঙ্কিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, মমতাজ মহল কিছুটা উদাস দৃষ্টিতে শূন্যে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে আভিজাত্যের ছাপ। পোশাক-পরিচ্ছদে রয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ মসলিনের তৈরি মুঘল জামা। মমতাজের মস্তক আবৃত আছে মূল্যবান রত্ন-পাথর ও কারুকার্য সমৃদ্ধ মুকুট দ্বারা।

মুকুটের চূড়ায় রয়েছে তিনটি গোলাপকুঁড়ির ন্যায় অলঙ্কারের ফুলবিশেষ। দু'পাশে আছে দু'টি ঝুমকা ফুলের অলঙ্কার। মমতাজ মহলের কর্ণে মূল্যবান পাথরযুক্ত দীর্ঘাকায় দুল ঝুলে আছে। তাঁর গলায় মূল্যবান পাথর ও মণিমুক্তা সমৃদ্ধ স্বর্ণালঙ্কার এবং মুক্তার মালা। মমতাজ মহল সম্রাজ্ঞীর আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। সেখানে আরামদায়ক তাকিয়া রাখা আছে। তাঁর ডান হাত কনুই থেকে ভাঁজ হয়ে কিছুটা উর্ধ্বে উঠে বক্ষের কাছাকাছি গিয়ে থেমেছে। বাম হাতও কনুই থেকে ভাঁজ হয়ে চিবুকের কাছে এসেছে। বাম হাতে একটি গোলাপ ফুল ধারণকৃত আছে। মমতাজ মহল ফুলের খুশবো নিচ্ছেন বলে ধারণা করা যায়। তাঁর কেশবিন্যাস কয়েকটি বেণী আকারে দুই স্কন্ধে নেমে এসেছে। মমতাজ মহলের পরিধেয় জামায় পারসিক ও ভারতীয় নকশার চমৎকার কারুকাজ আছে। তাঁর কোলের ওপর একটি সুদৃশ্য হাতপাখা। চিত্রের পটভূমি নির্বস্তুক এবং সমতল। নীলচে ধূসর রঙের পটভূমির সম্মুখভাগে মমতাজের আবক্ষ প্রতিকৃতি সুচারুরূপে ফুটে উঠেছে। এতে লাপিস লাজুলি পাথরের নীল রং সহ বিভিন্ন মূল্যবান রং ব্যবহৃত হয়েছে। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহের মধ্যে আলোচ্য মমতাজ মহলের প্রতিকৃতি চিত্রটি এক অমূল্য নিদর্শন।

১৬১২ সালে উনিশ বছরের অপরূপ রূপসী আরজুমান্দ তথা মমতাজ মহলের বিবাহ হয় শাহজাদা খুর্‌রমের (পরবর্তীকালে বাদশাহ শাহজাহান) সঙ্গে। বিবাহের পর থেকেই আরজুমান্দ বানু ও খুররমের গভীর প্রেম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খুররমের নিত্যসঙ্গী, বন্ধু ও পরামর্শদাতা হলেন

[১] শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৭৪

আরজুমান্দ। খুররমের সঙ্গে তিনি রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। এমনকি বিদ্রোহী হয়ে বাংলাদেশে গমন করলে আরজুমান্দ বানু খুররমের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।[১]

মমতাজমহল ছিলেন উচ্চশিক্ষিত মহিলা। তিনি আরবি ও ফারসি সাহিত্যচর্চা করতেন। ফারসি ভাষায় তিনি কবিতা লিখতেন। গুণী লেখকদের তিনি সমাদর করতেন। মমতাজ ছয় কন্যা ও আট পুত্রের জন্ম দেন। এঁদের মধ্যে কেবল সাতজন জীবিত ছিল।[২]

মমতাজ মহলকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে গিয়ে বাদশাহ শাহজাহানও অমর হয়ে আছেন। মৃত্যুর পর মমতাজমহলকে প্রথমে বুরহানপুরের জাইনাবাদ উদ্যানে দাফন করা হয়েছিল। ছয় মাস পর তাঁর মরদেহ পুনরায় অস্থায়ী সমাধি হতে আগ্রায় আনা হয়। আগ্রায় মমতাজের সমাধির জন্য এক টুকরো জমি নির্বাচন করা হয়। জমিটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। বস্তুত এই জমিটি ছিল রাজা মানসিংহের নাতি জয়সিংহের একটি মনোরম বাগান।[৩] এই বাগানটি বাদশাহ শাহজাহানকে উপহার দেয়া হলো। এর পরিবর্তে বাদশাহ একটি অনুপম প্রাসাদ রাজা জয়সিংহকে উপহার দিয়েছিলেন। উল্লিখিত বাগানে অর্থাৎ যমুনার তীরেই স্থায়ীভাবে সমাহিত হলেন সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে মমতাজ মহল ও শাহজাহানের সুমহান প্রণয়গাথাকে শ্বেতপদ্মের ন্যায় তাজমহল দুনিয়ার বুকে অমর করে রেখেছে।

ইতিমাদ উদ-দৌলার প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ভি আর এম- ২৬৩১)

আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রটি মুঘল ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ইতিমাদ উদ-দৌলার। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মির্জা গিয়াস বেগ। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি 'ইতিমাদ উদ-দৌলা' নামে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। ফারসি এই নামের অর্থ 'রাষ্ট্রের স্তম্ভ'। তিনি পারস্যের একটি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আকবরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬

[২] শাহরিয়ার ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৮

[৩] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মির্জা গিয়াস প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। মোটকথা, ইতিমাদ উদ-দৌলা ও তাঁর পরিবার মুঘল রাজদরবারের উল্লেখযোগ্য সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারগুলোর অন্যতম ছিল।[১]

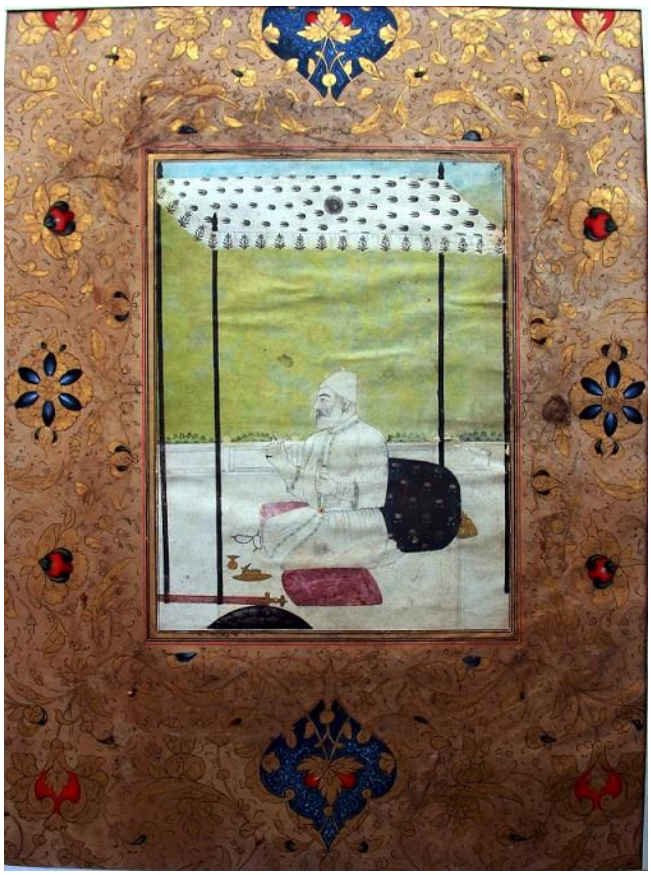

আলোকচিত্র ৪.৪৮: ইতিমাদ উদ-দৌলার প্রতিকৃতি

ইতিমাদ উদ-দৌলার আলোচ্য প্রতিকৃতি চিত্রে তাঁকে উপবিষ্ট অবস্থায় অঙ্কন করা হয়েছে। তাঁর পরিধানে রাজসিক পোশাক-পরিচ্ছদ এবং মস্তকে মন্ত্রী পদমর্যাদার পাগড়ি আবৃত রয়েছে। ইতিমাদ উদ-দৌলার শ্মশ্রুশোভিত মুখাবয়ব পার্শ্ব থেকে অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর মসনদে একটি আরামদায়ক তাকিয়া ও তরবারির দেখা মেলে। মসনদের উপরে শামিয়ানা স্থাপন করা হয়েছে। মসনদ থেকে একটু দূরেই আছে মর্মর প্রস্তরের সীমানা প্রাচীর।

এই চিত্রকর্মের প্রান্তসীমা ঘিরে আছে অত্যন্ত চমৎকার হাশিয়া। এতে তরল সোনার রং অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া লাপিস লাজুলি পাথরের নীল রং দ্বারা ফুলেল নকশা অঙ্কন করা হয়েছে।

এই চিত্রকর্মে প্রায় সকল কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইতিমাদ উদ-দৌলার দেহাবয়ব ও প্রতিকৃতি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এটি শুধু কালো রঙের রেখাচিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। স্পষ্ট ধারণা করা যায়, এটি

[১] শাহরিয়ার ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

অসম্পূর্ণ চিত্রকর্ম। সম্ভবত, মুঘল রাজদরবারের চিত্রশালায় এটি অঙ্কন করা হয়েছে। এতে চিত্রকরের দক্ষতা ও বিশিষ্টতা অনুমান করা যায়।

বাদশাহ শাহজাহানের (দ্বিতীয়) প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ভি আর এম- ২৬৩২)

শাহজাহান (দ্বিতীয়) ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্বের একজন বাদশাহ (The Later Mughal)। তাঁর প্রকৃত নাম রাফি-উদ-দৌলা (শাসনকাল: জুন-সেপ্টেম্বর ১৭১৯ খ্রি.)। তিনি ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী বাদশাহ রাফি-উদ-দরাজাদের (শাসনকাল: ফেব্রুয়ারি-জুন ১৭১৯ খ্রি.) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দরাজাদের মৃত্যুর পর ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে রাফি-উদ-দৌলা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে ক্রীড়ানক হিসাবে সৈয়দ ভাইরা সিংহাসনে সমাসীন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষেও সাম্রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। সিংহাসনে আরোহণের মাত্র কয়েক মাস পরেই (একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১]

আলোকচিত্র ৪.৪৯: বাদশাহ শাহজাহানের (দ্বিতীয়) প্রতিকৃতি

[১] হাসান শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

শাহজাহানের (দ্বিতীয়) আলোচ্য চিত্রকর্মে লক্ষণীয় যে, বাদশাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত অনুপম এবং মূল্যবান। মসলিনের কাপড়ের ওপরে বুটিদার নকশাযুক্ত আসমানী রঙের বাদশাহি জামা নিঃসন্দেহে চমৎকার। এতে আছে কারুকাজ সমৃদ্ধ একটি কোমরবন্ধনী। বাদশাহের ডান হাতে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র আতরদানি। বাম হাত রাখা আছে উপবিষ্ট বাম হাঁটুর উপর। গলায় রয়েছে মূল্যবান মণি-মাণিক্যের মালা। মস্তক-আবৃত পাগড়িতে রয়েছে মূল্যবান রত্ন-পাথর ও পালক। বাদশাহের সিংহাসনটি চতুর্ভুজাকৃতির। সেখানে আরামদায়ক তাকিয়ায় পিঠ রেখে বাদশাহ উপবিষ্ট আছেন। তাঁর মস্তকের পেছনে একটি সোনালী আলোক-বলয় (halo), যা বাদশাহি মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতীকস্বরূপ। বাদশাহের মুখাবয়ব শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং কোমল।

গৃহতল বা মেঝেতে (floor) আছে পারসিক ও ভারতীয় নকশার সংমিশ্রণ। পেছনে সিংহাসনের সীমানা-প্রাচীরেও নকশার কারুকাজ দেখা যায়। পটভূমি শূন্য এবং সমতল। এই ছবিটি বস্তুত মুঘল দিল্লি কলমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে উল্লম্ব অবস্থানে রয়েছে বাদশাহের দেহাবয়ব। চিত্রকর্মের ওপরের অংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে।

একজন অজ্ঞাত মুঘল অমাত্যের প্রতিকৃতি:

(সংগৃহীত নম্বর: ভি আর এম-২৬৭৫)

আলোচ্য চিত্রকর্মে একজন মুঘল অমাত্যকে (অজ্ঞাত) উপবিষ্ট অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। নকশাদার অনুপম মসনদে অমাত্য উপবিষ্ট হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর ডান হাত কোলের ওপর রয়েছে। বাম হাতে একটি ফুল ধারণকৃত আছে। চিত্রের পটভূমি নির্বস্তুক এবং সমতল। এতে বাদামী বর্ণের আধিক্য দেখা যায়। এই ছবির অপরাপর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ মনে হলেও অমাত্যের দেহাবয়ব শুধু রেখাচিত্রে আবদ্ধ। খুব সম্ভবত দেহাবয়বে রঙের কাজ হয়নি। যা বস্তুত অসম্পূর্ণ।

ছবির অঙ্কনশৈলী দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি বাদশাহি চিত্রকারখানায় অঙ্কিত হয়েছে। এই চিত্রকর্মটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে।

আলোকচিত্র ৪.৫০: একজন অজ্ঞাত মুঘল অমাত্যের প্রতিকৃতি

_শাহনামা_: পাণ্ডুলিপি চিত্র

(সংগৃহীত নম্বর: ভি আর এম- ২৬৭৬, ২৬৭৭, ২৬৭৮)

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে *শাহনামা*র তিনটি পাণ্ডুলিপি চিত্রকর্ম সংরক্ষিত আছে। বস্তুত এগুলো *শাহনামা*র পাণ্ডুলিপি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া চিত্রকর্ম। ধারণা করা হয়, এই চিত্রকর্মগুলো এভাবেই সংগৃহীত হয়েছে।

*শাহনামা*র কাহিনি অবলম্বনে চিত্রকর্মগুলো অঙ্কিত হয়েছে। এতে ফারসি লিপিকলার সঙ্গে চিত্রকর্মের মেলবন্ধন ঘটেছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে যুদ্ধের দৃশ্য, ঘোড়সওয়ার, ছুরি ও ঢাল হাতে যোদ্ধাদের দেখা যায়। ছবির পটভূমিতে রয়েছে পারস্যের পাহাড়। উল্লম্ব কম্পোজিশনে চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে বিষযবস্তু ও অনুষঙ্গ। উল্লেখ্য, *শাহনামা*য় মহাবীর রুস্তম পারস্য ও পারসিকদের অবমাননা থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। বস্তুত তাঁর লড়াই ছিল মন্দের বিরুদ্ধে কল্যাণের লড়াই।

*শাহনামা*র আলোচ্য চিত্রকর্মে পারস্যের সাফাভী চিত্রশৈলী ও ভারতবর্ষের মুঘল চিত্রশৈলীর অনুপম সংমিশ্রণ ঘটেছে। এগুলোতে নীল রঙের আধিক্য রয়েছে। এছাড়া হলুদ, লাল, কালো ও বাদামী রঙের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

আলোকচিত্র ৪.৫১: *শাহনামা চিত্র-১*

আলোকচিত্র ৪.৫২: *শাহনামা চিত্র-২*

আলোকচিত্র ৪.৫৩: *শাহনামা চিত্র-৩*

৪.৪ সরকারি সা'দত কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত শাহনামার বিষয়বস্তু

মহাকবি ফেরদৌসীর অমর মহাকাব্য *শাহনামা*র উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিটি প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ফারসি লিপিকলা ও চিত্রকর্মের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে এই পাণ্ডুলিপি। সমগ্র পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে অর্ধশতাধিক চিত্রকর্ম। এতে শাহনামার কাহিনি অবলম্বনে প্রতিটি চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু বিস্তৃতি লাভ করেছে। এগুলো পারসিক ও মুঘল চিত্রশৈলীর সংমিশ্রণে অঙ্কিত হয়েছে। শাহনামার কাহিনি অবলম্বনে এতে বাদশাহ, অমাত্যবর্গ, শাহজাদা, শাহজাদী, ইমারত, যোদ্ধা, মৃগয়া, ঘোড়া, সিংহ, ড্রাগন, পাখি, মসনদ, তরবারি, ছুরি, শিরস্ত্রাণ, দৈত্য-মানব, অগ্নিকুণ্ড, পাহাড়, নিসর্গ প্রভৃতি বিষয়বস্তু ও অনুষঙ্গ অঙ্কিত হয়েছে। এতে ইসফান্দিয়ার ও রুস্তমের লড়াই, ইসফান্দিয়ারের ট্র্যাজিক-মৃত্যু, উদ্যানের পাশে মেঘের অশ্রু-ঝরার দৃশ্য, ফুলের পাপড়ির প্রস্ফুটিত হাসির পাশেই ঐন্দ্রজালিক পাখির শোকার্ত সংগীত প্রভৃতি বিষয় প্রতিভাত হয়েছে।

আলোকচিত্র ৪.৫৪: *শাহনামা*- ১ (চিত্রিত পাণ্ডুলিপি)

উল্লেখ্য, পারস্যের প্রতিরক্ষা বা সুরক্ষার জন্য রুস্তমের বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সর্বজন-বিদিত। তিনি *শাহনামা*র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। অবশ্য নারী চরিত্রের সংখ্যাও কম নয় *শাহনামায়*। তাঁদেরকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়। বিখ্যাত নারী চরিত্র রুদাবেহ, সিনদোখত, আজাদে, তাহমিনা, গের্দ অফারিদ প্রমুখ। এঁরা স্বামীর সহযোগী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও এঁদের ভূমিকা রয়েছে।

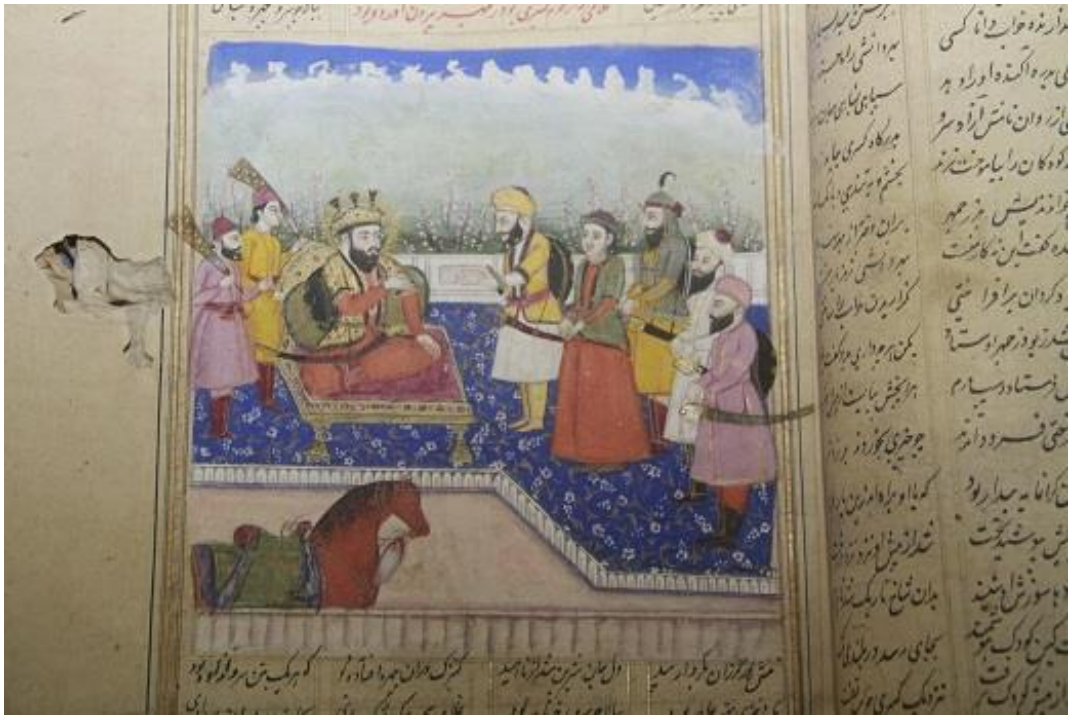

আলোকচিত্র ৪.৫৫: *শাহনামা*- ২ (চিত্রিত পাণ্ডুলিপি)

রুস্তমের মা রুদাবেহর মহানুভবতা অতুলনীয়। অপরদিকে রুস্তমের বীরপুত্র সোহরাব জন্ম নিয়েছিলেন পারসিক নারী তাহমিনার গর্ভে। গের্দ অফারিদ শাহনামার অন্যতম বিখ্যাত নারী চরিত্র। তিনি ছিলেন যোদ্ধা। সোহরাবের সঙ্গে গের্দ অফারিদের পুরুষের ছদ্মবেশে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য।

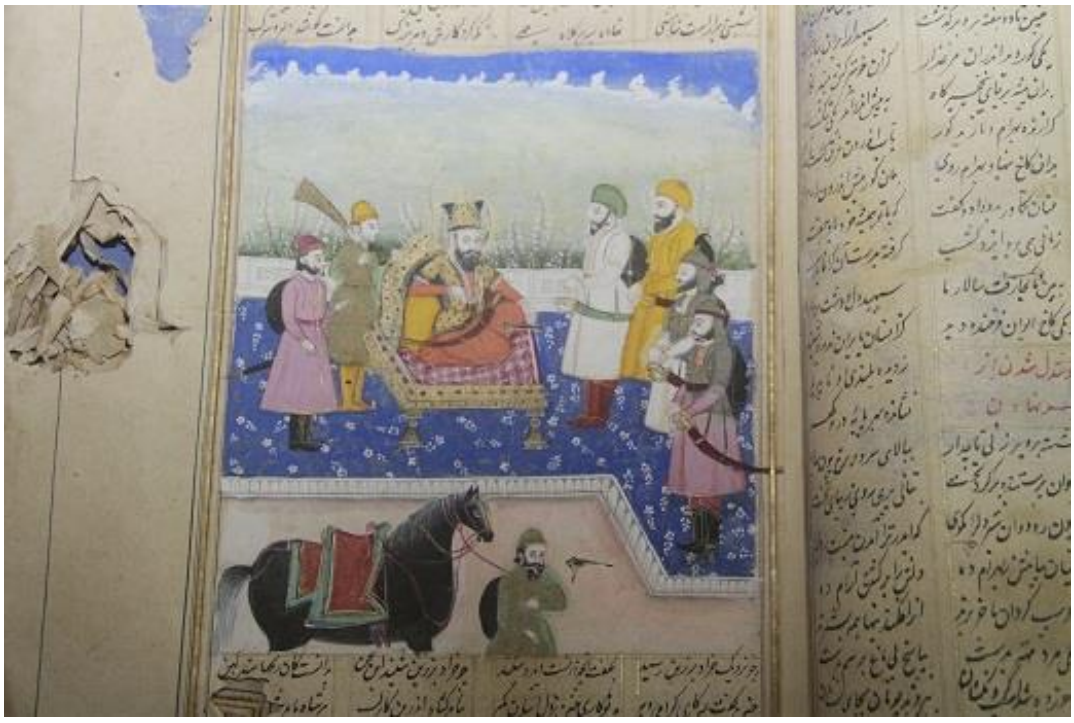

আলোকচিত্র ৪.৫৬: *শাহনামা*- ৩ (চিত্রিত পাণ্ডুলিপি)

উল্লিখিত বিষয়সমূহ শাহনামার আলোচ্য পাণ্ডুলিপি চিত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া একটি উদ্ধারকারী পৌরাণিক পাখির দেখা মেলে।

আলোকচিত্র ৪.৫৭: *শাহনামা- ৪* (চিত্রিত পাণ্ডুলিপি)

চিত্রকর্মসমূহের অঙ্কনশৈলী, রঙের ব্যবহার, বিন্যাস এবং অনুপুঙ্খ কাজ অসামান্য। এগুলোতে শিল্পীর বিশেষ মুনশিয়ানা অনুধাবন করা যায়। পারসিক ও মুঘল চিত্রশৈলীর অপূর্ব সংমিশ্রণ এসব চিত্রকর্মসমূহে পরিলক্ষিত হয়। এগুলোতে লাপিস-লাজুলি নীল, লাল ও হলুদ রঙের ব্যবহার অধিক দেখা যায়। এছাড়াও তরল সোনার রং চিত্রকর্মের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

আলোকচিত্র ৪.৫৮: *শাহনামা- ৫* (চিত্রিত পাণ্ডুলিপি)

বর্তমানে *শাহনামার* এই পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় এবং ঝুঁকির মধ্যে আছে। বেশিরভাগ চিত্রকর্ম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পাণ্ডুলিপির ওপরের ও নীচের পৃষ্ঠাসমূহ সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় আছে। অনেকগুলো পৃষ্ঠা ছিঁড়ে গেছে। তবে মধ্যভাগের কিছু পৃষ্ঠা এবং চিত্রকর্ম এখনো অক্ষত অবস্থায় আছে। এই অমূল্য পাণ্ডুলিপির যথাযথ সংরক্ষণ হওয়া অত্যন্ত জরুরী। ধারণা করা হয়, এটি মুঘল রাজদরবারের শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে।

৪.৫ মুঘল রাজধানী ঢাকা থেকে বিলুপ্ত হওয়া মুরাক্কার চারটি চিত্রকর্ম

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, এই মুঘল মুরাক্কাটি একদা মুঘল রাজধানী ঢাকায় সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি বিলুপ্ত। অধ্যাপক নাজমা খান মজলিশ আলোচ্য মুরাক্কার পরিচিতি ও কয়েকটি চিত্রকর্ম সম্বন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন।[১] বস্তুত ওই প্রবন্ধ থেকেই উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নে চিত্রকর্মসমূহের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো।

(ক) বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতিঃ

আলোচ্য চিত্রকর্মটিতে মহান মুঘল বাদশাহ শাহজাহান ও শাহজাদা শাহ আজমের (পরবর্তীকালে বাদশাহ আওরঙ্গজেব) পূর্ণাঙ্গ দেহাবয়ব ও প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়েছে।

আলোকচিত্র ৪.৫৯: বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতি

[১] নাজমা খান মজলিশ, 'মুঘল রাজধানী ঢাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া রাজকীয় একটি মুরাক্কার সন্ধানে', *সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬, পৃ. ৪০

চিত্রের প্রধান কুশীলব বাদশাহ শাহজাহান ডান দিকে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর ডান হাতে ফুল এবং বাম হাত হাঁটুর কাছে রাখা আছে। শাহজাহানের শ্মশ্রুশোভিত পার্শ্বপ্রতিকৃতিতে সৌম্য ভাব লক্ষণীয়। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে বাদশাহি রীতি অনুসৃত হয়েছে। ঘের দেওয়া মসলিন পোশাকে সোনারঙে নকশা ও কারুকাজ দেখা যায়। শাহজাহানের মস্তক শেরপেশ সম্বলিত অনুপম পাগড়ি দ্বারা আবৃত রয়েছে। তাঁর গলায় কয়েকটি মণি-মুক্তাখচিত মালা আবক্ষ পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে। চিত্রের বামদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শাহজাদা শাহ আলমগীর। তিনি পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। তিনিও আপাদমস্তক বাদশাহি পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত রয়েছেন।

এই চিত্রকর্মে মুঘল শৈলীর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রয়েছে। ধারণা করা হয়, চিত্রটি শাহজাহানের শাসনামলে রাজকীয় চিত্রকারখানায় অঙ্কিত হয়েছে।[১]

(খ) বাদশাহ ফররুখ সিয়র (অশ্বারোহী):

উল্লিখিত চিত্রকর্মে বাদশাহ ফররুখ সিয়রকে (শাসনকাল: ১৭১৩-১৭১৯ খ্রি.) অশ্বারোহী হিসাবে লক্ষ করা যায়।

আলোকচিত্র ৪.৬০: বাদশাহ ফখরুখ সিয়র (অশ্বারোহী)

[১] নাজমা খান মজলিশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

তিনি মুঘল সেনাবাহিনীর কয়েকজন দেহরক্ষী-সৈনিক সহযোগে কোনো গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ফররুখ সিয়রের শ্মশ্রুশোভিত পার্শ্বপ্রতিকৃতি মুঘল রীতিতে অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর মস্তক মূল্যবান রত্ন-পাথরখচিত পাগড়ি দ্বারা আবৃত রয়েছে। এছাড়াও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আলোকবলয় (halo) ফররুখের মস্তক ঘিরে রেখেছে। যা রাজশক্তি ও মর্যাদার প্রতীক হিসাবে বাদশাহ আকবর থেকে শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রতিকৃতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। ফররুখ সিয়রের অশ্বের পার্শ্ব থেকে ভৃত্যগণ শাহি পাখা উঁচু করে ধরে সম্মুখে এগিয়ে চলেছেন। উল্লেখ্য, বাদশাশ ফররুখ ১৭০৩-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ঢাকা শহরে অবস্থান করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। আলোচ্য চিত্রকর্মে মুঘল চিত্রশৈলী মোতাবেক অঙ্কনরীতি, বিন্যাস ও অনুপুঙ্খ কাজ পরিলক্ষিত হয়। চিত্রটি ফররুখ সিয়রের দরবারে অঙ্কিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।[১]

(গ) ফররুখ সিয়রের রাজমহিষীর প্রতিকৃতিঃ

Echos From Old Dhaka শীর্ষক মূল গ্রন্থে ফররুখ সিয়রের সহধর্মিণীর যে প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, তা পরবর্তী সংস্করণে আর ছাপা হয়নি। ফলত চিত্রকর্মটি পাওয়া যায়নি। মূল চিত্রকর্মটি ছিল একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি। যা অনেকাংশে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রতিকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফররুখ সিয়রের সহধর্মিণীর বাম হাতে ফুল ধারণকৃত আছে। তাঁর পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদে রয়েছে রাজকীয় আমেজ। পাগড়ির ন্যায় মুকুট দ্বারা তাঁর মস্তক আবৃত রয়েছে। বিলাসবহুল আসনে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন। এই শাহি ভাব-ভঙ্গি চিত্রকর্মের নান্দনিক দিক বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।[২]

[১] নাজমা খান মজলিশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৪.৬ মাদ্রাসা-ই-আলিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত *শাহনামার* পাণ্ডুলিপি চিত্র

আলোকচিত্র ৪.৬১: *শাহনামা* পাণ্ডুলিপি চিত্র- ১ (মুদ্রিত)

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, *শাহনামার* এই মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে মূল কাহিনি এবং বাকি চার ভাগে কাহিনির আলোকে চিত্রকর্ম রয়েছে। মহাকবি আবুল কাশেম ফেরদৌসির অমর মহাকাব্য *শাহনামার* শুদ্ধ ও প্রসিদ্ধতম পাণ্ডুলিপি অনুসারে এটি মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রকর্মসমূহের মুদ্রিত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে জানা যায়, এগুলো বস্তুত স্কেচধর্মী রেখাচিত্র। শুধু কালো রঙ ও রেখা নির্ভর এসব চিত্রকর্মসমূহ অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অঙ্কিত হয়েছে। পারসিক ও মুঘল চিত্রকর্মের সাথে এগুলোর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। *শাহনামার* কাহিনির নিরিখে আলোচ্য চিত্রকর্মসমূহের বিষয়বস্তু ও অনুষঙ্গ বিকাশ লাভ করেছে। এর চরিত্রসমূহ এবং পারিপার্শ্বিক আবহ কাহিনির ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে।

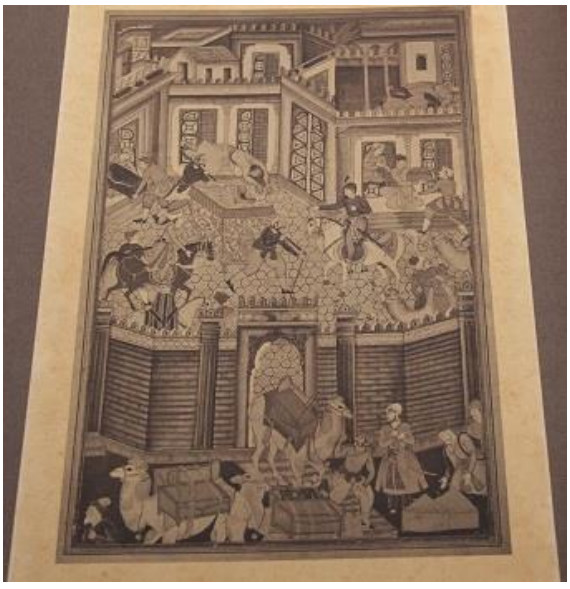

আলোকচিত্র ৪.৬২: *শাহনামা* পাণ্ডুলিপি চিত্র- ২ (মুদ্রিত)

এটি *শাহনামার* মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি হওয়া সত্ত্বেও (পারস্যের আমির-এ কায়সার প্রকাশনী থেকে ১৩৪১ হিজরিতে প্রকাশিত) ঐতিহাসিক কারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম।[১]

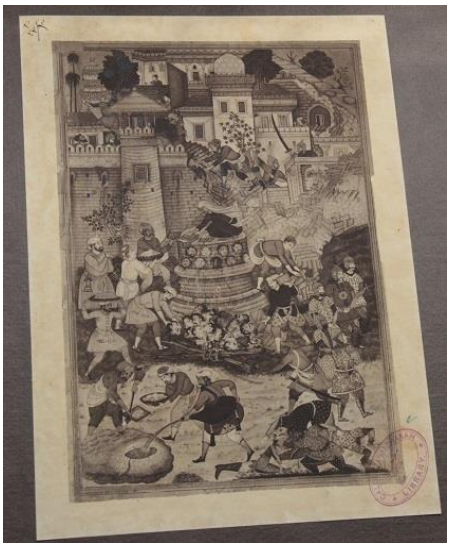

আলোকচিত্র ৪.৬৩: *শাহনামা* পাণ্ডুলিপি চিত্র- ৩ (মুদ্রিত)

আলোকচিত্র ৪.৬৪: *শাহনামা* পাণ্ডুলিপি চিত্র- ৪ (মুদ্রিত)

[১] আদিত্য মাহমুদ, 'আলিয়া মাদ্রাসায় শাহনামা', *প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০১১, ঢাকা: ২০১১.

পঞ্চম অধ্যায়

মুঘল চিত্রকলার করণকৌশল ও শৈলী বিশ্লেষণ

৫.১ মুঘল চিত্রকলার শিল্প-উপকরণ

মুঘল চিত্রকলা শুধু চিত্রশৈলী হিসেবে অনন্য তা নয়। এর শিল্প-উপকরণ, করণকৌশল, বিষয় ও শৈলীর জন্যও বিশ্ব শিল্পকলার ইতিহাসে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মুঘল চিত্রকলায় ব্যবহৃত কাগজ, রং, স্বর্ণচূর্ণ প্রভৃতি শিল্প-উপকরণ তৈরির ধাপগুলোও বেশ কষ্টসাধ্য এবং উপকরণগুলোও মূল্যবান। প্রতিটি শিল্প-উপকরণ যথাযথ নির্বাচনের পর মুঘল শিল্পীগণ চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করতেন।

(ক) কাগজ

মুঘল চিত্রকলার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট কাগজ হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। চিত্রিত পাণ্ডুলিপি, মুরাক্কা-চিত্র এবং একক চিত্রকর্মসমূহ উন্নতমানের কাগজেই অঙ্কিত হয়েছে। সুতার ক্যানভাস ও প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত কিছু সংখ্যক মুঘল চিত্রকলার উদাহরণ থাকলেও, তা অপ্রতুল। মুঘল চিত্রকলার জন্য কিছু কাগজ ভারতবর্ষে উৎপাদন করা হতো এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে কিছু কাগজ বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো।[১]

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মণ্ড দিয়ে কাগজ উৎপাদন করার উন্নত পদ্ধতি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে প্রাচীন চীনের হান সাম্রাজ্যের চাই লুন (Tsai-lun) চালু করেন। প্রাচীন ভারতের চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তালপাতা, কলাপাতা, সুপারি ও নারিকেল গাছের খোসা ভূর্জত্বক এবং অন্যান্য পাত্রে লিখিত হতো। কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখতে তাম্রফলক অথবা অন্য ধাতুফলক বা কখনো কাষ্ঠফলক ব্যবহৃত হতো। তখন কাগজকে আলেখ্য, পট এবং তুলট বলা হতো।[২] মধ্যযুগে আরবে কাগজ তৈরি হতো পাট বা শণের কাপড় থেকে। আরবে তখনো কার্পাস তুলা ও পশমি সুতা থেকে কাগজ উৎপাদন পদ্ধতি চালু হয়নি। প্রযুক্তিগত দিক থেকে মুসলমান বিশ্ব চীনের কাছ থেকে কাগজ উৎপাদনের কৌশল গ্রহণ করে। কাগজের ব্যবহার চীন থেকে অষ্টম শতকে মুসলমান বিশ্বে এবং দশম শতকে স্পেন ও বাকি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বিশ্বে প্রথম কাগজ উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় সমরখন্দে। অন্য একটি চালু হয় বাগদাদে ৭৯৪ সালে। সে সময় ছিল হারুনুর রশীদের আমল। সমরখন্দে দশম শতকে বিভিন্ন প্রকারের কাগজ তৈরি হতো। সবচেয়ে মূল্যবান ছিলো স্বর্ণচূর্ণের প্রলেপ দেয়া কাগজ।[৩]

---

[১] Moti Chandra, *The Technique of Mughal Painting*, Lucknow: The U.P. Historcal Soceity, 1949, p. 6.

[২] https://bn.m.wikipedia.org/wiki/কাগজ, Dhaka: 17 January 2017

[৩] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 7

কাগজ শব্দটি Paper শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ। প্রাচীন মিশরের 'প্যাপিরাস' নামক লেখার উপকরণের গ্রিক নাম থেকে Paper শব্দটি এসেছে। বস্তুত সে সময় প্যাপিরাস গাছের বাকল লেখার জন্য ব্যবহৃত হতো। ভারতবর্ষের কিছু রাজ্যে বিশেষত পশ্চিম ভারত কাগজ তৈরির প্রয়োজনীয় জ্ঞান আরব বিশ্ব থেকে গ্রহণ করে। উইলিয়াম রেইট, জৈন-উল-আবেদিন এবং কাশ্মীরের জনৈক শাসক ১৪২০-১৪৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সমরখন্দ থেকে ভারতে কাগজ উৎপাদনের যন্ত্র নিয়ে আসেন। কাশ্মীরে এখনো কাগজ উৎপাদন করা হয় আরব বিশ্বের অনুসরণে।[১]

আলোকচিত্র ৫.১: মুঘল চিত্রকলায় ব্যবহৃত কাগজ

ঐতিহাসিক আল আফেন্দি তাঁর *Manaqib-i-Hunarwaran* শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, সমরখন্দের তুর্কী কাগজ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং উন্নততর। সহজলভ্য ও সাধারণ মানের কাগজ দামাস্কাসে তৈরি হতো। সে সময় বিশ্বের বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত কারখানায় বিভিন্ন প্রকারের কাগজ উৎপাদন করা হতো।[২] যথা-

১. দৌলতাবাদি (Daulatabadi): এই কাগজ তৈরি করা হতো দৌলতাবাদে। এর পূর্ব নাম ছিল 'দেবাগিরি'। নিজামের শাসনাধীন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অংশে এর অবস্থান ছিল।

২. খাটায় (Khatai): উক্ত কাগজ তৈরি করা হতো খাটা অঞ্চলে। এর অবস্থান ছিল উত্তর চীনের 'ক্যাথে অব মার্কোপোলো'তে।

---

[১] Moti Chandra, *Ibid*, p. 7

[২] *Ibid*, p. 8

৩. আদিল-শাহি (Adil-Shahi): এই কাগজ পারস্যের আদিল শাহের রাজত্বে তৈরি করা হতো।

৪. হারিরি (Hariri): এটি রেশমি সুতা থেকে তৈরি কাগজ।

৫. সুলতানি (Sultani): সমরখন্দে এই কাগজ উৎপাদন করা হতো।

৬. হিন্দি (Hindi): এটি ভারতীয় কাগজ।

৭. নিজাম-শাহি (Nizam-Shahi): নিজামাবাদে এই কাগজ তৈরি করা হতো।

৮. গান্নি (Ganni): তাব্রিজ শহরে এই কাগজ উৎপাদন করা হতো। এর রঙ ছিল ঈষৎ হলুদ।

৯. নুখায়ের (Nukhayyar): জলরঙের কাগজ।

মুঘল চিত্রকলা উন্মেষের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে পারস্য থেকে কাগজ আমদানি করা হতো। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে কাগজ উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করা হয়। সেখানে উৎপাদিত কাগজ 'শিয়ালকোটি' কাগজ নামে পরিচিত। লিপিকলা এবং চিত্রকলার জন্য পারস্যের ইরানী ও ইস্পাহানী নামের দু'প্রকার কাগজ মুঘল চিত্রকরদের কাছে অত্যধিক আকর্ষণীয় ছিল। উৎকৃষ্ট মানের কাগজের পরিমাপ চিত্রাঙ্কনের উপযোগিতায় গুরুত্ববহ। যদিও আকবরের শাসনামলে এরূপ কাগজ সহজলভ্য ছিল না। সে সময় তিন ধরনের উপকরণ থেকে কাগজ উৎপাদন করা হতো। যেমন- বাঁশ থেকে যে কাগজ তৈরি করা হতো, তার নাম 'বাঁশাহা' বা 'বাঁশি' (basaha or bhansi)। এটি সহজলভ্য ছিল। পাট থেকে যে কাগজ তৈরি হতো, তার নাম 'টাটাহা' (tataha)। উৎকৃষ্ট মানের তুলা বা সুতা থেকে যে কাগজ উৎপাদন করা হতো, তাকে 'তুলোট' কাগজ বলা হতো। অল্প পরিমাণ কাগজ শণ থেকে উৎপাদন করা হতো, যার নাম ছিল 'শণী' (sanni)। কিছু শিল্পী চিত্রাঙ্কনের জন্য রেশমী কাগজ ব্যবহার করতেন। যার নাম ছিল হারিরি (harir)। এই কাগজ নির্দিষ্ট সময়ের পর ফেটে যেত।[১]

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ভারতবর্ষে কাগজ উৎপাদন কারখানার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। এই সময় উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরি হতো। কাগজ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কাঁচামাল যেমন- বাঁশ, শণ, পাট প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার করা হতো। এছাড়া রেশমি কাগজও প্রস্তুত হতো, কিন্তু তা সহজেই ফেটে যায় বলে শিল্পীরা ব্যবহার করতেন না। মুঘল আমলে ভারতের বিভিন্ন শহরে কাগজ তৈরির কাখানা গড়ে ওঠে এবং তা পরবর্তীকালেও চালু থাকে। দানাপুর, মথুরা, শিয়ালকোট, কাশ্মীর, কাল্পি, আহমেদাবাদ, দৌলতাবাদ, জুন্নার প্রভৃতি অঞ্চলে কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। সবথেকে উৎকৃষ্ট কাগজ

[১] Percy Brown, *Indian Painting under The Mughals,* New Delhi: Cosmo Publications, 2007, p. 185.

আসতো কাল্পি থেকে। এই কাগজ তৈরি করা হতো জেলেদের ব্যবহৃত মাছধরার জাল থেকে। যাকে বলা হতো মাহাফল (Mahafal)। এটি জলরঙের জন্য উপযোগী ছিল।[১]

ভারতবর্ষে যখন থেকে বৃহদাকারে কাগজ উৎপাদনের শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে, তখন থেকে বিদেশ থেকে কাগজ আমদানি এবং হাতে তৈরি কাগজ উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে এবং চিত্রকলার প্রয়োজনে হাতে তৈরি কাগজ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ওয়ারধাতে হাতে কাগজ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। কাল্পিতে পুরনো কারখানাগুলো পুনরায় চালু হয়। চিত্রকরদের জন্য এসব উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[২]

(খ) রং

রং ব্যবহারের ভিত্তিতে মুঘল চিত্রকরদের দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, প্রাকৃতিক রং উৎপন্ন হতো সুনির্দিষ্ট উপাদান, খনিজ উপকরণ এবং উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে। কৃত্রিম রং তৈরি করা হতো সকল প্রকার উৎপন্ন লবণ, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ উপাদান এবং কীটপতঙ্গের রঞ্জক পদার্থ থেকে। মুঘল চিত্রকলায় কালো রং ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে অঙ্গারক (Carbon) সংগ্রহ করা হতো। ধাতব উপাদান যেমন- সোনা, রূপা এবং টিনকে (রাংতা) গুঁড়া আকারে তৈরি করা হতো। এসব গুঁড়ার সাথে আঠা (Gum-Arabic) মিশিয়ে সোনালী ও রূপালী রং পাওয়া যেত।

মুঘল চিত্রকরগণ অধিকাংশ উন্নত রং খনিজ ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে পেতেন। এছাড়া খনিজ লবণ থেকেও কিছু রং তৈরি হতো। কিছু খনিজ উৎসে মৃত্তিকা ও গিরিমাটি (earths and ochres) মসৃণ গুঁড়া রং আকারে পাওয়া যেত। কিছু রং উৎপাদন করা হতো বিভিন্ন বর্ণিল পাথর থেকে। এই পাথরগুলো অন্যান্য পাথর থেকে পৃথক ও ভিন্নতর। রং তৈরি করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। এজন্য ভারতবর্ষে একপর্যায়ে রং উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। শুধু জয়পুরে রং তৈরির কাজ অব্যাহত ছিল। এই প্রেক্ষিতে কিছু খ্যাতিমান শিল্পী তাঁদের মুঘল শৈলীর চিত্রকর্মে বিদেশি রং ব্যবহার করেছেন। বস্তুত, খনিজ উৎস ও প্রাকৃতিক লবণ থেকে প্রাপ্ত উপাদান প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে রং তৈরি করা হতো।

খনিজ রং আদি পর্যায়রূপে ব্যবহার করা হতো না। প্রথমে এগুলোকে অশৌচ পদার্থ থেকে পৃথক ও প্রক্রিয়াজাত করা হতো। এই পদ্ধতিকে বলা হতো *rangadhona* বা রং পরিশুদ্ধকরণ (washing the color)।

মৃত্তিকার দুটি উপাদান থেকেও রং পৃথক করা হতো। যথা- (ক) বালি ও (খ) উদ্ভিজ্জমৃত্তিকা (লতাপাতা ইত্যাদির পচনের দ্বারা সৃষ্ট মাটি)। মৃত্তিকা পানি দ্বারা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

---

[১] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 9

[২] *Ibid*, p. 9

প্রাকৃতিকভাবেই জলসিক্ত ও বিনষ্ট উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং ঝুরঝুরে মৃত্তিকার উপর বালির স্তর থাকে। প্রথমে ভাসমান তরল পদার্থ সরিয়ে মৃত্তিকাজাত রং-কে পৃথক করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় রং পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত একাধিক কাজ করতে হয়। এরপর সূর্যালোকে রং শুকানোর পর তা ব্যবহার করার উপযোগী হয়ে ওঠে। রং-পাথর থেকে একইভাবে ব্যবহার উপযোগী রং তৈরি করা যায়। শুরুতেই পাথরকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেয়া আবশ্যক। এরপর বড় কোনো প্রস্তরফলকে বা প্রাচীরগাত্রে রং-পাথরগুলোকে আঘাত করে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নেয়া হয়। একদম কণা পরিমাণ যেন হয়, তা পরখ করে দেখা জরুরী। এরপর এই রং-চূর্ণ থেকে চিত্রাঙ্কনের উপর্যুক্ত রং তৈরির ধাপ শুরু হয়। শুধু নীল রং (Indigo) ব্যতীত কোনো উদ্ভিজ্জ রং মুঘল চিত্রকরগণ সাধারণত ব্যবহার করতেন না। কারণ প্রকৃতিতে প্রাপ্ত রঙের স্থায়িত্বকাল কম। গাঢ় লাল রং (Carmine) ব্যতীত পতঙ্গ থেকে উদ্ভূত কোনো রঞ্জক ব্যবহৃত হতো না। শিল্প-সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে (deca-dence) উদ্ভিজ্জ রঙের ব্যবহার শিল্পীগণ বিশেষত পাটনা-শৈলীর শিল্পীগণ আরম্ভ করেন।[১]

পার্সি ব্রাউনের মতে, উদ্ভিজ্জ রং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুঘল চিত্রকরদের রঙের প্যালেটে উদ্ভিজ্জ রং কেন প্রভাব ফেলেনি, তা চিন্তাযোগ্য।[২] ব্রাউন সম্ভবত পাটনা শৈলীর ওস্তাদ-শিল্পীদের কাছে উল্লিখিত তথ্য পেয়েছেন। রঙের প্রয়োজনে মুঘল চিত্রকরগণ উৎপাদিত লবণ দু'ভাবে ব্যবহার করতেন। যথা-

১) লবণ অন্যান্য উপাদান থেকে পৃথক করে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা হতো। সিঁদুরবর্ণ (Vermilion) বা লাল গন্ধক এবং অন্যান্য রাসায়নিক মৌলের যৌগ (Sulphide) বা গন্ধকাম্লজাত লবণকে পারদ (Mercury) থেকে পৃথক করা হতো।

২) ধাতুর মধ্যে থাকা অম্লের বিক্রিয়া থেকে লবণকে স্বাভাবিক পর্যায়ে রূপান্তর করা হয় প্রথমেই। এরপর প্রাপ্ত উপাদান তামা, পিতল ও কাঁসার উপরিভাগে সঞ্চিত সবুজ পদার্থে ব্যবহার করা হয় (Verdigris)।[৩]

মুঘল চিত্রকলার করণকৌশল, উপকরণ ও শৈলী বিষয়ে খ্যাতিমান পণ্ডিত মোতি চন্দ্র উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তাঁর গবেষণামূলক রচনা থেকে বিপুল তথ্য পাওয়া যায়। মুঘল চিত্রকরদের ব্যবহৃত রঙের উৎপত্তিও বেশ চমকপ্রদ।

---

[১] Moti Chandra, *Ibid*, p. 18

[২] Percy Brown, *op. cit.*, p. 190

[৩] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 19

সাদা রং (White Pigments)

চীনের তুর্কিস্থানের কাশগর থেকে আমদানিকৃত দস্তা থেকে উৎপন্ন হতো সাদা রং (Zinc-White), যা মুঘল চিত্রকরগণ ব্যবহার করতেন। এক্ষেত্রে জয়পুরের দস্তা-সাদাও (Safeda) উৎকৃষ্ট। অন্য একটি সাদা হচ্ছে সিসাযুক্ত সাদা (White lead)। এটি সস্তা উপকরণ, কদাচিৎ ব্যবহৃত হতো। কারণ এই সাদাটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ফিকে ও কালচে বর্ণ ধারণ করতো। দস্তা-সাদা দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রপট প্রস্তুত করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে মসলিনের ওপরও এই সাদা প্রয়োগ করা হতো বলে জানা যায়। দস্তা-সাদার গুঁড়া চীনামাটির পেয়ালায় প্রথমে আঠা দ্বারা সংমিশ্রণ করা হয়। এরপর আঙুলের ডগায় নিয়ে দেখা হতো এর সঙ্গে পানি মেশানোর প্রয়োজন আছে কি-না। যখন দস্তা-সাদার সঙ্গে পানির সংমিশ্রণের অনুপাত অনেকটা দুধের ঘনত্ব ধারণ করবে, তখন একইভাবে আরো সংমিশ্রণ করা হতো। দস্তা-সাদাকে এভাবে পরিশুদ্ধ করার পর সবটুকু পানি নিষ্কাষণ করে নেয়া হতো। এরপর দস্তা-সাদার শুকনো গুঁড়া (Powder) চিত্রাঙ্কনে ব্যবহারের উপযোগী হতো।[১] উল্লেখ্য, মুঘল চিত্রকরগণ কাগজের ওপর চিত্রাঙ্কনের পূর্বে সাদা রঙের প্রলেপ দিতেন। এটিই চিত্রের জমিন তৈরির পদ্ধতি।[২]

আলোকচিত্র ৫.২: সাদা রং (White Pigments)

[১] Moti Chandra, *Ibid*, Pp. 19-20

[২] Percy Brown, *op. cit.*, p. 188

জয়পুরে সস্তায় 'বাজারি-ছবি' পাওয়া যেত। সাধারণত সেসব ছবিতে দস্তা-সাদা ব্যবহার করা হতো না। এ অঞ্চলে চুনা পাথর (urdiya khari) এবং সাবান-পাথর (soap-stone) বা sang-i-sarahal চিত্রকর্মে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও চিত্রকর্মে পরত বা তবক দেয়া হতো। দস্তা-সাদা এবং সিসা-সাদা ষোলো ও সতের শতকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দস্তা-সাদার মূল প্রচলন শুরু হয় আঠারো শতকে। একটি কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সিসা-সাদা মধ্যযুগে ইউরোপীয় চিত্রকর্মে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও সিসা-সাদার দুটি ক্ষতিকর দিক আছে। যথা:

১) এটি অত্যন্ত বিষাক্ত এবং চিত্রকরের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

২) এটি জলরঙে ব্যবহারে বাতাসের সাথে মিশে ক্রমে ক্রমে কালো বর্ণ ধারণ করে।

মুঘল চিত্রকরগণ তাঁদের চিত্রকর্মে বিপুল পরিমাণে দস্তা-সাদা (Kashgar Safeda) ব্যবহার করেছেন।[১]

ভুসাকালি বা কালো রং (Lamp Black)

কালো রংকে ফারসিতে বলা হয় Siyahi। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের চিত্রকরগণ ভুসাকালি থেকে তৈরি কালো রং ব্যবহার করতেন। অজন্তা গুহার দেয়ালচিত্র থেকে শুরু করে মুঘল মিনিয়েচর চিত্রকলা পর্যন্ত এই কালো রঙের প্রচলন ছিল। ভুসাকালি বা Lamp-Black থেকে কালো রং তৈরির পদ্ধতি ছিল অভিনব। একটি বাতি-আধারকে প্রথমে সরিষার তৈল (mustard) দ্বারা পূর্ণ করা হতো। এরপর বাতি জ্বালিয়ে মাটির পাত্রে রেখে দেয়া হতো। একটি বাটি দ্বারা বাতির উপরে দেয়া হতো ঢাকনা। এই প্রক্রিয়ায় ভুসাকালি জমা হতো বাটির মধ্যে।

আলোকচিত্র ৫.৩: ভুসাকালি বা কালো রং (Lamp Black)

[১] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 20

একই পদ্ধতিতে কর্পূর পুড়িয়েও ভুসাকালি উৎপন্ন করা হয়েছে। সংগৃহীত ভুসাকালির স্তুপ বা গেণ্ডুর সাথে আঠা (gum-arabic) সংমিশ্রণ করা হতো প্রয়োজন মতো। এরপর ভুসাকালির ওই গেণ্ডুগুলোকে ময়দা-মাখার পাত্রে রেখে আগুনে পোড়ানো হতো। এই প্রক্রিয়ায় ভুসাকালির তৈলাক্ত অংশ ময়দার সাথে দ্রবীভূত হয়ে যেতো। এভাবেই চিত্রাঙ্কনের জন্য ভুসাকালি থেকে কালো রং তৈরি করা হয়েছে।[১]

লাল রং (Red pigments)

প্রকৃতিতে লাল হচ্ছে একটি অনবদ্য রং, এ বলাই বাহুল্য। লাল বর্ণের পাথর এবং লাল এঁটেলমাটিতে (Clay) সবসময় অক্সিজেনের যৌগ (Oxide) ও লৌহজাত পদার্থ (iron) থাকে। সকল পাথর ও এঁটেলমাটি ব্যবহার করা যায় না। এর খুব সামান্যই রঙের সঙ্গে সংমিশ্রণ করা হতো। রং যখন পৃথক হতো, তখন তা অদৃশ্য থাকতো। ফলত, কিছু এঁটেলমাটি বেছে লৌহের অক্সিজেন-যৌগ সংগৃহীত হতো। প্রাচীনকালে চিত্রকলায় বিপুল পরিমাণে লাল-হলুদ বা গেরুয়া (geru) রং ব্যবহার করা হয়েছে। এই রং উজ্জ্বল এবং উষ্ণ। ইউরোপে গেরুয়া রং হচ্ছে ভেনিসীয় লাল (venetian)। ভারতীয় লাল রং (hurmuzi) তৈরি করা হতো পারস্যের হুরমুজ দ্বীপ থেকে প্রাপ্ত গিরিমাটি থেকে। এই রং গাঢ়, হালকা এবং রক্তবর্ণের- এই তিন প্রকারেই পাওয়া যেতো।

আলোকচিত্র ৫.৪: লাল রং (Red pigments)

Orange lead বা কমলা-সিসা (Sindura) মুঘল চিত্রকর্মে অত্যধিক ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, হলুদাভ লাল রং প্রয়োগের জন্য। সিসা-সাদাকে খোলা বাতাসে রেখে তাওয়া

[১] Moti Chandra, *Ibid,* p. 21

দিয়ে এই রং তৈরি করা হতো। গাঢ় লাল না হওয়া পর্যন্ত তাওয়া দেওয়া চলতো। জয়পুরে বর্তমানেও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের লাল রং তৈরি করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবে এ রং বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

Vermilion বা সিঁদুরবর্ণ (Crude Cinnabar) অথবা Sulphid of Mercury হচ্ছে উজ্জ্বল লাল। এর ফারসি শব্দ Shangarf। সিঁদুরলাল আদি পর্যায়ে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে। সর্বোৎকৃষ্ট সিঁদুর লাল ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আমদানি করা হতো। শুরুতে এটি ভারতীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসার খাতিরে পারদ তৈরির জন্য অত্যধিক ব্যবহার করতেন। সে সময় চিত্রকরগণ খুব অল্পই তা ব্যবহার করেছেন। এ রং খড়িমাটি বা মোমসহ সিঁদুরের সাথে লেবুর রসের সংমিশ্রণে তৈরি হতো।

আরেক প্রকারের লাল হচ্ছে Carmine। হিন্দিতে এটিকে বলা হয় Kirimdana। Kirim শব্দটি এসেছে সম্ভবত সংস্কৃত Krmi থেকে। আরবি শব্দ Kereme থেকেও এই শব্দের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। যার অর্থ 'লাল রঞ্জক'। আরব থেকে অথবা আদিবাসীদের পতঙ্গ-রঞ্জক থেকে বানানো রং আমদানি করা হয়েছে। Kirimdana হচ্ছে একপ্রকার ভারতীয় পতঙ্গের প্রজাতি বিশেষ। শুধু নারী পতঙ্গের রঞ্জক থেকেই এ রং তৈরি হতো। যা Carmine বা গাঢ় লাল রং হিসাবে পরিচিত।[১]

লাল বর্ণের অন্য একটি রূপ হচ্ছে প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা বৌদ্ধ পুঁথিতে এটি ব্যবহার করতেন। এ রং সাদার সঙ্গে রক্ত লাল রঙের সংমিশ্রণে তৈরি হতো। যা ছিল লাল গোলাপ বর্ণের। পরবর্তীকালে পতঙ্গের রঞ্জক থেকে ভিন্ন ধরনের একটি লাল রং তৈরি করা হয়েছে। এর নাম- Cochineal। ইউরোপে ষোড়শ শতকে এ রং চালু হয়। ভারতবর্ষে সতেরো শতকে পারস্য থেকে Cochineal রং আমদানি করা হতো। অবশ্য এ রঙের তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না।

নীল রং (Blue Pigments)

Indigo বা নীল রং প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে তৈরি করা হয়েছে। এ রং ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে গ্রীস ও রোমে রপ্তানি করা হতো। এক ধরনের উদ্ভিদ থেকে নীল রং তৈরি করা হতো, যার আধুনিক নাম- Indigo-ferae, যা শুরুর দিকে বস্ত্রের রং হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বাদশাহ আকবরের চিত্রকারখানায় শিল্পীগণ এ রঙের ব্যবহার শুরু করেন। অন্য এক প্রকারের নীল রং হচ্ছে ultramarine azure বা lazwardi। ভারতীয় চিত্রকলায় প্রাচীনকাল থেকে এই রং ব্যবহারের হদিস পাওয়া যায়। লাপিস লাজুলি (Lapis lazuli) থেকে প্রাপ্ত নীল রং ভারতবর্ষের নয়। এটি আফগানিস্তানের বাদাখাশান প্রদেশের লাপিস লাজুলি নামে খনিজ পাথরের চূর্ণ থেকে তৈরি করা হতো। অজন্তা গুহার চিত্রমালায় আল্ট্রামেরিন নীল চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

[১] Moti Chandra, *Ibid,* p. 22-24

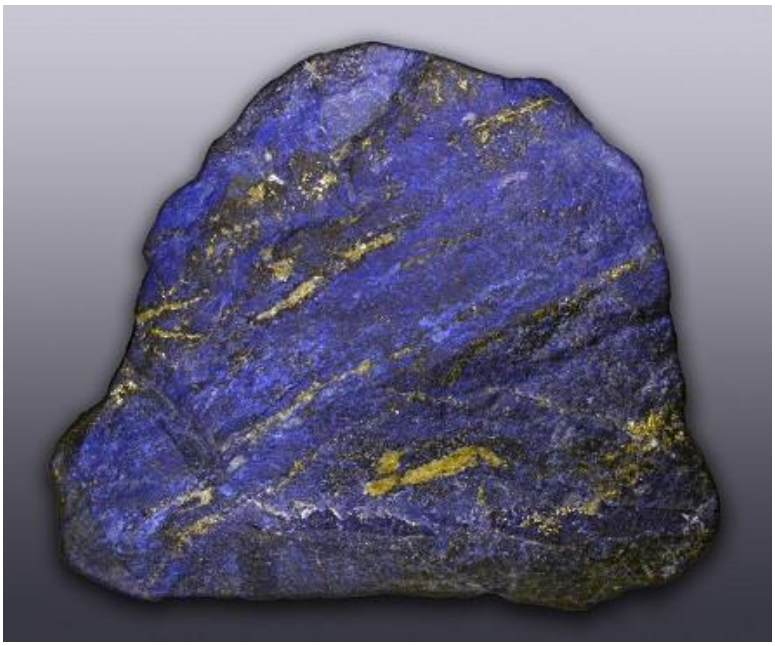

আলোকচিত্র ৫.৫: লাপিস লাজুলি (*Lapis Lazuli*) পাথর

আলোকচিত্র ৫.৬: লাপিস লাজুলি থেকে উৎপন্ন নীল রং (Blue Pigments)

লাপিস লাজুলির অনুপম আল্ট্রামেরিন নীল রং মুঘল চিত্রকরদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ রং পারস্য, কাশ্মীর এবং দিল্লির লিপিশিল্পী ও চিত্রশিল্পীরা বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত আল্ট্রামেরিন রঙের প্রধান এবং সর্বোৎকৃষ্ট উৎসই হচ্ছে লাপিস লাজুলি পাথর। উল্লেখ্য, তাজমহলের Pietra-dura শিল্পকর্মে লাপিস-লাজুলি পাথর ব্যবহার করা হয়েছে।[১]

আলোকচিত্র ৫.৭: তাজমহলে লাপিস লাজুলি পাথরের Pietra-dura নকশা

লাপিস লাজুলি গাঢ় নীলবর্ণের মূল্যবান পাথরবিশেষ। বাংলায় নীলোপল বা বৈদূর্যমণি পাথর বলা হয়ে থাকে। এই পাথর গুঁড়া করে পারস্য, কাশ্মীর ও দিল্লির লিপিকরগণ নীল রং তৈরি করতেন। এরপর পাণ্ডুলিপি চিত্রণের জন্য তাঁরা ওই রং ব্যবহার করতেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদূর্যমণিচূর্ণের নীলরঙের অপূর্ব উজ্জ্বলতার সঙ্গে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি নীলরঙের কোনো তুলনা চলে না। তাজমহলের জন্য এইসব মূল্যবান মণিরত্ন রাষ্ট্রদূতগণ মুঘল রাজদরবারে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করতেন।[২]

ভারতীয় চিত্রকরগণ আল্ট্রামেরিন নীল রং সবযুগেই ব্যবহার করেছেন। তবে মুঘল ও পাহাড়ি চিত্রকর্মে এ রং অবধারিতভাবে ব্যবহার করা হতো। নীল রঙের ফারসি শব্দ lazward। শব্দটির উৎপত্তি lazarium থেকে, যা এসেছে Azurium এবং azure থেকে। লাপিস লাজুলি পাথরের চূর্ণ

---

[১] Moti Chandra, *Ibid,* p. 24-25

[২] বিনয় ঘোষ, *বাদশাহী আমল* (ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত *Travels in the Mogul Empire: 1656 – 1668 A.D* অবলম্বনে), কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, বৈশাখ ১৩৮৫, পৃ. ২৮

থেকে উৎপন্ন গাঢ় নীল রং-ই Ultramarine azure। এটি ইউরোপে প্রস্তুত করা হতো। ভারত কাবুল থেকে সরাসরি পাথর আমদানি করতো। এই মূল্যবান নীল রং আভিজাত্য ও রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক স্বরূপ।

ফ্রান্সে আঠারো শতকে কৃত্রিমভাবে নীল রং তৈরি হয়। চীনা মাটি, রাসায়নিক সোডা এবং সালফার-রসের সংমিশ্রণে এই রং প্রস্তুত করা হয়। লাপিস লাজুলির অপূর্ব নীলরঙের সঙ্গে ওই কৃত্রিম নীলরঙের বিস্তর পার্থক্য উন্মোচিত হওয়ায়, লাপিস লাজুলি পাথরের গুরুত্ব বোঝা যায়। মুঘল চিত্রকর্মের বিবিধ অনুষঙ্গে বিশেষত আকাশ চিত্রণে এবং লিপিকলায় লাপিস লাজুলি পাথরের গাঢ় নীল রং ব্যবহার করা হতো বেশি।[১]

হলুদ রং (Yellow Pigments)

মুঘল চিত্রকরগণ ভারতীয় হলুদ রঙকে Peori বলে জানতেন। এ রং জয়পুর থেকে সংগৃহীত হতো। এটি অত্যন্ত চড়ামূল্যের রং। মির্জাপুর নামক একটি গ্রামে এই রং তৈরি করা হতো। গোমূত্র সংগ্রহ করে প্রথমেই তা শীতল করা হতো এবং তারপর সেদ্ধকরণ। এই পদ্ধতিতে তৈরি হতো হলুদ রং।

আলোকচিত্র ৫.৮: হলুদ রং (Yellow Pigments)

Yellow Ochre বা বাদামি হলুদ (ramari) রং গিরিমাটি থেকে তৈরি করা হতো। গাঢ় হলুদ রং (Gamboge) তৈরি হতো এক ধরনের আঠা থেকে, যা Sare-revan নামে পরিচিত। অবশ্য মুঘল চিত্রকরগণ এ রং ব্যবহার করতেন না। পরবর্তীকালে পাটনা শৈলীর চিত্রকরগণ এই হলুদ রং ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। পালযুগের পুঁথিচিত্রের তালপত্রে বৌদ্ধ শিল্পীগণ এক ধরনের হলুদ রং

[১] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 27

ব্যবহার করতেন। এটি hartal নামে পরিচিত ছিল। জয়পুর ও রাজস্থানের শিল্পীগণ এই হলুদ রং ব্যবহার করতেন। যা 'রাজস্থানী শৈলী' নামে পরিচিত। মুঘল শৈলীর প্রভাবেই ওই চিত্রধারার সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত হলুদ রং মুঘল চিত্রকলায় পাওয়া যায়নি।

আলোকচিত্র ৫.৯: গিরিমাটি থেকে তৈরিকৃত বাদামী হলুদ (Yellow Ochre)

সবুজ রং (Green Pigments)

Harabhala হচ্ছে লৌহঘটিত অক্সাইডের একপ্রকার সিলিকা (Silicate of Ferrous oxide)। প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের সবুজ রং থাকে, যাদের বলা হয় 'terraverte'। মুঘল চিত্রকলায় সতের শতকের দিকে চিত্রের পুরোভূমি (foreground) চিত্রণে এই রং ব্যবহার করা হয়েছে। Harabhala হচ্ছে ম্যালাকাইট (Melachite) পাথরের সবুজ রং বিশেষ। এই সবুজ পাথর প্রধানত অলঙ্কারে ব্যবহার করা হতো। খনিতে এই পাথর নানাভাবে থাকে- কিছু মলিন, কিছু উজ্জ্বল ঘাস-সবুজ, কিছু শক্ত পাথরের মতো। এর কয়েকটিই কেবল রঙের জন্য উৎকৃষ্ট।

আলোকচিত্র ৫.১০: ম্যালাকাইট পাথর

ভূতাত্ত্বিকদের মতে ম্যালকাইট পাথর হচ্ছে সংগৃহীত নীলরং থেকে রূপান্তরিত হওয়া সবুজ। এই রং মলিন, উজ্জ্বল, অস্বচ্ছ এবং স্বচ্ছ অবস্থায় পাওয়া যেতো। বৃক্ষ, সবুজ মাঠ ও পাহাড় অঙ্কনে উল্লিখিত সবুজ ব্যবহার করা হয়েছে। তাম্রমল সবুজ (Zangal) বা Verdigris রং মুঘল চিত্রকরদের বিশেষ প্রিয় ছিল। মুঘল পাণ্ডুলিপি চিত্র এবং একক চিত্রের জন্য এই রং ব্যবহৃত হয়েছে। তাম্রমল হচ্ছে তামার সির্কাম্ল। তামাকে সিরকা (vinegar) দিয়ে মেশানোর পর চমৎকার রং আসে। শুরুতে এ রং একদম তাজা থাকে কিন্তু কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তা গাঢ় হয়ে বাদামী আমেজ ধারণ করে। অধিকন্তু, এ রং কাগজেরও ক্ষতিসাধন করে। প্রাচীন পুঁথিচিত্র পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় যে, তাম্রমল সবুজ নির্দিষ্ট সময়ের পরে বিদীর্ণ হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, এই রঙের প্রভাবে কাগজও দুর্বল হয়ে পড়ে।

আর্সেনিকের (arsenic) সালফাইডের সঙ্গে নীলের সংমিশ্রণে প্রাকৃতিকভাবে সবুজ রং সৃষ্টি হয়। যাকে বলা হয় Zahari। এটি মুঘল চিত্রকরদের পরিভাষা। উৎপন্ন রংগুলোর সাথে অপরাপর রঙের সংমিশ্রণে আরো অনেক রং সৃষ্টি হয়। সকল রঙের বিভিন্ন মাত্রা (shade) রয়েছে।

আলোকচিত্র ৫.১১: সবুজ রং (Green Pigments)

লালচে- বেগুনি রং (purple) তৈরি হয় লাল (vermilion) ও নীলের (indigo) সংমিশ্রণে। গাঢ় রক্তবর্ণের লাল উৎপন্ন হয় ভুসাকালি (Lamp-black) ও ভারতীয় লালের (hirauji) সংমিশ্রণে। উজ্জ্বল হলুদের সাথে দস্তা-সাদার সংমিশ্রণে (gulpumbali) হলুদাভ বাদামি রং তৈরি হয়। বেগুনি রং (sosani) তৈরি হয় নীল ও গাঢ় লালের সংমিশ্রণে। সোনালি হলুদ (sonazard) তৈরি হয় লাল ও হলুদের সংমিশ্রণে। কমলা রং বা Orange Color তৈরি হয় (naranji) হলুদের সঙ্গে সামান্য লাল রঙের সংমিশ্রণে। সাদা ও ভুসাকালির সংমিশ্রণে তৈরি হয় ধূসর-ছাই রং। ধূসর রঙের অনেক মাত্রা থাকে।[১] মুঘল চিত্রকলায় উল্লিখিত রংসমূহ ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধাতব রং-ও ব্যবহার করা হয়েছে। সোনা ও রূপার পাত ও গুঁড়া রং এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বর্ণচূর্ণের রং (Gold powder)

মুঘল চিত্রকরগণ চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু ও অঙ্গসজ্জার প্রয়োজনে সোনার গুঁড়া রং এবং সোনার তবক বা পাত ব্যবহার করতেন। সোনার তবক থেকে গুঁড়া রং তৈরি করা হতো। ফারসি ভাষায় এটিকে Kolkari Sona বলা হয়।

চিত্রকর্মে সোনার রং ব্যবহারের জন্য চিত্রের জমিনে প্রথমে মধু, আঠা ও আখের রস (Syrup) দ্বারা পাতলাভাবে প্রলেপ দিতে হয়। অথবা ডিমের হলুদ অংশ মৃৎপাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে স্বর্ণের গুঁড়া

[১] Moti Chandra, *Ibid,* p. 28-29

সংমিশ্রণ করে নিতে হয়। প্রয়োজনে একাধিক সোনার তবক দিতে হয়। এরপর পানির সংমিশ্রণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় চিত্রকর্মে ব্যবহারের উপযোগী তরল সোনালি রং পাওয়া যায়।[১]

আলোকচিত্র ৫.১২: স্বর্ণচূর্ণের রং (Gold powder)

মুঘল চিত্রকরগণ চিত্রকর্মের প্রয়োজন মোতাবেক শুধু সোনা ও রূপা ধাতু গলিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতেন। অনেক ক্ষেত্রে সোনার পাতলা তবক থেকে কেটে নিয়েও চিত্রকর্মে লাগানো হতো। বস্তুত বাদশাহি শানশওকত ও জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলংকারকে সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করতে সোনা ও রূপার ব্যবহার আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। মুঘল চিত্রকলায় এর ব্যবহার পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পায়।[২] সোনা-রূপার পাশাপাশি চিত্রকর্মে প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন মণি-মুক্তার চূর্ণও প্রয়োগ করা হতো। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'জারা' করা। মণি-মুক্তার চূর্ণ প্রয়োগ করা হতো উষ্ণীষে (পাগড়ি), সাজসজ্জায় এবং অলঙ্কার চিত্রণে।[৩]

মুঘল চিত্রকলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অপরাপর চিত্রকলায় সাধারণত সোনার তবক ব্যবহার করা হতো না। বরং সোনার পরিবর্তে সুলভ মূল্যের পেতলের চূর্ণ-রং ব্যবহার করা হতো। দিল্লি ও জয়পুরের কিছু শিল্পী এখনো এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন।[৪]

---

[১] Moti Chandra, *Ibid,* p. 30-31

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরূপ: মুঘল চিত্রকলা*, কলকাতা: থীমা, ১৯৯৯, পৃ. ৩১

[৩] অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা* (প্রথম খন্ড), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০ (পঞ্চম মুদ্রণ), পৃ. ১৩৯

[৪] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 31

রৌপ্যচূর্ণের রং (Silver powder)

রৌপ্যচূর্ণের রং মুঘল চিত্রকলায় বেশি ব্যবহার করা হয়নি। মুঘল চিত্রকরগণ সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর্মের সাজসজ্জা ও নকশা চিত্রণে রূপা ব্যবহার করেছেন। জয়পুরে রূপার বিকল্প হিসাবে রাংতা বা টিনের (tin) চূর্ণ রং ও তবক ব্যবহার করা হতো। টিনচূর্ণের সাথে আঠা ও পানির সংমিশ্রণে রূপালি বর্ণের রং তৈরি হতো।

আলোকচিত্র ৫.১৩: রৌপ্যচূর্ণের রং (Silver powder)

আলোকচিত্র ৫.১৪: রৌপ্যচূর্ণের তবক

অভ্রচূর্ণের রং (Mica)

মুঘল চিত্রকলায় অনেক সময় অভ্রচূর্ণের রং ব্যবহার করা হয়েছে। এটি খনিজ ধাতুবিশেষ। জয়পুরে 'বাজারি ছবি'তে অভ্রচূর্ণের রং প্রয়োগ করা হতো।[১]

(গ) আঠা বা গঁদ (Gum arabic)

মুঘল চিত্রকরগণ তাঁদের চিত্রকর্মে একপ্রকার প্রাকৃতিক আঠা ব্যবহার করেছেন, যা Gum arabic নামে পরিচিত। এর অন্য একটি নাম babul ki-god। কয়েক প্রকারের বাবলা গাছ (acacia) থেকে এই আঠা বা গঁদ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও বিহারে এবং পশ্চিমের (স্পেন ও পর্তুগাল) পেনিনসুলা (Peninsula) উপদ্বীপে অধিক পরিমাণে বাবলা গাছ দেখা যায়। এই গাছ থেকে প্রাপ্ত গঁদ সকল রঙের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু দস্তা-সাদা ও হলুদ। এ দুটি রঙে Anogeiss Latifolia গাছের গঁদ ব্যবহার করা হয়। লক্ষ্ণৌতে বস্ত্রশিল্পীরা এই গঁদ ব্যবহার করেন।[২]

আলোকচিত্র ৫.১৫: বাবলা গাছের গঁদ বা আঠা (Gum arabic)

মুঘল চিত্রকরগণ রঙের সঙ্গে পরিমাণ মতো Gum arabic বা গঁদ সংমিশ্রণ করতেন। এক্ষেত্রে কাগজের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন রঙের চরিত্র সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল থাকা জরুরী ছিল।

(ঘ) চকখড়ি ও তুলি

মুঘল চিত্রকলায় চিত্রাঙ্কন আরম্ভের পূর্বে প্রথমেই কাগজের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাদা রং ও আঠার পাতলা প্রলেপ দেয়া হতো। প্রলেপ ভালোভাবে শুকানোর পর কাগজের জমিনে চিত্রের বিষয়বস্তু ও অনুষঙ্গের রেখাচিত্র নিঁখুতভাবে অঙ্কন করা হতো। এরপরের ধাপই হচ্ছে যথাযথ রঙের প্রয়োগ বা চিত্রায়ন। যাকে বলা হয় rang amezi (coloring)।[৩]

---

[১] Moti Chandra, *Ibid*, p. 32

[২] *Ibid*, p. 33

[৩] Percy Brown, *op. cit.*, p. 188

প্রাচীন ভারতে চকখড়ি (crayon) দ্বারা চিত্রকর্মের প্রাথমিক অঙ্কনের কাজ সম্পন্ন হতো। মুঘল চিত্রকরগণ চিত্রকর্মে প্রথম খসড়ার জন্য চকখড়ি হিসাবে কদাচিৎ তেঁতুলগাছের পোড়া কয়লা (imlika koyala) ব্যবহার করেছেন। তাঁরা প্রধানত লালখড়ি (Indian red) দ্বারা প্রথম রেখাচিত্র (line drawing) অঙ্কন করতেন। কারণ প্রয়োজন সাপেক্ষে এই রেখা মুছে ফেলা যায়। সংশোধনের সুযোগ থাকে। এরপর ভুসাকালি দ্বারা রেখাচিত্র নিঁখুতভাবে অঙ্কন করা হতো।[১] সীমারেখা বা রেখাচিত্রের মধ্যে সকল বিষয়বস্তুর রূপই আবদ্ধ। ভারতবর্ষের শিল্পীগণ এই পদ্ধতিটি স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এজন্য তাঁরা চিত্রকর্মের শুরুতেই বিষয়বস্তুর সামগ্রিক রেখাচিত্র সূক্ষ্মভাবে এঁকে নিতেন। পাণ্ডুলিপি চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে প্রথমেই ছবির জন্য যথার্থ পরিসর নির্ধারণ করা হতো। ফারসিতে যাকে বলা হয় 'তার' করে নেয়া। তারপর লাল বা কালোখড়ি দ্বারা সরাসরি রেখাচিত্র অঙ্কন করা হতো। এটিকে ফারসিতে বলা হয় 'তার-কশ' করা, অর্থাৎ রেখাচিত্র অঙ্কন করা। এরপরেই অঙ্কিত রেখাচিত্রের মধ্যে যথাযথ রং প্রয়োগ করা হতো। চিত্রাঙ্কনের এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে ফারসিতে বলা হয় 'আমল' করা। বিশেষ পাণ্ডুলিপি চিত্র বা পুঁথিচিত্র অধিক গুরুত্বের সঙ্গে অঙ্কিত হতো। এক্ষেত্রে চিত্রকর্মসমূহ পৃথক কাগজে সম্পূর্ণরূপে আমল করে, তারপর আঠা দিয়ে পাণ্ডুলিপির মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিসরে চিত্রকর্ম লাগানো হতো।[২]

মুঘল চিত্রকলায় তুলি (brush) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সংস্কৃতিতে একে বলা হয় 'তুলিকা'। তুলির ফারসি শব্দ 'লেখনি' (lekhani) যার সমার্থক শব্দ 'কলম' (qalam)। মুঘল চিত্রকলায় একটি পরিভাষা হিসাবে qalam প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন শৈলীর নির্দেশক হিসাবেও qalam শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: দিল্লি কলম, লক্ষ্ণৌ কলম, মুর্শিদাবাদ কলম প্রভৃতি।

যথাযথ যত্নের সঙ্গে, গুণগত মান বজায় রেখে তুলি তৈরি করাকে মুঘল চিত্রকরগণ অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। তুলি যদি শক্ত হয় তবে কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। জলরঙের ক্ষেত্রে নরম তুলি আবশ্যক। তুলির মানদণ্ড বিবেচিত হয় চিত্রকর্মে তার ব্যবহার, সুনিপুণ প্রয়োগ ও উৎকর্ষতার ওপর। অর্থাৎ ছবিতে তুলির কাজ দেখলেই তার গুণগত মান অনুধাবন করা যায়। তুলির তৈরির জন্য প্রথমে উপর্যুক্ত প্রাণির লোম নির্বাচন করা হতো (qalam badhana) এক্ষেত্রে মুঘল চিত্রকরগণ দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতেন। প্রথমত, পানিতে তুলি চুবানোর পর তা জল ধারণ করতে পারে কি-না। দ্বিতীয়ত, তুলি অতিরিক্ত নরম বা শক্ত কি-না।

তুলির জন্য সাধারণত পারসিক বিড়াল, মহিষ, ছাগল, কাঠবিড়াল বা নেউল এবং উটের লোম নির্বাচন করা হতো। কিন্তু মুঘল চিত্রকরগণ নেউলের লেজের লোম থেকে তৈরি তুলি ব্যবহার করতেন। কারণ

---

[১] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 34

[২] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

তা চিত্রাঙ্কনের জন্য যথার্থ এবং উৎকৃষ্ট।[১] সমস্ত কাজ অতি নরম, সূক্ষ্ম কাঠবেড়ালীর লোম দ্বারা তৈরি তুলিতে অঙ্কিত হতো।

তার মধ্যে যে সব কাজ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হতো, সেগুলো এক লোমের তুলি দ্বারা অঙ্কন করা হতো। ফারসিতে এই তুলিকে বলা হয় 'এক-বাল কলম'। এরূপ 'এক-বাল কলম' দ্বারা চিত্রকর্মে রং প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন এবং ধৈর্যের কাজ। মুঘল চিত্রকরগণ তাঁদের চিত্রকলায় এই অসামান্য গুণের প্রমাণ রেখেছেন।[২]

মোটকথা, মুঘল চিত্রকলায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখা, রং প্রয়োগ, আলো-ছায়ার গীতল রূপ ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধনের জন্য উন্নতর তুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫.২ মুঘল চিত্রকলার করণকৌশল

রেখাচিত্র ও রঙের ব্যবহার

মুঘল চিত্রকরগণ দরবারি চিত্রকারখানায় কাজ শুরুর পূর্বে প্রথমেই কাগজ নির্বাচন করে নিতেন। পরখ করে দেখতেন কাগজটি চিত্রাঙ্কনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে কি-না। অনেক সময় কাগজ মসৃণ করার জন্য সোলেমানি পাথর (agate) দ্বারা ঘষামাজা (burnish) করা হতো। চিত্রকর শান্ত মেজাজে, সুস্থির হয়ে চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশে আসন গ্রহণ করতেন। মুসলমান চিত্রকর হলে চিত্রাঙ্কন আরম্ভের পূর্বে তুলি হাতে ধরে পাঠ করতেন: "বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম"। আর চিত্রকর সনাতন ধর্মাবলম্বী হলে পড়েতন: "জয়-গণপতি বাবা কি"।

চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু কল্পনাশ্রয়ী (khyali) হলে চিত্রকর এক প্রকার ঘোরের মধ্যে থাকতেন। এরপর কল্পনা থেকেই চিত্রপটে যাবতীয় বিষয়বস্তুর রেখাচিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্কন করে নিতেন। লাল বা কালো চকখড়ি দ্বারা অঙ্কিত সেসব উল্লম্ব ও আনুভূমিক রেখায় প্রতিভাত হতো পরিকল্পনা মোতাবেক বিষয়বস্তু। সমগ্র বিষয় ও অনুষঙ্গের রেখাচিত্র অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অঙ্কন করা হতো, যেন পরবর্তী ধাপে রং প্রয়োগের কোনো অসুবিধা না হয়।[৩]

চকখড়ির রেখাচিত্র-অঙ্কন সমাপ্ত হওয়ার পর ভুসাকালি (Lamp black) দ্বারা ওই রেখাচিত্রে নির্ভুল ও চূড়ান্ত রূপ দেয়া হতো। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় Siyahi qalam (Indian ink)। কালো রঙের চূড়ান্ত রেখাচিত্রের ওপর, পুরো কাগজ জুড়ে সাদা রং দ্বারা অত্যন্ত পাতলা ও মিহি আস্তর দেয়া হতো। অবশ্য এজন্য রেখাচিত্রটি বিলীন হতো না, ভেসে উঠত। সাদা আস্তর ভালোভাবে শুকানোর পর

---

[১] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 36

[২] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[৩] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 38-39

পরবর্তী ধাপে চিত্রকর ওই রেখাচিত্রের অনুসরণে বিষয় ও অনুষঙ্গে নির্ধারিত রং প্রয়োগ করতেন (rang amezi)। মৌলিক রং ও মিশ্র রং প্রয়োজন অনুযায়ী ধাপে ধাপে ব্যবহার করা হতো। সাদা ও কালো দ্বারা রং হালকা ও গাঢ় করা হতো। সবশেষে সোনার তবক ও তরল সোনা ব্যবহার করে চিত্রকর্মের সাজসজ্জার কাজ সম্পন্ন হতো।[১]

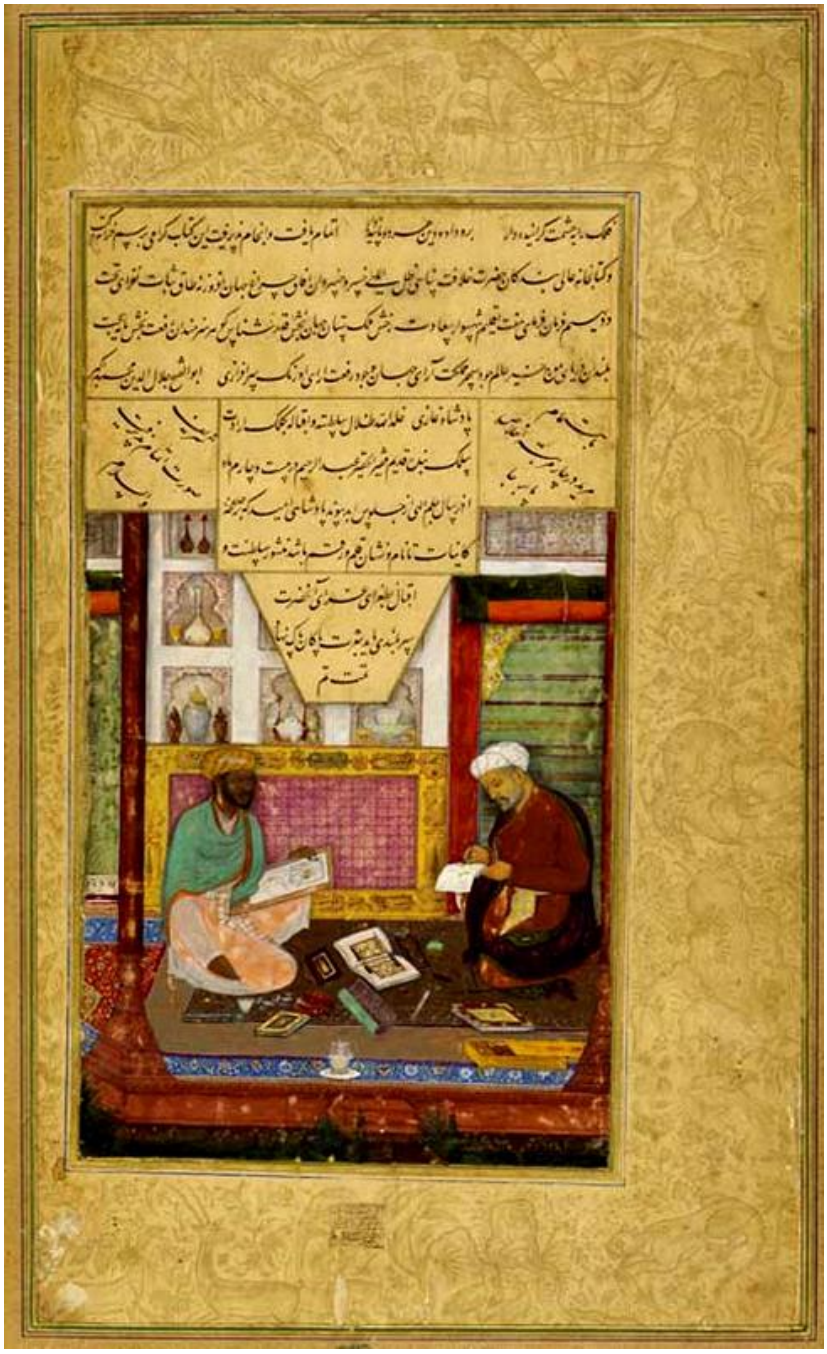

আলোকচিত্র ৫.১৬: মুঘল চিত্রকরদের কর্মপদ্ধতি (শিল্পী আবদুর রহিম ও শিল্পী দৌলত)

(সূত্র: Jeremaih P. Losty, The Art of the Book in India, London: The British Library, 1982)

[১] Percy Brown, *op. cit.*, p. 188

মুঘল চিত্রকরগণ আরো কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তাঁর চিত্রকর্মে রঙের কাজের সময় প্রথমেই পটভূমি (*Zamin asman*) রং করে নিতেন। এরপর মনুষ্য দেহাবয়বের প্রতিকৃতিতে রং প্রয়োগ করতেন। প্রতিকৃতির জন্য বিভিন্ন প্রকারের লাল (red lead, carmine, red ochre, Indian red) রং হলুদ (peori or yellow ochre) এবং দস্তা-সাদার সঙ্গে সংমিশ্রণ করা হতো। এই রংসমূহ হালকা থেকে গাঢ়-বিভিন্ন মাত্রায় তৈরি করা হতো, যেন মুখাবয়বের ত্বকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে মনুষ্য দেহাবয়ব এবং পোশাক-পরিচ্ছদে রং প্রয়োগ করা হতো। সমগ্র চিত্রকর্মে সঠিকভাবে রঙের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গসমূহে সোনার তরল রং ব্যবহার করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে সোনার পাতলা তবক কেটে বসানো হতো।[১]

মুঘল চিত্রকর্মের মাধ্যম ছিল তেল ও জলরঙের সঙ্গে গঁদের মিশ্রণ। ইংরেজিতে বলা হয় গুয়াশ (gouache)। এই মাধ্যমে জলরং স্বচ্ছ থাকে না। মুঘল চিত্রকলার প্রথমদিকের ছবিতে রঙের ব্যবহার ছিল দ্বিমাত্রিক পদ্ধতিতে আবদ্ধ। এক্ষেত্রে একটি অনুষঙ্গ থেকে অন্য অনুষঙ্গকে পৃথক করার জন্য দুটি বিপরীতধর্মী রং প্রয়োগ করা হতো। যেমন হলুদের পাশে গাঢ় নীল বা লালের পাশে সবুজ। পরবর্তীকালে চিত্রকর্মের বিষয়বস্তুকে আরো বাস্তবানুগ বা দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য মুঘল চিত্রকলায় শেডিং চালু করা হয়। বস্তুত এটি ছিল ইউরোপীয় চিত্রকলার অনুসরণে। শেডিং চালু করার সময় প্রতিটি রঙের সঙ্গে কিছুটা গাঢ় বাদামি বা অন্য কোনো গাঢ় রং মিশিয়ে সরু তুলির রেখায় একটি অংশকে অপর অংশের চেয়ে গাঢ় রঙে প্রতিভাত করে পার্থক্য সৃষ্টি করা হতো। এভাবে প্রতিটি অনুষঙ্গ স্পষ্টরূপে ফুটে উঠত।[২]

রূপরেখা বা ছক (tracing)

মুঘল চিত্রকলায় প্রয়োজন সাপেক্ষে অঙ্কনের সুবিধার্থে রূপরেখা বা ছক (tracing) অনুসৃত হতো। প্রতিকৃতি চিত্রের ক্ষেত্রে চিত্রকর শুরুতেই কাগজে বা চামড়ার ওপর প্রতিকৃতির রেখাচিত্র অঙ্কন করতেন। তারপর প্রতিকৃতির কোন অংশে কি রং প্রয়োগ করতে হবে, সে সব রং দিয়ে চিহ্নিত করে রাখতেন। অথবা ক্ষুদ্রকায় অক্ষরে রঙের নাম লিখে দিতেন। অনেক চিত্রকর রূপরেখা বা ট্রেসিং ব্যবহার করতেন। এরূপ রূপরেখা বা নকশাকৃত চামড়াকে বলা হতো 'চর্‌বা' (charba)। চামড়া থেকে নকশাটি তোলা হতো রেখাচিত্রের পাতে ছুঁচ দিয়ে ছিদ্র করে। তারপর সেসব ছিদ্রগুলোর ওপর মিহি করে কাঠকয়লার গুঁড়া নির্বাচিত কাগজে প্রয়োগ করা হতো। এতে রেখাচিত্র বিশদভাবে ফুটে উঠতো। এভাবে রেখাচিত্রটি ভালোভাবে অঙ্কনের পর তাঁর বিভিন্ন অংশে সুপরিকল্পনা অনুসারে, রং প্রয়োগের রীতির ভিত্তিতে শিল্পীরা নিজেদের কাজ ভাগ করে নিতেন।

---

[১] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 42

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

একদল শিল্পীর কাজ হলো কাগজে রেখাচিত্র অঙ্কন। আরেকদল শিল্পীর কাজ হলো সেগুলোকে রং করা। আরেকদল শিল্পী 'হাশিয়া' তৈরি করতেন। অনেক সময় একই ছবি ওই তিনজন চিত্রকর হাত মিলিয়ে আমল করতেন। আবার অনেক চিত্রকর্মে চারজনও কাজ করতেন।[১]

উল্লেখ্য, পারসিক ও মুঘল চিত্রকলায় কালো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রং। কালো রং শুধু রেখাচিত্র অঙ্কনে ব্যবহৃত হতো এমন নয়। রঙের বিভিন্ন মাত্রা বা শেড (shade) তৈরির ক্ষেত্রেও কালো ছিল অপরিহার্য। প্রতিটি রং বিভিন্ন মাত্রায় বা শেডে তৈরি করা যায়। দুটি গুণাবলীর জন্য মুঘল চিত্রকরদের কাছে Siyahi qalam বা কালো কালি প্রসিদ্ধ ছিল। প্রথমত এটি চিত্রকর্মে অঙ্কন ও শেডিং এর জন্য ব্যবহার করা হতো। দ্বিতীয়ত এটি লেখার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। সিয়াহি কলম দ্বারা একটি লিপিশৈলী চালু হয়। যা *Mustafa-i-roshnai* বলে পরিচিত ছিল। খ্যাতিমান মুসলমান লিপিশিল্পী মুস্তাফার নামে এই নামকরণ হয়।[২]

লিপিকলার ভূমিকা (Calligraphy)

মুঘল চিত্রকলার সঙ্গে লিপিকলার বা লিপিশৈলীর (Calligraphy) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। ইসলামী শিল্পকলার মধ্যে লিপিশৈলী সর্বাধিক পরিমার্জিত, অর্থবহ এবং সুষমামণ্ডিত বিষয় হিসাবে পরিগণিত। মধ্যযুগে মুসলমানদের শিল্পকলার সকল শাখার মধ্যে লিপিকলা বা আরব্য লিপিশৈলী একটি উন্নততর শিল্প হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বস্তুত ইসলামী শিল্পকলায় লিপিশৈলী অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। আরবি হরফের গড়ন ও সৌন্দর্য গভীরতর অর্থে মুসলমানদের বিশেষ নান্দনিক বোধ এবং মৌলিকত্ব নির্দেশ করে। আরব্য শিল্পকলায় পারস্যের শিল্পীরা তাঁদের সর্বোচ্চ দক্ষতা ও শিল্প-কৌশলের নিদর্শন রেখেছন। পারস্যের শিল্পীদের মধ্যে লিপিশিল্পের যে বৈচিত্র্য, রীতি ও কৌশলের ব্যাপকতা লাভ করেছে তা অন্য কোনো জাতির মধ্যে তেমন দেখা যায় না। আরব ও পারস্যবাসী বহু মূল্যবান রত্নপাথরের চেয়ে লিপিশৈলীকে অধিকতর মর্যাদা দিয়ে থাকে। মুসলমান রাজা-বাদশাহগণ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, লিপিশৈলী অত্যন্ত উঁচুদরের শিল্প। এজন্য তাঁরা রাজদরবারে সুদক্ষ লিপিশিল্পীদের বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে নিযুক্ত করতেন।[৩]

---

[১] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

[২] Percy Brown, *op. cit.*, p. 186-187

[৩] Shah Muhammad Shafiqullah, *Calligraphic Art in Sultanate Architecture*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2013, p. 3

আলোকচিত্র ৫.১৭: *শাহনামা'য়* ব্যবহৃত লিপিকলা

পারস্যের প্রসিদ্ধ ইসলামী লিপিশৈলীর ধারা আফগানিস্তান ও মুঘল ভারতে প্রবর্তিত হয়। মুঘল ভারতে 'নাসতালিক'[১] লিপিশৈলী রাজকীয় লিপির মর্যাদা লাভ করে। কুরআন শরীফের অনুলিপি প্রণয়ন আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড বিবেচনা করে সুলতানী ও মুঘল যুগে বহু শাসক কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরিতে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছেন দাস বংশের নাসিরউদ্দীন মাহমুদ এবং মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ বাবুর লিপিশৈলীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'খত্-ই-বাবুরী' বা 'বাবুরী লিপি' নামে এক প্রকার হস্তলিপি প্রচলন করেন। বাদশাহ আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব্য লিপিকলার অসামান্য বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। *তাযকিরা-ই-খুশনবীশান* বা *লিপিকারদের স্মৃতি* নামক একটি পুস্তকে মুঘল লিপিকারদের উল্লেখ আছে। এছাড়াও *আইন-ই-আকবরী* তে আবুল ফজল প্রথিতযশা

[১] মুসলমানদের লিপিশৈলীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রীতি (category) হচ্ছে নাসতালিক, যা লিপিকলাকে স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিয়েছে। নাসখী ও তালিক লিপি পদ্ধতির মার্জিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ হিসাবে নাসতালিক লিপিশৈলী অনন্য। বিশেষত কুফীর কোণাকৃতি নাসখ-এর বিপরীতে সাবলীল, বক্রাকার স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং লীলায়িত ছন্দের প্রকাশে নাসতালিক অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, নাসতালিক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'নাসখ' এবং 'তালিক' শব্দ দুটির সমন্বয়ে। এই লিপিশৈলী পারস্য ও মুঘল ভারতে সর্বজনীনভাবে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, ঢাকা: মজিদ পাবলিকেশন, ২০০৫, পৃ. ৪৪

লিপিশিল্পীদের সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কাশ্মীরের মুহম্মদ হুসাইন। যিনি 'যররীন কলম' বা 'স্বর্ণ কলমধারী' উপাধি লাভ করেন।

জাহাঙ্গীরের শাসনামলকে মুঘল চিত্রকলা ও লিপিশৈলীর স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আকবরের আমলের প্রায় সকল লিপিশিল্পী জাহাঙ্গীরের দরবারি চিত্রকারখানায় যোগ দিয়েছিলেন। শাহজাহান 'ইমাদ' প্রবর্তিত 'নাসতালিক'-এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই শৈলীতে প্রণীত পাণ্ডুলিপিকারদের পুরস্কৃত করেন। প্রায় সকল মুঘল বাদশাহগণের আমলেই লিপিশৈলীর চর্চা অব্যাহত থাকে।[১]

মুঘল দরবারি চিত্রকারখানায় চিত্রকর ছাড়াও থাকতেন লিপিকার। লিপিকারের মর্যাদা অনেকাংশে চিত্রকরের চেয়ে বেশি ছিল। অবশ্য অনেক চিত্রকর লিপিকলায়ও দক্ষ ছিলেন। বিশেষত মুসলমান শিল্পীগণ ইসলাম বিধান অনুযায়ী তুলি হাতে নিয়ে প্রথমেই লিপিকলার শিক্ষা লাভ করেন। মুঘল চিত্রকলায় অধিকাংশ চিত্রকর্মই দেয়ালে টাঙানো হতো না। কারণ অনেক চিত্রকর্ম সৃষ্টি হয়েছে পাণ্ডুলিপি চিত্র হিসাবে অথবা মুরাক্কায় (চিত্রকর্মের অ্যালবাম) সংকলিত চিত্রকর্ম হিসাবে। এজন্য চিত্রকর্ম সমাপ্ত হলেই তা পৃষ্ঠা বাঁধাইকরের হাতে চলে আসতো। তিনি সমান করে কেটে সোনার জলের সঙ্গে রং সংমিশ্রণ করে ছবি আটকাতেন। সোনার রং প্রয়োগের কাজে দক্ষ কারিগরগণ শুধু এই কাজই করতেন। ছবি বাঁধানোর জন্য অন্য লোক নিযুক্ত থাকতেন।[২] মুঘল চিত্রকরদের মধ্যে অনেকেই যেমন ছিলেন দক্ষ লিপিকার, তেমনি ছিলেন রত্ন খোদাইকরও। খাজা আবদুস সামাদকে এঁদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য করা হয়।[৩] মুঘল চিত্রকলায় প্রতিটি শিল্পীর কাজের স্বীকৃতি ছিল। শিল্পীগণ প্রতিটি চিত্রকর্ম সমাপ্ত করার পর চিত্রের কোণায় অনুপম লিপিশৈলী দ্বারা স্বাক্ষর দিতেন (amal, kar, navishtah, likhitam etc.)। এরপর চিত্রকর্ম একক, পাণ্ডুলিপি চিত্র এবং মুরাক্কা চিত্র হিসাবে সংরক্ষিত হতো।[৪]

৫.৩ বিষয় ও শৈলী

মুঘল দরবারি প্রতিকৃতি চিত্রঃ

মুঘল চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে প্রতিকৃতি চিত্র (portrait painting)। মুঘল আমলে প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কন বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। মুঘল বাদশাহগণ চিত্রশিল্পীদের দ্বারা নিজেদের প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কন করাতেন। কারণ তাঁদের মধ্যে মৃত্যুর পরেও নিজেদের স্মরণীয় বা অমর করে রাখার বাসনা ছিল। মুঘল চিত্রকলায় বাদশাহ, নবাব, ওমরাহ, সেনাধ্যক্ষ, কবি, লেখক প্রমুখ

---

[১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৪] Moti Chandra, *op. cit.*, p. 47

ব্যক্তিত্বদের অনেক প্রতিকৃতির নিদর্শন এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মুঘল শিল্পীরা শুধু মুখাবয়ব আঁকেননি, একইসঙ্গে তাঁরা মুখাবয়বের অন্তর্গত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা character চিত্রকর্মে প্রতিভাত করেছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ বাবুর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর রেঙ্গুনে (বর্তমানে ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার) নির্বাসনে থাকাকালীন ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সাম্রাজ্যের শুরু থেকে শেষ অবধি- এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অসংখ্য প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[১] মুঘল প্রতিকৃতিচিত্রের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও নান্দনিক চাহিদার এক অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে। ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় এখানে প্রকাশিত হয় তাঁর সামাজিক মর্যাদা, অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে। বাদশাহ, যোদ্ধা, শাহজাদা, দরবেশ, কারিগর সকলেই এক বিশাল ঐতিহাসিক কাহিনির চরিত্র হিসাবে চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হন দর্শকের সম্মুখে। এরূপ বিবিধ প্রতিকৃতির মাধ্যমে প্রতিভাত হয় ইতিহাসের বিবৃতির ধারা। যুদ্ধক্ষেত্র, দরবার, দরবেশের আশ্রম যেমন কাহিনির অন্তর্গত পরিবেশে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে, তেমনি মানুষগুলোও তাঁদের ভূমিকায় সচল থেকেছেন। বস্তুত প্রতিকৃতিচিত্রসমূহ ইতিহাসের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ কাজ করেছে।[২] পার্সি ব্রাউনের মতে, এশিয়ার চিত্রশিল্পের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে প্রতিকৃতি চিত্র। কিন্তু লক্ষণীয় যে, মুঘল চিত্রকলার মতো অপরাপর কোনো শিল্পশৈলীতে প্রতিকৃতিচিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়নি।[৩]

ভারতবর্ষে মুঘলগণ তাঁদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন মঙ্গোল জাতির কাছে প্রতিকৃতি অঙ্কনের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। চীনে, পারস্যে মঙ্গোল সম্রাটগণ প্রতিকৃতি চিত্রের প্রতি ব্যাপক উৎসাহী ছিলেন। খ্যাতিমান মুসলমান পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দে চীনের মঙ্গোল দরবারে গমন করেছিলেন। তিনি তাঁর লেখায় প্রতিকৃতি চিত্রকলার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।[৪]

মুঘল চিত্রকলায় প্রধানত দুই ধরনের প্রতিকৃতি চিত্র লক্ষ করা যায়। যথা:

১) পার্শ্বপ্রতিকৃতি বা প্রোফাইল (profile face) ও

২) তিন-চতুর্থাংশ বা থ্রি-কোয়ার্টার্স প্রতিকৃতি (three-quarter face)

পার্শ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে মুখাবয়ব একপাশ থেকে দেখা যায়। তিন-চতুর্থাংশ প্রতিকৃতির ক্ষেত্রেও প্রতিকৃতি পার্শ্ব থেকে অঙ্কিত। তবে এক্ষেত্রে প্রতিকৃতির পাশাপাশি তিন-চতুর্থাংশ দেহাবয়ব অঙ্কিত হয়। এই

---

[১] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ১১২

[২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩] Percy Brown, *op. cit.*, p. 141

[৪] *Ibid,* p. 141

দুই ধরনের প্রতিকৃতিচিত্রই প্রায় একই সময়ে চর্চা ও বিকাশ লাভ করে।[১] অধিকাংশ মুঘল প্রতিকৃতি চিত্র পার্শ্ব থেকে বা প্রোফাইল ভঙ্গিতে অঙ্কিত হয়েছে। এ ধরনের রীতির প্রতিকৃতির মধ্যে স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্য আনা দুরূহ। অবশ্য অনেক সময় মুখাবয়বের ২/৩ ভাগ বা ৩/৪ ভাগ অংশও প্রতিকৃতি চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। দেহাবয়ব সম্মুখ থেকে অঙ্কিত কিন্তু প্রতিকৃতি প্রোফাইলে আছে, এরূপ চিত্রকর্মও রয়েছে। বস্তুত সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতি আঁকার ক্ষেত্রে শিল্পীগণ ২/৩ ভাগ বা ৩/৪ ভাগ অংশ মুখাবয়ব আঁকতেন। পার্শ্বপ্রতিকৃতি বা প্রোফাইল কেবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ও বাদশাহগণের প্রতিকৃতিচিত্র অঙ্কনের জন্য চালু ছিল। কারণ পার্শ্বপ্রতিকৃতির মধ্যে দুর্নমনীয়তা, কাঠিন্য ও দেবসুলভ অতিকায়ত্বের ব্যঞ্জনা ও সম্ভাবনা প্রবলভাবে প্রতিভাত হয়।[২]

বাবুর ও হুমায়ূন প্রধানত নিসর্গ, মানুষ, বৃক্ষ, ফুল ও পাখির পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়নে উৎসাহী ছিলেন। আকবরের আমল থেকেই দেহাবয়ব ও প্রতিকৃতিচিত্রের প্রকৃত স্বরূপ লক্ষ করা যায়। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের প্রতিকৃতিচিত্রে তাঁদের বয়সবৃদ্ধি, শারীরিক পরিবর্তন এবং সময়ের ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু বাবুর ও হুমায়ূনের প্রতিকৃতিচিত্রের পারসিক রীতির মতোই একই ধরনের মুখাবয়ব, ভঙ্গি এবং পোশাক-পরিচ্ছদ লক্ষণীয়। এর সার্থক উদাহরণ হলো *বাবুরনামা* ও *খানদান-ই-তিমুরিয়ার* চিত্রকর্মসমূহ। এখানে তৈমুর, বাবুর ও হুমায়ূনের প্রতিকৃতিচিত্রগুলো পৃথকভাবে শনাক্ত করা যায় না। এছাড়াও হুমায়ূন ও আকবরের জন্মের দৃশ্যে তাঁদের প্রতিকৃতিচিত্র বস্তুত দুই আদর্শ পুরুষের। সেখানে তাঁদের মুখাবয়বে বাস্তবের অনুসরণে নেই কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ঠিক এই অভিজ্ঞতা থেকে মুঘল শিল্প-ঐতিহাসিকগণ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তা হচ্ছে, ঐতিহাসিক চরিত্র শনাক্ত করতে আকবরের রাজত্ব থেকে অঙ্কিত প্রতিকৃতিচিত্রসমূহের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য।[৩]

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রতিকৃতি অঙ্কন বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে। এ সময় প্রতিকৃতি চিত্র অসামান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ব্যক্তির বাস্তবানুগ স্বাতন্ত্রে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আকবরের রাজত্বে মিনিয়েচর অধিক গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় পাণ্ডুলিপি-চিত্রাবলী অপেক্ষা একক ও বিচ্ছিন্ন চিত্রকর্ম অঞ্চলে চিত্রকরগণ অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। প্রতিকৃতি অঙ্কনরীতি মুঘল চিত্রশিল্পকে পাণ্ডুলিপি নির্ভর চিত্রকর্ম থেকে মুক্ত করে এবং ব্যক্তির বাস্তবানুগ চরিত্র রূপায়ণে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। জাহাঙ্গীর চিত্রকলার প্রতি বিশেষত প্রতিকৃতি চিত্রের গভীর অনুরাগী ছিলেন। ফলে জাহাঙ্গীরের তত্ত্বাবধানেই অঙ্কিত হয়েছে তাঁর শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সকল পর্যায়ের

---

[১] Percy Brown, *Ibid,* p. 158-159

[২] অশোক মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪

[৩] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

প্রতিকৃতি। জাহাঙ্গীর শুধু নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য চিত্রকরদের উৎসাহিত করেছেন তা নয়। তাঁর আমলেই আমীর-ওমরাহদের প্রতিকৃতিচিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।[১]

মুঘল চিত্রকলায় অধিকাংশ পুরুষ-প্রতিকৃতি চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। এ কারণে মুঘল চিত্রকলাকে পুরুষপ্রধান শিল্পশৈলী বলা হয়। মুঘল হেরেমের অবগুণ্ঠনবতী নারীদের প্রতিকৃতি এজন্য সচরাচর দেখা যায় না।[২] এতদসত্ত্বেও কয়েকজন রাজমহিষীর প্রতিকৃতিচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে নূরজাহান ও মমতাজমহল অন্যতম। এছাড়াও মুঘল চিত্রকলায় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব- দরবেশ, সুফি, সাধক, সন্ন্যাসী, অশ্বারোহী প্রমুখ চরিত্রসমূহের প্রতিকৃতিচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

পশুপাখির প্রতিকৃতি চিত্র

মুঘল চিত্রকলায় প্রাণিজগতের চিত্রায়ন বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। পশুপাখির প্রতিকৃতিচিত্র রীতি মুঘল চিত্রশিল্পে অসামান্য উৎকর্ষমণ্ডিত হয়েছে। প্রথম যুগে আকবরের আমলে প্রাণিজগতের চিত্রে পারসিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। অশ্বের চিত্রকর্মে বিশেষভাবে পারসিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পারসিক মিনিয়েচরের যে সকল গৃহপালিত প্রাণির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, মুঘল চিত্রকর্মেও সে সকল প্রাণি আছে। যথা- উষ্ট্র, গাভী, মেষ, ছাগল। আকবরের পরবর্তী যুগে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের আমলে প্রাণিজগতের চিত্রায়ণে বাস্তবানুগ রীতি অনুসরণ করা হয়। এ সময় পারসিক রীতির বিলুপ্তি ঘটে। বিশেষভাবে হস্তীর চিত্রে এ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্যে পশুমূর্তির ক্ষেত্রে হস্তী শীর্ষস্থানে রয়েছে। এছাড়া হরিণের চিত্রও ভারতীয় শিল্পে অসামান্য গুরুত্ব পেয়েছে। পুরুষ হরিণের কালো দেহে সাদা দাগ আছে আর স্ত্রী হরিণের রং বাদামি। *হামজানামা* এবং *রজমনামা*'তে বানরের চিত্র প্রায় লক্ষ করা যায়। *বাবুরনামা*তে প্রাণিজগতের বহু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হস্তী, গন্ডার, মহিষ, কৃষ্ণসাগর, বন্য ছাগল এবং সর্বজাতীয় পক্ষী আকর্ষণীয়। জাহাঙ্গীর প্রাণিজগতের চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি শুধু শিল্পানুরাগী ছিলেন না, কিউরিও হিসাবে নানা প্রকারের পশুপাখি সংগ্রহে উৎসাহী ছিলেন। মুঘল শিল্পীদের প্রায় সকলেই শিকারের দৃশ্য ভালবাসতেন।

জাহাঙ্গীরের একটি পশুশালা ছিল। সেখানে বিভিন্ন প্রাণিসহ প্রায় শতাধিক সিংহ ছিল। টার্কি মোরগ প্রথম মুঘলদের পশুশালায় আমদানি করা হয়। এরপর এর চিত্র অঙ্কন করেন শিল্পীরা। এটি জাহাঙ্গীরের আমলের গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর্ম। এছাড়াও বাজপাখি এবং দুটি সারসের চিত্র উল্লেখযোগ্য। এসকল চিত্র ওস্তাদ মনসুরের আঁকা। মনসুরের ন্যায় আরো একজন বিখ্যাত প্রাণি-চিত্রকর ছিলেন

---

[১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, মুসলিম চিত্রকলা, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ৩৪০-৩৪১

[২] Som Prakash Verma, *Mughal Painting*, New Delhi: Oxford University Press, 2014, Pp. 78-79

মনোহর। তিনি শিংওয়ালা হরিণ এঁকেছেন। জাহাঙ্গীর নিজে এটি চালনা করছেন। ওস্তাদ মনসুরের বিখ্যাত চিত্র জেব্রার প্রতিকৃতি। জাহাঙ্গীরের আমলের পশুপাখি অঙ্কনের ঐতিহ্য শাহজাহানের আমলেও বজায় ছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মুহম্মদ নাদির। তাঁর আঁকা বাজপাখির চিত্র উল্লেখযোগ্য।[১]

ফুল-লতাপাতা ও নিসর্গচিত্র

মুঘল চিত্রকলা বিষয়বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা, উৎকর্ষতা এবং দক্ষতার দিক থেকে বিশ্ব শিল্পকলায় কালজয়ী অবদান রেখেছে। মুঘল চিত্রকরগণ কেবল মনুষ্য প্রতিকৃতি, দেহাবয়ব, পশুপাখির প্রতিকৃতি অঙ্কনেই তাঁদের সৃজনশীল দক্ষতা সীমাবদ্ধ রাখেননি। প্রকৃতি তাঁদেরকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছে। এক্ষেত্রে মুঘল বাদশাহগণের গভীর অনুরাগ, উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান ছিল অতুলনীয়। প্রতিকৃতি অঙ্কনে মুঘল চিত্রকরগণ যে শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাঁরা ফুল-লতাপাতা, নিসর্গচিত্র এবং উদ্ভিদজগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কনেও যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বলাই বাহুল্য, জাহাঙ্গীরের আমলেই পশুপাখি, ফুল-লতা-পাতা ও নিসর্গচিত্র উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছে। জাহাঙ্গীর জীবনের অনেক সময় সফর করেই অতিবাহিত করেছেন। উপভোগ করেছেন উদ্যান ও ফুলের সৌন্দর্য। তিনি আজমীরে 'চসমা-ই-নূর' (*chashma-i-Nur* or fountain of lisht) বা 'আলোর ফোয়ারা' নামে এক উদ্যানপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রাসাদ গ্যালারির মতো বিপুল চিত্রকর্ম দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানে হুমায়ূন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহ আব্বাসের প্রতিকৃতিচিত্র ছিল।[২]

কাশ্মীরের অতুলনীয় নিসর্গের জন্য জাহাঙ্গীরের গভীর অনুরাগ ছিল। কাশ্মীরের উপত্যকার সৌন্দর্যে বাদশাহের কবিমন বিমোহিত থাকতো। অনেক সময় তিনি কাশ্মীরের মায়াবী পরিবেশে এসে বিশ্রাম নিয়েছেন। ফুল-লতাপাতা ও নিসর্গের টানে এখানে তিনি মনোমুগ্ধকর মুঘল উদ্যান রচনা করেছিলেন।[৩] ফুলের সৌন্দর্যে বাদশাহ জাহাঙ্গীর গভীরভাবে বিমোহিত থাকতেন। এমন দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। বাদশাহের আদেশে ওস্তাদ মনসুর একশত প্রকারের অধিক ফুলের ছবি এঁকেছিলেন।[৪] নার্সিসাস, টিউলিপ, লাল গোলাপ, লিলি প্রভৃতি ফুলের অসামান্য সব ছবি মুঘল চিত্রকলাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

---

[১] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫

[২] Percy Brown, *op. cit.*, p. 85

[৩] *Ibid*, p. 73

[৪] মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

মুঘল চিত্রকর্মের সীমানা-অলঙ্করণ

মুঘল চিত্রকলায় চিত্রকর্মের সীমানা-অলঙ্করণ (border decoration) বা 'হাশিয়া' (hashiya) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বস্তুত এটি চিত্রকর্মের মাধ্যমিক (secondary) অংশ। তথাপি, মুঘল চিত্রকরগণ চিত্রকর্মের সীমানা-অলঙ্করণকে প্রয়োজনীয় অংশ বিবেচনায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শুরুর দিকে চিত্রকর্মের প্রান্তীয় পরিসর (outlines or margins of the painting) নিয়ম মাফিক সম্পন্ন করা হতো। কিন্তু এক পর্যায়ে শিল্পীগণ স্বাধীনভাবে চিত্রকর্মের প্রান্তীয় সরু পরিসরে প্রয়োজনের অধিক সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ শুরু করেন। শিল্পীগণ সেখানে চিত্রকর্মের বিপরীতধর্মী রং বা প্রধান বৈশিষ্ট্য (motif) অঙ্কন করে চিত্রের মূল বিষয়বস্তুকে জোরালোভাবে ফুটিয়ে তুলতেন। এছাড়া চিত্রকর্মের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রং, অনুষঙ্গ, ফুল-লতাপাতা, প্রাণিজগত, বিবিধ নকশা- যেমন: আরব্য নকশা (arabesques) ও জ্যামিতিক মোটিভ প্রভৃতির মাধ্যমে নান্দনিকভাবে প্রান্তীয় পরিসরে চিত্রিত করতেন। এভাবে শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকের গভীর অনুরাগ ও যুগ্ম চাহিদার ফলে চিত্রকর্মের সীমানা অলঙ্করণ বা হাশিয়া ক্রমশ উৎকর্ষমন্ডিত হয়।[১]

আলোকচিত্র ৫.১৮: জাহাঙ্গীর পিতা আকবরের প্রতিকৃতি ধরে আছেন (শিল্পী আবুল হাসান অঙ্কিত)। এই চিত্রে 'হাশিয়া' ব্যবহৃত হয়েছে। (সূত্র: www.mughalpaintings.com)

[১] Som Prakash Verma, *op. cit.*, p. 111

ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষে যখন মুঘল চিত্রকলার সূচনা হয়, তখন পারসিক চিত্রকলার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে হাশিয়ার প্রচলন হয়। বস্তুত জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই মুঘল চিত্রকলায় হাশিয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করে। *তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী*'তে বর্ণিত তথ্য থেকে ধারণা করা যায় যে, পারসিক শিল্পী আকা রিজা ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল রাজদরবারে আগমনের পর হাশিয়া এবং মুরাক্কা (চিত্রিত অ্যালবাম) রীতির বিশেষ প্রচলন শুরু হয়।[১]

ইসলামী চিত্রকলায় হাশিয়ার গুরুত্ব মূল চিত্রকর্ম বা মিনিয়েচরের পরের ধাপে। কিন্তু মুঘল শিল্পীগণ হাশিয়াকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মূল চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু এবং এর নান্দনিকতা ও শৈল্পিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য হাশিয়া অলঙ্করণ করতেন। বস্তুত হাশিয়ার প্রায়োগিক এবং মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে মূল চিত্রকর্মকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বন্ধনীতে (mount) আবদ্ধ করা। মূল চিত্রকর্মের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হলে হাশিয়া অলঙ্করণের কাজ অপর চিত্রকর ও কারিগরদের নিকট অর্পণ করা হতো। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে মূল চিত্রকর্মের শিল্পী হাশিয়াও অঙ্কন করেছেন। মুঘল চিত্রকর্মের হাশিয়ায় শিল্পীগণ পাণ্ডুলিপি ও মিনিয়েচরের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নকশা অঙ্কন করতেন। যেমন- চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু শিকারের দৃশ্য হলে হাশিয়াতে তার প্রতিফলন ঘটতো। অর্থাৎ হিংস্র পশু তার শিকার হিসাবে অন্য প্রাণিকে আক্রমণ করছে- এরূপ বিষয় হাশিয়ায় অঙ্কিত হয়েছে। চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু যদি প্রয়াত কোনো বাদশাহের প্রতিকৃতিচিত্র হয়, সেই ক্ষেত্রে হাশিয়াতে প্রাকৃতিক পটভূমির মাঝে কয়েকটি একক প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হতো। সেসব প্রতিকৃতির মধ্যে ছত্রধর, ঢাল-তলোয়ার হাতে মুঘল সেনাসদস্য, হুকুমের জন্য অপেক্ষমাণ পরিচারক- এ ধরনের মুঘল কুশীলব অঙ্কন করা হয়েছে।[২]

মিনিয়েচর ব্যতিত হাশিয়ার উৎকৃষ্ট অলঙ্করণ দেখা যায় বিভিন্ন মুঘল মুরাক্কা (muraqqa) বা চিত্রিত অ্যালবামে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের নির্দেশে অঙ্কিত মুরাক্কাগুলোতে বাস্তবানুগ নিসর্গচিত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মনুষ্য প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত 'মুরাক্কা-ই-গুলশান'-এ (Gulshan Album) এরূপ হাশিয়ার দেখা মেলে। জাহাঙ্গীরের নির্দেশ মোতাবেক চিত্রশিল্পী দৌলত 'মুরাক্কা-ই-গুলশান'র হাশিয়াতে তাঁর কয়েকজন সহকর্মী-শিল্পীর প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কন করেন। যথা: মনোহর, গোবর্ধন, বিশন দাশ ও আবুল হাসান। এছাড়াও খ্যাতিমান পারসিক শিল্পী বিহজাদের

---

[১] এ বি এম হোসেন, ইসলামী চিত্রকলা, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৪, পৃ. ১৯৩

[২] নাজমা খান মজলিস, "মুঘল মিনিয়েচরে হাশিয়া (১৫৫৬-১৬৫৮ খ্রি.)", (সম্পা. মমতাজুর রহমান তরফদার ও অজয় রায়) *ইতিহাস*, ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, পৃ. ৫

একটি মূল চিত্রকর্মের অনুকরণে ওই অ্যালবামের হাশিয়ায় শিল্পী দৌলত পারসিক কবি জামির একটি অনুপম প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কন করেন।

শাহজাহানের আমলের চিত্রকর্মের হাশিয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফুল-লতাপাতা সম্বলিত নকশা, নিসর্গচিত্র এবং প্রাণিজগতের বিষয় অঙ্কিত হয়েছে। অবশ্য কিছু হাশিয়াতে নিসর্গের পটভূমিতে মনুষ্য প্রতিকৃতিচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।[১] কালক্রমে মুঘল চিত্রকলায় 'হাশিয়া' একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশের মর্যাদা লাভ করেছে। এমনিক মুঘল চিত্রকলার একটি আইকন অংশ হিসাবে 'হাশিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শৈলী

পার্সি ব্রাউন মুঘল চিত্রকলার তিনটি প্রধান শৈলী (style) বা কলম (*qalam*) চিহ্নিত করেছেন। যথা: ১) দিল্লি কলম; ২) ইরানী কলম এবং ৩) সিয়াহি কলম।

দিল্লি কলম বা শৈলী হচ্ছে দিল্লির মুঘল রাজদরবারে চিত্রকারখানায় গড়ে ওঠা মুঘল চিত্রকলা। এছাড়া আগ্রা, আজমীর, মান্ডু, ফতেহপুর সিক্রি এবং লাহোরের রাজকীয় চিত্রকারখানায় অঙ্কিত চিত্রকর্মসমূহও দিল্লি কলমের অন্তর্ভুক্ত।

ইরানী কলম বা শৈলী হচ্ছে পারস্যের সাফাভি চিত্রশৈলীর অনুসরণে অঙ্কিত চিত্রকর্ম। মুঘল চিত্রকলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ইরানী কলমের অনুসরণে চিত্রকলা চর্চা হয়েছে। এমনকি পরবর্তী কালেও ইরানী শৈলীর অনুসরণে অঙ্কিত কিছু চিত্রকর্মের দেখা মেলে।

সিয়াহি কলম (*siyahi qalam*) হচ্ছে কালো রঙের কালি দ্বারা অঙ্কিত চিত্রকর্ম বা চিত্রশৈলী। এটিও সরাসরি পারসিক শিল্পশৈলী। সিয়াহি কলমের অনুসরণে মুঘল চিত্রকলায় প্রতিকৃতি চিত্রে কালো কালি দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রেখাচিত্র অঙ্কন করা হতো। অনেক সময় গাঢ় বাদামি (sepia) রং-ও ব্যবহার করা হতো। প্রয়োজন সাপেক্ষে স্বর্ণচূর্ণের রং সংমিশ্রণ করা হতো। সিয়াহি কলম চিত্রকর্মে চূড়ান্ত রেখাচিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ।[২]

---

[১] নাজমা খান মজলিস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[২] Percy Brown, *op. cit.*, p. 193

পার্সি ব্রাউন মুঘল চিত্রকলার কয়েকটি সম্পূরক শিল্পশৈলী (subsidiary) বা প্রাদেশিক মুঘল রীতির উল্লেখ করেছেন। যথা:

১) হায়দ্রাবাদি বা দক্ষিণী শৈলী;

২) মুর্শিদাবাদ শৈলী;

৩) কাশ্মীরী শৈলী;

৪) লক্ষ্ণৌ শৈলী এবং

৫) পাটনা শৈলী।

মুঘল সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের দরবারে উল্লিখিত কলম বা শিল্পশৈলীর উদ্ভব হয়। মুঘল শৈলীর অনুসরণে এই শৈলীসমূহ বিকাশ লাভ করে। এসব শৈলীর কিছু কাজে রং ও অঙ্কনে নান্দনিকতা লক্ষ করা যায়। প্রধান মুঘল শৈলীর সঙ্গে তুলনার প্রেক্ষিতে এগুলোর দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়।[১]

[১] Percy Brown, *Ibid*, Pp. 193-194

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

মুঘল চিত্রকলা শুধু ভারতবর্ষেই নয় বরং বিশ্বচিত্রকলার ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবেও চিহ্নিত হয়ে আছে। মুঘল চিত্রকলার উন্মেষ ও প্রাথমিক যুগের সূচনা হয় হুমায়ূনের পৃষ্ঠপোষকতায়। তিনি ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাসন জীবন অতিবাহিত করে পারস্যের শিল্পী মীর সৈয়দ আলী ও খাজা আব্দুস সামাদকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় মুঘল চিত্রকলায় পারসিক চিত্ররীতির ব্যাপক প্রভাব ছিল। এ জন্য প্রাথমিক যুগের চিত্রকর্মসমূহ 'ইন্দো-পারস্য স্কুল' -এর কাজ হিসাবে বিবেচিত। মুঘল চিত্রকলার প্রথম পর্যায়ের সূচনা হুমায়ূনের রাজত্বে হলেও, আকবরের দূরদর্শিতা এবং একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রশিল্পের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আকবর ছিলেন মুঘল চিত্রকলার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) মুঘল চিত্রকলার ব্যাপক উন্নতি হয়। আকবরের রাজত্বের অবসানে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে মুঘল চিত্রকলা উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তিনি চিত্রকলার প্রকৃত সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলা ভারতীয় ও পারসিক চিত্ররীতির প্রভাব এবং উপাদানের সংমিশ্রণে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুঘল চিত্ররীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য জাহাঙ্গীরের আমলকে মুঘল চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শাহজাহানের দরবারে চিত্রকলার চেয়ে স্থাপত্য শিল্প অধিক গুরুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বলাই বাহুল্য, শাহজাহান অকুণ্ঠচিত্তে স্থাপত্যের জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন। এ কারণে তাঁর রাজত্বে মুঘল চিত্রকলার বিকাশ থেমে যায়। প্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রতি আওরঙ্গজেবের বৈরী মনোভাব মুঘল চিত্রশিল্পের অবক্ষয় ত্বরান্বিত করে। তাঁর আমলে চিত্রকলা পূর্ববর্তী বাদশাহগণের তুলনায় কম পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। আওরঙ্গজেবের পরেই দুর্বল মুঘল বাদশাহের রাজত্বে চিত্রকলার অবসান হয়।

প্রকৃতঅর্থে মুঘল সাম্রাজ্য বাদশাহ আওরঙ্গজেবের প্রয়াণের মধ্য দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বুনিয়াদ ভেঙে পড়তে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই মুঘল রাজদরবারে যে শিল্পশৈলীর জন্ম হয়, অষ্টাদশ শতকে তার অবক্ষয় হতে থাকে।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে একদিকে শাহজাদাদের মধ্যে লড়াই, অপরদিকে প্রাদেশিক শক্তির উত্থান মুঘল সাম্রাজ্যকে ক্রমশ সংকুচিত করে আনে। এ সময় অনেক দরবারি শিল্পী কর্মচ্যুত

হন। জীবিকার তাগিদে তাঁরা বাধ্য হয়ে আশ্রয় খোঁজেন বিভিন্ন রাজ্যে। এরূপ টালমাটাল সময়ে অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও বাংলায় মুঘল শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামোটি বজায় থাকে। বিশেষত বাংলার মুর্শিদাবাদে যে শিল্পশৈলী গড়ে ওঠে, তা পর্যবেক্ষণ করে মুঘল দরবারি শিল্পের শেষ পর্বের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। যেরূপ দরবারি আদবকায়দা ও শিল্প-সংস্কৃতি মুঘলদের মধ্যে চর্চা হতো, তা নতুনভাবে মুর্শিদাবাদের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকেই মুর্শিদাবাদ পূর্ব-ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির একটি বৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। বহু দক্ষ মুঘল শিল্পী, কারিগর, বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিরা মুর্শিদাবাদে কাজের সুযোগ পান। বস্তুত বাংলার নবাবগণ ছিলেন অনেকাংশে মুঘলদের মতোই শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। চিত্রকলার মাধ্যমে তাঁরাও নিজেদের ভাবমূর্তি প্রকাশের প্রয়াস পান। এক্ষেত্রে মুঘল চিত্রকলার ঐতিহ্যই গ্রহণ করেন মুর্শিদাবাদের শিল্পীগণ। মুঘল দরবারি শিল্পীরা যেরূপ মুঘল বংশের ইতিহাস ও বাদশাহগণের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ চিত্রকর্মে প্রতিভাত করতেন, মুর্শিদাবাদের চিত্রকলায়ও এই আদর্শ অনুসৃত হয়।

এ পর্যায়ে মুঘল ঢাকা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) নির্দেশে ইসলাম খান চিশতী ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। তিনি এই সময় মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ক্ষমতাসীন মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নামকরণ হয় জাহাঙ্গীনগর। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বাংলা রাজধানীতে পরিণত হওয়ার পর ঢাকার মর্যাদা পরবর্তী এক শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। এই সময় প্রশাসনিক সদর দপ্তর, সুবাদারের বাসস্থান এবং অন্যান্য রাজকীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যালয় ঢাকাতেই গড়ে ওঠে। অবশ্য শাহজাদা শাহ সুজা তাঁর সুবাদারিকালে একান্ত ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে ঢাকা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অর্থাৎ ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ সাল পর্যন্ত বিশ বছর এই ব্যবস্থা বজায় ছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেব ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শাহ সুজা আরাকানে পালিয়ে যান। এরপর পরবর্তী নতুন সুবাদার মীর জুমলা পনুরায় ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। তখন থেকে শাহজাদা আজিম-উদ-দ্বীনের সুবাদারিকাল (১৬৯৮-১৭১২ খ্রি) পর্যন্ত ঢাকা মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। উল্লেখ্য, নবাব শায়েস্তা খানের সুবাদারিকালে (১৬৬৪-১৬৭৮ এবং পুনরায় ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রি.) সম্প্রসারণ ও নির্মাণ উভয়ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। বাংলায় মুঘল শাসন বস্তুত দুটি পর্বে পরিচালিত হয়। যথা- সুবাদারি শাসন ও নবাবি শাসন।

বাংলায় মুঘল সুবাদারির প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খান চিশতী ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে মারা যাওয়ার পর বেশ কয়েকজন সুবাদার বাংলা শাসন করেছিলেন। এ পর্বের পাঁচজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুবাদার হচ্ছেন

শাহজাদা শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.), মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৪ খ্রি.), শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৭৮ এবং পুনরায় ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রি.), আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজম শাহ (১৬৭৮-১৬৭৯ খ্রি.) এবং আওরঙ্গজেবের পৌত্র শাহজাদা আজিম-উদ-দ্বীন (১৬৯৮-১৭১২ খ্রি.)। এঁদের শাসনকালে রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র বাংলা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে।

সুবাদার আজিম-উদ-দ্বীনে মৃত্যুর পর তাঁর দক্ষ দিওয়ান মুর্শিদকুলী খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয়। এই সময় থেকে বাংলা অনেকাংশে স্বাধীন হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, মুর্শিদকুলী খানের নামের শুরুতে প্রথম 'নবাব' শব্দটি যুক্ত হয়। এ পর্বে সুবাকে (প্রদেশ) বলা হতো 'নিজামত' আর সুবাদারের পদবি হয় নাজিম। এরপর থেকে 'নাজিম' পদবি হয়ে পড়ে বংশগত। সুবাদার বা নাজিমগণ সিংহাসনে বসে মুঘল বাদশাহগণের নিকট শুধু একটি অনুমোদন নিয়ে নিতেন। এজন্য আঠারো শতকে বাংলায় মুঘল শাসনের ইতিহাস নিজামত বা নবাবি আমলরূপে পরিচিত।

বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকলাসমূহ মুঘল সুবা বাংলার ইতিহাসের আকর উপাদান হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়। মুঘল চিত্রকলা নিঃসন্দেহে একটি অসামান্য শিল্পশৈলী। এই শৈলীর অন্তর্গত প্রতিটি চিত্রকর্মই নির্দিষ্ট সময় এবং সামাজিক সম্পর্কের নিদর্শন। গভীরতর অর্থে মুঘল চিত্রকলা সেকালের সমাজব্যবস্থা ও জীবনের দলিল বিশেষ। বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিন পর্বে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) দরবারি মুঘল চিত্রকলা

খ) প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলা ও

গ) নবাবি আমলের চিত্রকলা।

দরবারি মুঘল চিত্রকর্মসমূহে আকর মুঘল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বিদ্যমান থাকে। বিশেষত শিল্পীর মুনশিয়ানা, পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ, চিত্রকর্মের অন্তর্গত জৌলুশ প্রভৃতি গুণ অনুধাবন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি চিত্রকর্মের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত চিত্রকর্ম "মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের প্রতিকৃতি", লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত চিত্রকর্ম "সিংহাসনে বসা সম্রাট আওরঙ্গজেব" এবং "শাহজাদা আজম শাহের প্রতিকৃতি"। এছাড়া বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত চিত্রকর্ম "ইতিমাদ-উদ-দৌলার প্রতিকৃতি" এবং "মুঘল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের আবক্ষ প্রতিকৃতি" উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত মমতাজ মহলের প্রতিকৃতি চিত্রটি হাতির দাঁতের ফলকের ওপর বিশেষ মূল্যবান রং দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং বিরল ধরনের নিদর্শন। বাংলাদেশে এ ধরনের মুঘল চিত্রকর্ম শুধু এই একটিই সংরক্ষিত রয়েছে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাজদরবারের অনেক দক্ষ শিল্পী বিভিন্ন প্রাদেশিক দরবারের চিত্রকারখানায় নিযুক্ত হন। এ সময় অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মুর্শিদাবাদসহ অনেক রাজ্যে প্রাদেশিক মুঘল চিত্রশৈলী গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের সংরক্ষণে কিছু সংখ্যক প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকর্মের নিদর্শন আছে। সেসবের মধ্যে কয়েকটি চিত্রকর্মের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা: লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত চিত্রকর্ম "দুরদানার প্রতিকৃতি", "আসফ জাহ বাহাদুরের প্রতিকৃতি" এবং "যুবরাজ ও রাজ-তনয়ার অশ্বচালনা"- এই চিত্রকর্মসমূহে মুর্শিদাবাদ চিত্রশৈলীর বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ পরিলক্ষিত হয়েছে। ঢাকার ইতিহাসের সঙ্গে এগুলোর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

মুঘল শাসনামলের আওতাভুক্ত আছে নবাবি আমল ও ঢাকার নায়েব-ই-নাজিমদের কাল। মুঘল চিত্রকলা ও প্রাদেশিক মুঘল চিত্রশৈলীর সংমিশ্রণে সে সময় এক ধরনের জৌলুশহীন, অনাড়ম্বর চিত্রকলার চর্চা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ঢাকার কয়েকজন নায়েব-ই-নাজিমের প্রতিকৃতি চিত্র সংরক্ষিত রয়েছে। যথা: "ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম হাসমত জঙ্গের প্রতিকৃতি (১৭৭৮-১৭৮৫ খ্রি.)", "ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম নুসরত জঙ্গ বাহাদুরের প্রতিকৃতি (১৭৮৫-১৮২২ খ্রি.)", "ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম কমর-উদ-দৌলাহর প্রতিকৃতি" এবং "ঢাকার নায়েব-ই-নাজিম গাজী-উদ-দ্বীন হায়দারের প্রতিকৃতি" শীর্ষক চিত্রকর্মসমূহ উল্লেখযোগ্য।

নুসরত জঙ্গের পৃষ্ঠপোষকতায় অঙ্কিত 'ঢাকার জলরং' শীর্ষক সেকালের ঢাকার ঈদ মিছিল ও মুহররম মিছিলের চিত্রকর্মসমূহে মুঘল চিত্রকলার প্রভাব দেখা যায়। এগুলোর বর্ণনাত্মক আবহ, বহুমাত্রিক পরিপ্রেক্ষিত, চরিত্রসমূহের পোশাক-পরিচ্ছদ, অঙ্কনশৈলী ইত্যাদি বিষয় মুঘল চিত্রকলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুঘল চিত্রকলার প্রভাবে সৃষ্ট চিত্রকর্ম হিসাবে এগুলোই বাংলাদেশের সর্বশেষ নিদর্শন।

মুঘল চিত্রকলায় পারস্যের মহাকবি আবুল কাশেম ফেরদৌসীর অমর মহাকাব্য শাহনামা একটি মর্যাদাপূর্ণ বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে এর কয়েকটি নিদর্শন আছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত চিত্রিত শাহনামা শীর্ষক ১১টি চিত্রকর্ম এবং সরকারি সা'দত কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত শাহনামা (চিত্রিত পাণ্ডুলিপি) অত্যন্ত গুরুত্ববহ। উল্লেখ্য *শাহানামা* পাণ্ডুলিপি

চিত্রকলার চর্চা প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। যার কিছু নিদর্শন বাংলাদেশে আজও বিদ্যমান।

বাংলাদেশে সংরক্ষিত মুঘল চিত্রকর্মসমূহ নিয়ে পূর্বে কোনো গবেষণা হয়নি। ফলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। গবেষণাকালে প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সংরক্ষিত চিত্রকর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও আলোকচিত্র সংগ্রহ করা দুষ্কর ছিল। সত্যিকার অর্থেই এ এক অসাধ্য কাজ ছিল।

শেষ পর্যন্ত কয়েক বছরের প্রচেষ্টা, অনুসন্ধান, সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ভিত্তিতে বাংলাদেশে সংরক্ষিত আকর মুঘল চিত্রকর্মসমূহের তালিকা প্রণয়ন, পরিচিতি উন্মোচন এবং বিষয়বস্তু ও শৈলীর ইতিহাসভিত্তিক বিশ্লেষণ অনেকটা সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া মুঘল সাম্রাজ্য ও মুঘল সুবা বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নবাবি আমলে মুঘল চিত্রকলা চর্চা এবং ঢাকার নায়েব-ই-নাজিমদের আমলেও এর প্রভাবের ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা হয়েছে। মুঘল সুবাহ বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজধানী ঢাকা। ফলে সেই সময়ের মুঘল চিত্রকর্মসমূহ বিশ্লেষণের নিরিখে বস্তুত বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ারই ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা

Abstract	:	বিমূর্ত, নির্বস্তুক (চিত্রকলা)
Aerial perspective	:	বিষয়বস্তুর অবস্থান ও আকৃতি অনুযায়ী আকাশীয় চিত্র; যথানুপাতিক আকাশধৃত চিত্র। চিত্রকলায় দূরবর্তিতা প্রদর্শনার্থে চিত্রের পশ্চাদভূমিতে ঈষৎ নীলাভ রঙের দ্বারা সৃষ্ট গভীরতা। aerial perspective টার্মটি সর্বপ্রথম লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির সময় ইতালীয় চিত্রকরগণ চিত্রে প্রয়োগ করেন।
Ahl-al-kitab	:	কিতাবী; প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাসী
Alam-al-mulk	:	আলম-ই-মূলক; ভূখণ্ড; রাজ্য
'Al'-'abd	:	ক্রীতদাস, যে ব্যক্তি কোনোকিছুতে নিজেকে নিয়োজিত করে
'Amal	:	পরিকল্পিত কার্যাদি সম্পাদন, বিশেষত চিত্রকর্ম সম্পন্ন করা
Arabesque	:	আরব্য নকশা (উদ্ভিজ্জ ও জ্যামিতিক নকশা, যাতে ফুল, ফল, লতাপাতা, পাক খাওয়া আঙ্গুর লতা এবং কখনও কখনও ক্যালিগ্রাফি যুক্ত করা হয়ে থাকে)
Banda	:	ক্রীতদাস; ভৃত্য; নফর
Banda-i dargah	:	দরবারের ভৃত্য (বাদশাহের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি)
Banda-i daulat		রাষ্ট্রীয় কর্মচারী (বাদশাহের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি)
Banda-i ikhlas	:	বিশ্বাসী ভৃত্য (অনুগত ব্যক্তি)
Border	:	প্রান্ত; সীমা (মুঘল চিত্রকলার 'হাশিয়া')
Calligraphist	:	লিপিশিল্পী; খোশনবিস; সুন্দর হস্তাক্ষরবিশিষ্ট ব্যক্তি
Calligraphy	:	লিপিশিল্প; লিপিকলা; সুন্দর হস্তাক্ষর
Cavalier	:	অশ্বারোহী সৈনিক; বীরপুরুষ
Chaugan	:	চৌগান পোলো বা অশ্বারোহণে হকি খেলা
Chihra	:	মুখাবয়ব, প্রতিকৃতি
Chihranami, nami-chihra	:	চিত্রিত মুখাবয়ব; বাদশাহ্ বা শাহজাদার প্রতিকৃতি
Conqueror	:	বিজেতা
Contour	:	পরিণাহ; দেহরেখা

Dhaka University Institutional Repository

Dastan	:	কাহিনী; রূপকথা; কিস্‌সা; গল্প
Dawlat	:	ধন-সম্পদ
Diwan	:	কাব্য সংগ্রহ (যেমন: দিওয়ান-ই-হাফিজ)
Diwan	:	দিওয়ান; রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনার দপ্তর বা মন্ত্রণালয়
Diwan-i-'am	:	সাধারণের রাজদরবার; জনসাধারণের মিলনায়তন
Diwan-i-khass	:	বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সভাগৃহ; বিশেষ দরবার গৃহ; দিল্লির লালকেল্লায় অবস্থিত এ ভবনটি বাদশাহ্ শাহজাহান কর্তৃক ১৬৩৯-৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।
Dome	:	গম্বুজ; একটি গোলাকার বা উপ-গোলাকার অথবা বহুভূজ ভিত্তির উপর স্থাপিত গোলাকার বা অর্ধ-গোলাকার ছাদ
Faqir-al haqir	:	বিনয়ী, সর্বহারা; ভিক্ষাবৃত্তি দিয়ে যাপিত জীবন
Foil	:	ভাঁজ
Foliated	:	উৎকীর্ণ পত্রালংকার শোভিত
Frame	:	কাঠামো
Fresco	:	দেয়ালচিত্র
Ghazi	:	যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ী ব্যক্তি; যুদ্ধ সমাপ্তির পর বিজয়ী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের শাসক এই অভিধায় ভূষিত করেন
Ghulam	:	ক্রীতদাস
Gilt	:	স্বর্ণমণ্ডিত; গিল্টি করা
Harem	:	অন্তঃপুরিকাদের মহল
Hashiya	:	প্রান্তসীমা; কোনো পৃষ্ঠার মুদ্রিত-অঙ্কিত বা লিখিত বিষয়বস্তুর চারপাশের খালি জায়গা (মুঘল চিত্রকলায় ব্যবহৃত প্রান্তসীমার নকশা)
Horizontal	:	আনুভূমিক
Ibadat khane	:	ইবাদতখানা; ধর্মচর্চার আসর। ধর্মবিষয়ে স্বাধীনভাবে সারগর্ভ আলোচনা করার জন্য বাদশাহ আকবর কর্তৃক ফতেহপুর-সিক্রিতে 'ইবাদতখানা' স্থাপিত হয়।
Icon	:	মূর্তি; প্রতিমা
Inlay	:	ভিতরে বসানো (খোদাইকৃত) ভিন্ন রঙের পাথর অথবা ধাতু

Dhaka University Institutional Repository

Inscription	:	লিপি; বিশেষত খোদাই করা অথবা উৎকীর্ণ তারিখ ইত্যাদি লিপি/সনাক্তকারী
Islah	:	সংশোধন, উৎকর্ষসাধন (শিল্পীগুরু অঙ্কিত চোখের মণি বা তারার সূক্ষ্ম কাজ)
Jadwal	:	প্রান্তসীমায় অঙ্কিত রেখা; সুবিন্যস্ত রেখা; সারণি
Jadwal-arayan	:	রেখাচিত্র; প্রান্তসীমার অলংকরণ
Jalli design	:	ইট অথবা পাথর দ্বারা নির্মিত ফোকর নকশা
Jama	:	সেলাইযুক্ত অঙ্গাবরণ বা পরিচ্ছদ; পিরহান, কোট কামিজ ব্লাউজ ইত্যাদি উর্ধ্বাঙ্গে পরিধেয় সেলাই করা বস্ত্র, একপ্রস্থ পোশাক
Kahar	:	শিবিকা-বাহক; বেহারা, পালকি-বহনকারী
Kalan	:	বয়োজ্যেষ্ঠ, অগ্রজ, বয়সে বড়
Kar	:	কাজ (চিত্রাঙ্কনের কাজ)
Khanazad	:	গৃহে জাত; বাদশাহের প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেছে এরূপ, ভৃত্য, চাকর-নফর, রাজদরবারে ভৃত্যদের দ্বিতীয় প্রজন্ম (বিশেষত)
Khasmahal	:	খাসমহল; অন্তঃপুর
Khat	:	রেখা, প্রান্তসীমায় অঙ্কিত রেখা, হস্তলিপি
Khwurd	:	বয়ঃকনিষ্ঠ, অনুজ, বয়সে ছোট
Kitabkhana	:	গ্রন্থাগার, বইঘর
Mansab	:	মুঘল সাম্রাজ্যের রাজ কর্মচারীদের একটি পদবী
Mashq	:	লিপিকলা; রেখাচিত্র (চিত্রকলা)
Masnavi	:	আখ্যানমূলক ইসলামী কবিতা (মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির রচিত গ্রন্থ)
Merlon	:	পত্রাকৃতি নকশা
Motif	:	অলংকরণ চিহ্ন বা বিষয়বস্তু
Muraqqa	:	চিত্রকর্ম সংরক্ষণের পুস্তকবিশেষ; অ্যালবাম (মুঘল চিত্রকর্ম, চিত্রিত পুঁথি ও লিপিকলার অ্যালবাম)
Murid	:	শিষ্য; কোনো নেতা, ধর্মমত, শিল্পধারা ইত্যাদির অনুসারী; রাজ দরবারের ভৃত্য
Musauwir	:	চিত্রকর, শিল্পী

Muzahhib	:	যে ব্যক্তি সোনার পাত বা সোনালি রং দিয়ে গিল্টি করে; অলংকরণ শিল্পী
Naqqas	:	চিত্রশিল্পী; চিত্রকর
Naqqarkhana	:	বাদ্যযন্ত্র রাখার ঘর, বাদ্যযন্ত্র ও বংশীবাদকদের দল বা ব্যান্ড
Naqqash	:	প্রস্তর কাটার কাজ; খোদাইকার; নকশাকার, অলংকরণ শিল্পী
Naqqashkhana	:	চিত্র কারখানা, চিত্রশালা
Naqqaskhane	:	চিত্রশিল্পীর কর্মশালা; চিত্র-প্রদর্শন গ্যালারি
Naqsh	:	চিত্রশিল্প; ভাস্কর্য; খোদাইশিল্প
Nasta'liq	:	পারসিক লিপিকলার শৈলীবিশেষ; গোলাকার বর্ণমালা
Nauroz	:	পারসিক মতে নতুন বছরের প্রথম দিন; উৎসববিশেষ (সাধারণত ২১ মার্চ)
Nimqalam	:	চিত্রকর্মে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পদ্ধতি বিশেষ; কালো কালি এবং হালকা রং ব্যবহৃত হয়।
Portrait	:	প্রতিকৃতি; প্রাঞ্জল বা স্পষ্ট বর্ণনা
Portraitist	:	প্রতিকৃতিশিল্পী
Portraiture	:	প্রতিকৃতি অঙ্কন; চিত্রাবলী
Qalam	:	কলম; লিপিকলা ও চিত্রকলার শৈলীবিশেষ
Qalandar	:	মরমি সাধক; মুসলমান পরিবেষ্টিত আধ্যাত্মিক সাধনার মাঝে থাকা ব্যক্তিত্ব
Qamargah	:	শিকারের পশুকে যেখানে কর্তন করা হয়
Qazi	:	বিচারক; মুসলমান বিচারপতি
Rangamezi	:	বিভিন্ন ধরনের রং দিয়ে ছবি আঁকা; স্কেচছবি যথাযথভাবে রং করা
Raqam	:	কলম বা তুলির অঙ্কন; লিপিকলা, বিশেষত চিত্রকর্মকে বলা হয়
Relief	:	কাঠ, পাথর, হাতির দাঁত বা কোন ধাতুর উপর খোদাইকৃত নকশা
Rosette	:	গোলাপ নকশা
Roshan qalam	:	'আলোকিত কলম'; মুঘল রাজ দরবারে দক্ষ লিপিকারদের এই পদবীতে ভূষিত করা হতো

Sangtarash	:	পাথার কাটার যন্ত্র; পাথর কেটে অট্টালিকা নির্মাণ করার মিস্ত্রী
Sar-i lauh	:	'লিপিফলকের উপরের অংশ'; প্রচ্ছদের অলংকরণ বা বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার লিখিত শিরোনাম, লেখকের নাম ইত্যাদি উল্লিখিত নামপত্র
Shagird	:	শিষ্য, ভক্ত, চোখের মণি
Shamsa	:	অলংকরণ শোভিত শিরোনামা; কদাচিৎ শিরোনামের প্রারম্ভিক অংশ থাকে
Shikasta	:	'ভগ্ন'; গোটা গোটা হাতের লেখাবিশেষ (সাঁটলিপি), পারসিক লিপিকলার ধরণ বা পদ্ধতি
Shirin qalam	:	'মিষ্টি কলম'; মুঘল রাজদরবারে দক্ষ অনুলেখক বা লিপিকারদের এই পদবীতে ভূষিত করা হতো
Simurgh	:	পারসিক সাহিত্যে বর্ণিত পৌরাণিক পাখি; মহাকবি ফেরদৌসির 'শাহনামা'য় এর উল্লেখ আছে
Siyahi qalam	:	সাধারণত আধুনিক লেখকগণ এই পরিভাষা ব্যবহার করেন; চিত্রকর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার পদ্ধতিবিশেষ, প্রধানত এক রঙ বা কালো রঙে অঙ্কিত চিত্রকর্ম
Sufi	:	মুসলমান সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি; মরমি সাধক
Surat	:	মানব-আকৃতি; প্রতিকৃতি চিত্রকর্ম
Tarh	:	খসড়া চিত্রকর্ম; রেখাচিত্র; অঙ্কন
Taswir	:	মুখাবয়ব; প্রতিকৃতি চিত্র
Taswir	:	ছবি; চিত্র
Taswirkhana	:	চিত্রশালা; শিল্পশালা; শিল্পগৃহ
Tendril	:	লতাতন্তু; বিসর্পিল লতা নকশা
Turan	:	তুরান; এশিয়া মাইনর
Unwan	:	শিরোনাম; যে পৃষ্ঠায় শিরোনাম থাকে (সাধারণত সোনার পাত বা সোনালি রং দিয়ে শিরোনামের পৃষ্ঠা অলংকৃত করা হয়)
Ustad	:	শিক্ষক; গুরুশিল্পী
Vertical	:	উল্লম্ব
Visual	:	চাক্ষুস দৃষ্টিলব্ধ; দৃষ্টিগোচর
Zenanna	:	অট্টালিকা বা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত নারীদের অন্দরমহল

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১: মুঘল বংশলতিকা

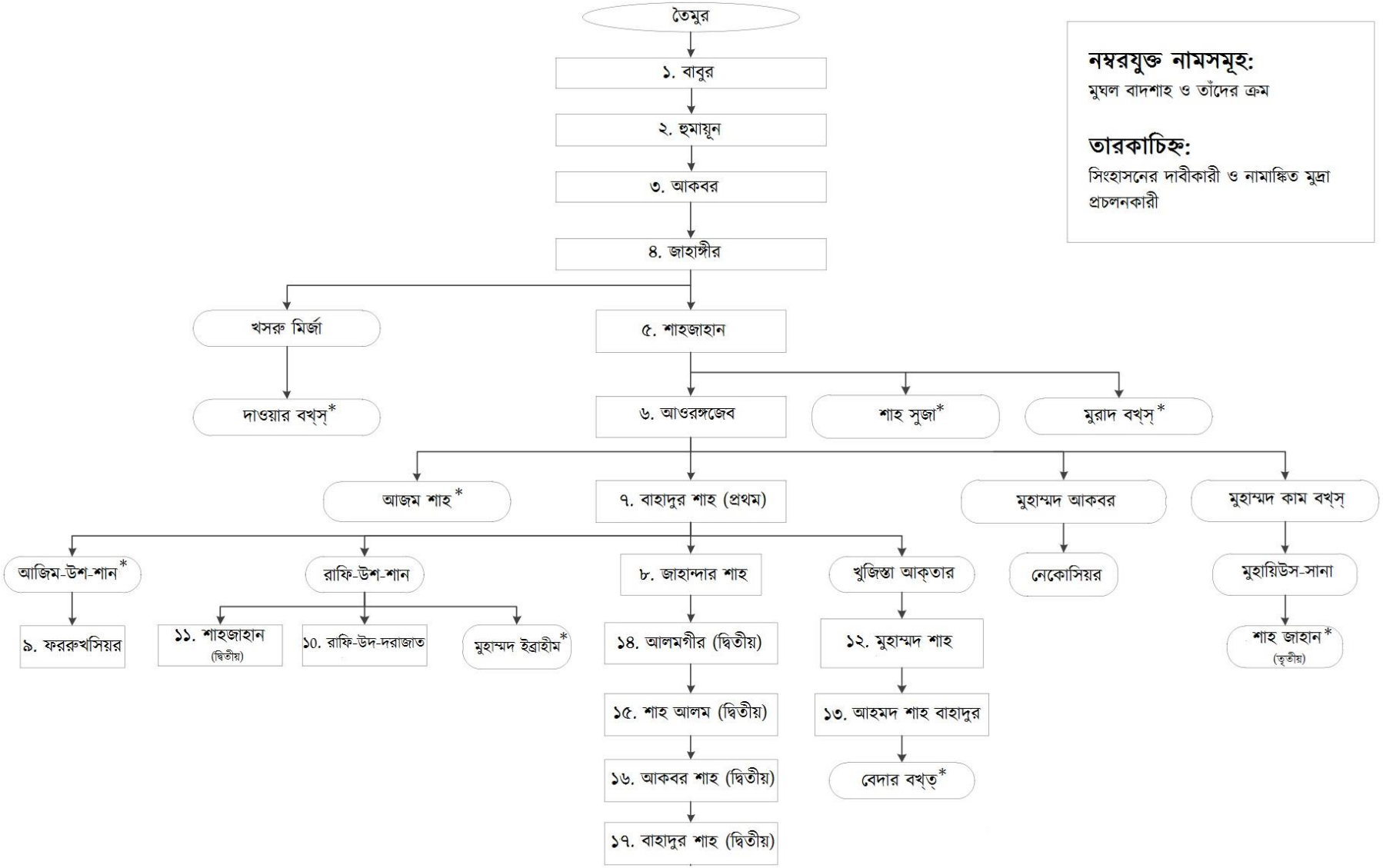

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল রাজবংশ, বাদশাহ, শাসনকাল

বাদশাহ	শাসনকাল
প্রাথমিক মুঘল বংশ- ১	
বাবুর	১৫২৬- ১৫৩০ খ্রি.
হুমায়ূন	১৫৩০- ১৫৪০ খ্রি.
সুর বংশ	
শের শাহ	১৫৪০- ১৫৪৫ খ্রি.
ইসলাম শাহ	১৫৪৫- ১৫৫৩ খ্রি.
ফিরুজ শাহ	১৫৫৩ খ্রি.
আদিল শাহ	১৫৫৩- ১৫৫৫ খ্রি.
প্রাথমিক মুঘল বংশ- ২	
হুমায়ূন	১৫৫৫- ১৫৫৬ খ্রি.
আকবর	১৫৫৬- ১৬০৫ খ্রি.
জাহাঙ্গীর	১৬০৫- ১৬২৭ খ্রি.
শাহজাহান	১৬২৮- ১৬৫৮ খ্রি.
আওরঙ্গজেব	১৬৫৮- ১৭০৭ খ্রি.
পরবর্তী মুঘল বাদশাহ	
প্রথম বাহাদুর শাহ	১৭০৭- ১৭১২ খ্রি.
জাহান্দার শাহ	১৭১২- ১৭১৩ খ্রি.
ফররুখ সিয়র	১৭১৩- ১৭১৯ খ্রি.
রাফি-উদ-দরাজাত	১৭১৯ খ্রি.
রাফি-উদ-দৌলা	১৭১৯ খ্রি.
মুহাম্মদ শাহ	১৭১৯- ১৯৪৮ খ্রি.
আহমদ শাহ	১৭৪৮- ১৭৫৪ খ্রি.
দ্বিতীয় আলমগীর	১৭৫৪- ১৭৫৯ খ্রি.
দ্বিতীয় শাহ আলম	১৭৫৯- ১৮০৬ খ্রি.
দ্বিতীয় আকবর	১৮০৬- ১৮৩৭ খ্রি.
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ	১৮৩৭- ১৮৫৭ খ্রি.

উৎস: এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ: মোগল পর্ব*, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ২: গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর্ম

চিত্রিত শাহনামা-১

(বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগৃহীত নম্বর: ২২০৬)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রিত শাহনামা-২
(বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগৃহীত নম্বর: ২২০৭)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রিত শাহনামা-৩

(বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগৃহীত নম্বর: ২২০৮)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার জলরং- ১

(বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগৃহীত নম্বর: ২৮৬০)

ঢাকার জলরং- ২

(বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগৃহীত নম্বর: ২৮৬০)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার জলরং- ৩

(বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগৃহীত নম্বর: ২৮৬০)

ঢাকার জলরং- ৪

(বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগৃহীত নম্বর: ২৮৬০)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার জলরং- ৫

(বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগৃহীত নম্বর: ২৮৬০)

ঢাকার জলরং- ৬

(বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত, সংগৃহীত নম্বর: ২৮৬০)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩: গুরুত্বপূর্ণ রেখাচিত্র

মুঘল চিত্রকলায় বৃক্ষের রেখাচিত্র

(সূত্রঃ Som Prakash Verma, *Art and Material Culture in the Paintings of Akbar's Court,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1978)

উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গবেষক কর্তৃক ড্রয়িংয়ের অনুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

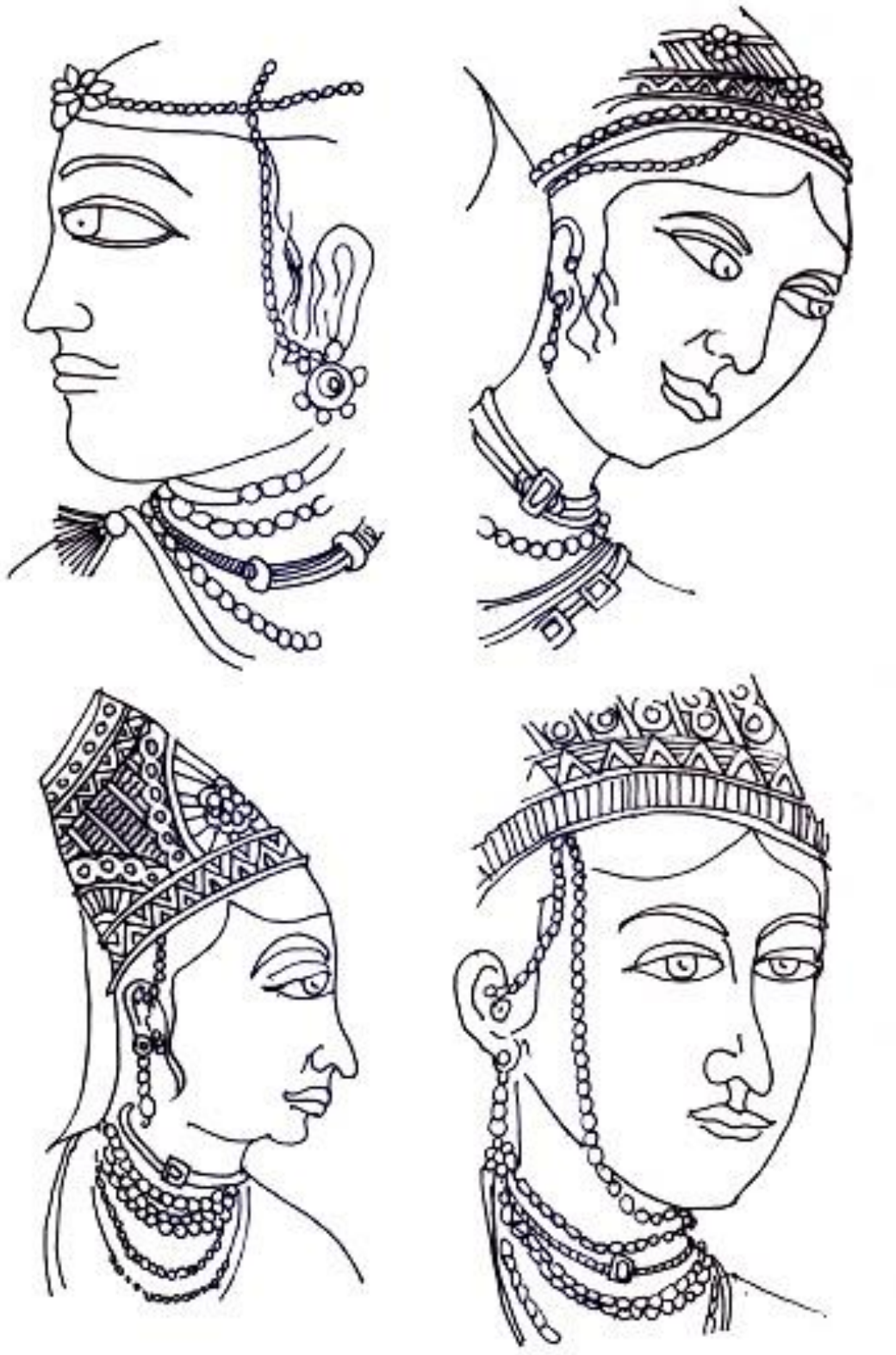

মুঘল চিত্রকলায় নারী প্রতিকৃতির বিবিধ ভঙ্গি

(সূত্রঃ Som Prakash Verma, *Art and Material Culture in the Paintings of Akbar's Court,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1978)
উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গবেষক কর্তৃক ড্রয়িংয়ের অনুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

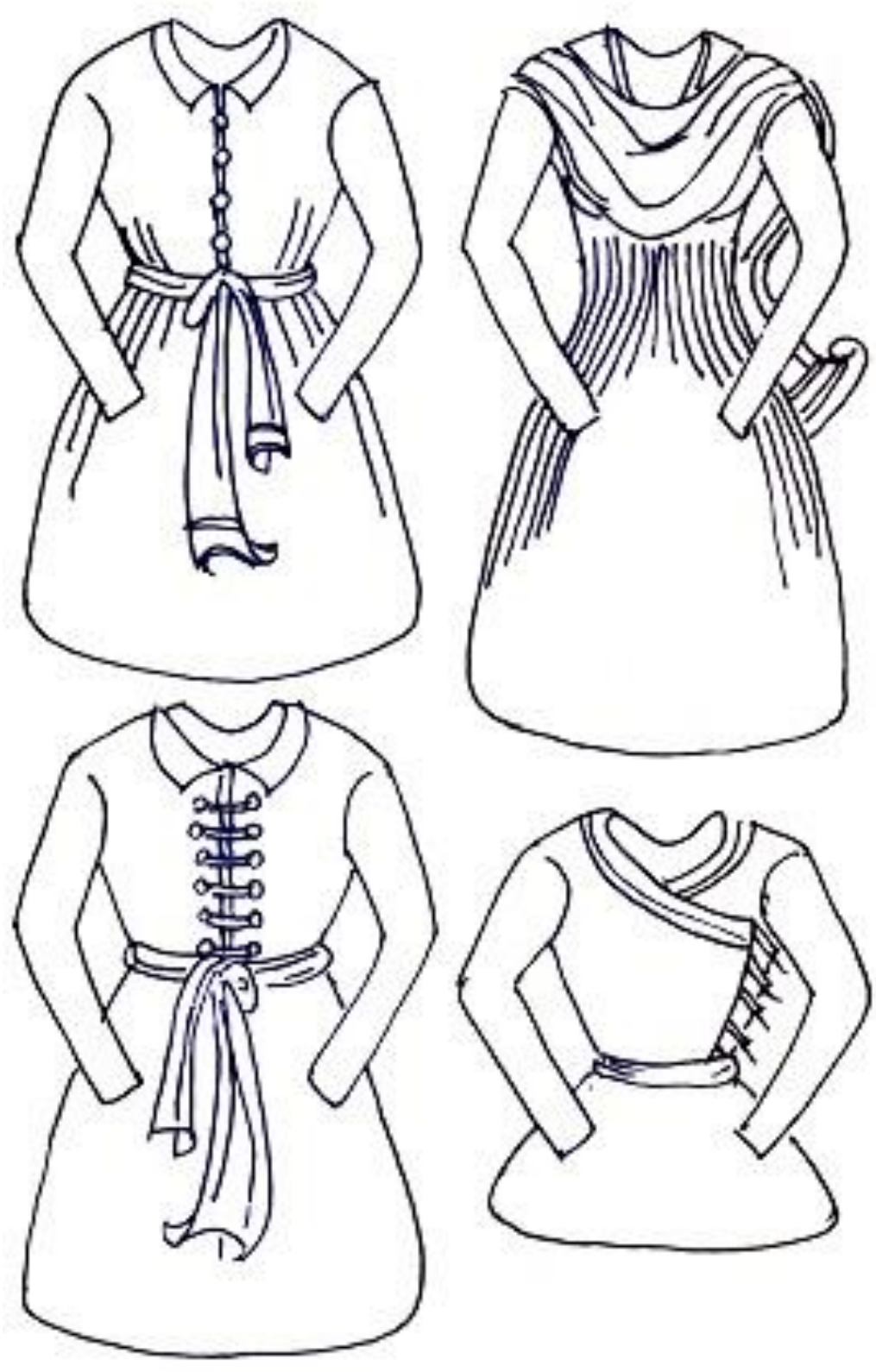

মুঘল জামার প্রকারভেদ

(সূত্রঃ Som Prakash Verma, *Art and Material Culture in the Paintings of Akbar's Court,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1978)
উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গবেষক কর্তৃক ড্রয়িংয়ের অনুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

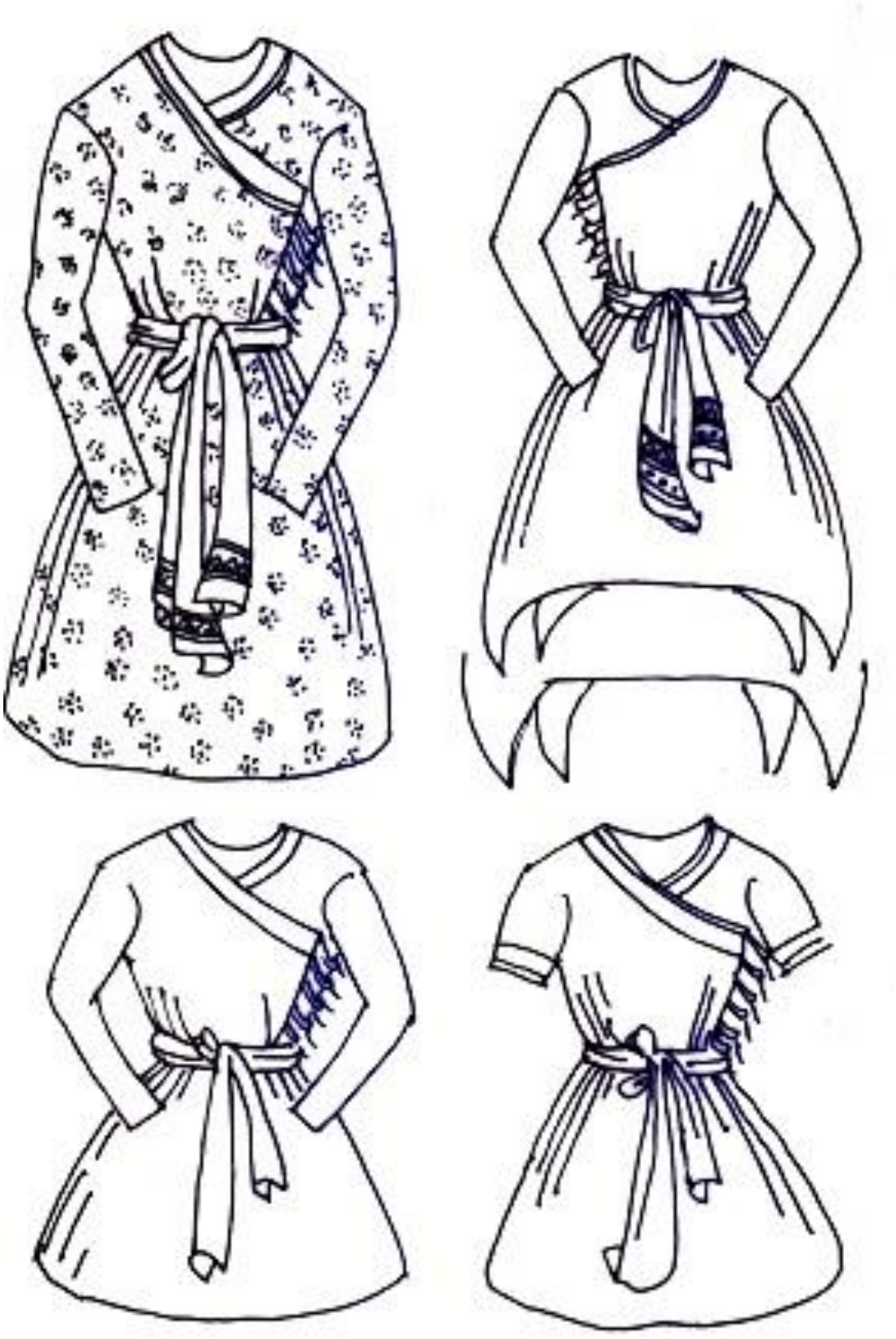

বিভিন্ন প্রকারের মুঘল জামা

(সূত্রঃ Som Prakash Verma, *Art and Material Culture in the Paintings of Akbar's Court,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1978)
উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গবেষক কর্তৃক ড্রয়িংয়ের অনুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল চিত্রকলায় বিভিন্ন গ্রাম্য রমণী

(সূত্রঃ Som Prakash Verma, *Art and Material Culture in the Paintings of Akbar's Court*, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1978)

উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গবেষক কর্তৃক ড্রয়িংয়ের অনুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

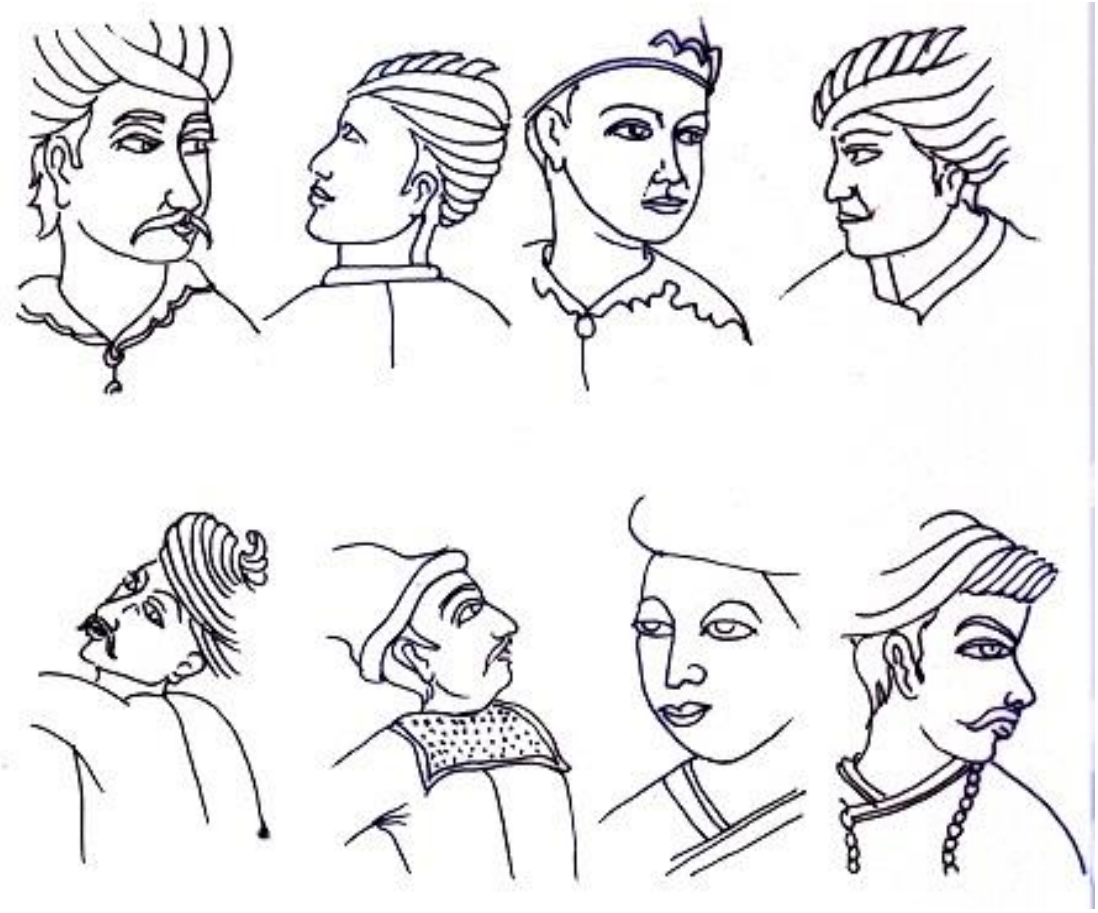

মুঘল চিত্রকলায় পুরুষ প্রতিকৃতির প্রকারভেদ

(সূত্রঃ Som Prakash Verma, *Art and Material Culture in the Paintings of Akbar's Court,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1978)

উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গবেষক কর্তৃক ড্রয়িংয়ের অনুলিপি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ৪: গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র

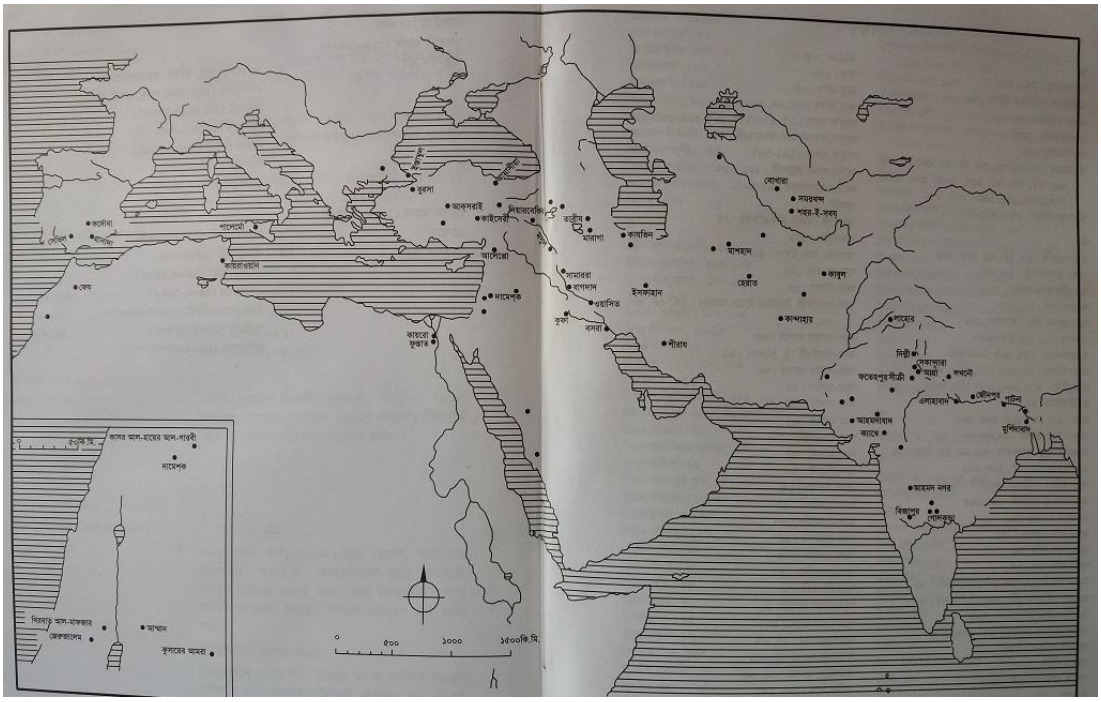

ইসলামী চিত্রকলার প্রধান কেন্দ্রসমূহ

(সূত্র: এ বি এম হোসেন, *ইসলামী চিত্রকলা*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৪)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ফারসি গ্রন্থ (আকর):

Abu'l Fazl `Allami. *Akbar-Nama,* English translation by H. Beveridge in the 'Bibliotheca Indica; series, 3 vols., Calcutta: The Asiatic Society, 1897-1939. Reprint, 3 vols, Delhi: Rare Books, vol. I, 1972, vol. II & vol. III, 1973

_____. *A'in-i-Akbari,* English translation in the `Bibliotheca Indica' series, 3 vols., Calcutta: The Asiatic Society, vol.1/1873 (by H. Blochmann, revised and edited by D.C. Phillot, 1927); vols. II & III (by H.S. Jarrett) 1891 and 1894. First reprints; Delhi: Crown Publishers, 1988

Babur, Zahiruddin Muhammad. *Tuzuk-i-Baburi* (Memoirs of Babur). 2 vols. Translated by A.S. Beveridge (First published in 1922). Reprints, New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1970

Badauni, Abdul Qadir. *Muntakhab-ut-Tawarikh.* 3 vols. Vol. I, translated by S.A. George Ranking (First published in 1898); vol. II translated by W.H. Low (First published in 1899); vol. III, translated and edited by Wolseley T. Haig (First published in 1899). Indian reprint, of vols. I, II & III. Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, 1973

Firishta (surnamed) Muhammad Qasim Hindu Shah. *Tarikh-i-Firishta.* English translation by J. Briggs entitled 'History of the Rise of the Muhammadan Power in India Till the years 1612 A.D.' 4 vols. Indian reprint, Calcutta: Asiatic Society, 1966. Also, English translation in Elliot & Dowson, vol. VI

Gul Badan Begam. *Humayun Nama.* Translated by A.S. Beveridge (First published in London: The Royal Asiatic Society, 1902). Reprint, Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, n.d.

Husain, Ghulam. *Seir Mutaqherin,* vol. II, translated by Raymond (Haji Mustapha) Calcutta:n.p., 1926

Jahangir, Nur-ud-din Muhammad. *Tuzuk-i-Jahangiri.* Translated by A. Rogers, edited by H. Beveridge. 2 vols. (First published in 1909-1914). Second edition, Delhi: Munshiram Manoharlal Oriental Publishers, 1968

Khan, Inayat. *Shah Jahan Nama.* W. E. Begley and Z.A. Desai, (translated). Delhi: OUP, 1990

Khan, Shahnawaz and 'Abul Hayy. *M'aathiru'l Umara.* 2 vols. English translation in the 'Bibliotheca Indica' series by H. Beveridge; revised and completed by Baini Prasad. Calcutta: The Asiatic Society, 1911-1941

Nizamuddin Ahmad, Khawaja. *The Tabaqat-i-Akbari* (A History of India from the Early Mussalman invasion to the thirty-sixth year of the reign of Akbar). 3 vols. Translated by B. De. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, vol. 1/1927; vol. II/1936 and vol. III/1939.

ইংরেজি গ্রন্থঃ

Ahmed, Sharif Uddin. *Dacca – A Study in Urban History and Development.* Riverdale (USA): Riverdale Company, 1986

Ahmed, Sharif Uddin. *Dhaka–A Study in Urban History and Development 1840-1921*. Dhaka, 2003

Bradley-Birt, F.B. *The Romance of an Eastern Capital.* London: Smith, Elder and Co., 1906

Dani, Ahmad Hasan. *Dacca – A Record of its Changing Fortunes.* 2nd edition, Dhaka, 1962

D'oyly, Charles. *Antiquities of Dacca.* London: J. J. Landseer and Company, 1824-30

Haque, Enamul (ed.). *Catalogue of a Special Exhibition of Islamic Arts and Crafts in Bangladesh.* Dhaka: Bangladesh National Museum, 1983

Hasan, Sayid Aulad. *Extracts from the Notes on the Antiquities of Dacca.* Dhaka, 1903

_____. *Echoes from Old Dhaka*. Calcutta, 1909

Imam, Abu. 'Origin of the name Dhaka (Dacca): A Note' in *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, vol. III, Dhaka, 1958

Karim, Abdul. *Dacca the Mughal Capital.* Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1964

Mahmud, Firoz & Khatun, Shahida (Ed.). *Dhaka: Capital of Islamic Culture in the Asian Region of 2012*, Dhaka: Bangla Academy Press (on behalf of the Ministry of Cultural Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh). December 2012

Ranking, J. T. *Study of the Antiquities of Dacca.* Dacca: Sreenath Press, 1920

Reynolds, Graham. 'British Artists in India'. *The Art of India and Pakistan* (ed. by Sir Leigh Ashton). London: Faber and Faber Ltd., 1947-8

Salim, Gulam Hussain. *Riyazu-s-Salatin* (A History of Bengal), [tr. Abdus Salam]. Delhi, 1948

Selim, Lala Rukh (ed.). *Art and Crafts*. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2007.

Shafiqullah, Shah Muhammad. *Calligraphic Art in Sultanate Architecture*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2012

Taifoor, Syed Muhammed. *Glimpses of Old Dhaka: A Short Historical Narration of East Bengal and Assam with special treatment of Dhaka.* Dhaka, 1950.

মুঘল-ভারত ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থঃ

Bernier, Francois. *Travels in the Mogul Empire: A.D. 1656-1668.* Irving Brock translated; edited by Archibald Constable. London: A Constable, 1891. New Delhi: S. Chand & Co. (Pvt.) Ltd, Third edition, 1972

Della Valle, Pietro. *Travels in India.* Translated by E. Grey. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1892

Foster, W. *Early Travels in India, 1583-1619.* (OUP, n.d.). Reprint, New Delhi: S. Chand & Co., 1968

Manucci, Niccolao. *Storia do Mogor (or Mogul India), 1653-1708).* Translated by W. Irvine. 5 vols. London: John-Murry. Vol. I/1906; vols. II & III/1907; vol. IV/1908 and vol. V, 1913

Monserrate, Antony. *Commentaries* (translated by J.S. Hoyland and annotated by S.N. Banerjee under the title of the 'Commentary of Father Monserrate On His Journey to the Court of Akbar'). Cuttack:n.p., 1922

Pelsaert, Francisco. *Jahangir's India,* translated Acmonstrantie by W.H. Moreland and P. Geyl. Cambridge: n.p., 1925

Roe, T. *The Embassy of Sir Thomas Roe to India, 1615-1629.* 2 vols. Edited by W. Foster. London: Hakluyt Society, 1899.

ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

Ali, Syed Ameer. *A Short History of the Saracens* (First edition, 1889) reprint, London: Macmillan & Company Ltd., 1961

Arnold, T.W. and Guillaume A. (edited). *The Legacy of Islam* (First published, 1931) reprint, London: OUP, 1960

Browne, E.G. *A Literary History of Persia.* vol. 2, 1st ed. 1902. Reprint. Cambridge: Cambridge at the University Press, 1969

Habib, Irfan. *An Atlas of the Mughal Empire.* Delhi: OUP, 1982

Haig, Sir Wolsely (edited). *Cambridge History of India*. 3 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1928. Reprint, Delhi: S. Chand & Co., 1958

Hasrat, B.J. *Dara-Shikoh: Life and Works* (First published, 1979), second revised edition, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Private Ltd., 1982

Hitti, P.K. *History of the Arabs* (First edition, 1937), fifth edition, London: Macmillan and Co. Ltd., 1951

Sarkar, Sir J. *The Fall of the Mughal Empire* (First edition, 1912-1913), third edition, Calcutta: M.C. Sarkar, 1964

Smith, V.A. *Akbar, the Great Mogul: 1542-1605*. First edition, 1919; Second revised edition, Delhi: S. Chand and Co., 1962.

ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ক গ্রন্থ: ইংরেজি

Anand, Mulk Raj. *Album of Indian Paintings.* New Delhi: National Book Trust India, 1973

Archer, W.G. *Indian Painting.* London: B.T. Batsford Ltd., 1956

_____. *Indian Miniatures.* London: Studio Books, 1960

Arnold, T.W. *Painting in Islam* (First published, Oxford, 1928), New edition. New York: Dover Publications, Inc., 1965

Barrett, Douglas. *Painting of the Deccan (xvi-xvii Century).* London: Faber & Faber Ltd., 1958

Barrett, Douglas and Basil Gray. *Indian Painting* (First published, Geneva: Albert Skira,1963). New edition, London: Macmillan London Ltd., 1978

Beach, Milo Cleveland. *The Grand Mogul Imperial Painting in India, 1600-1660.* Massachusetts: Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, USA, 1978

Bhattachariya, Ashok K. *Technique of Indian Painting.* Calcutta: Saraswati Library, 1976

Binyon, L.; Wilkinson, J.V.S. and B. Gray. *Persian Miniature Painting.* London: OUP, Humphrey Milford, 1933

Binyon, L. and T. W. Arnold (edited). *The Court Painters of the Great Moguls.* London: Humphrey Milford: OUP, 1921

Blochet, E. *Mussalman Painting (XII-XV Century).* Translated by C.M. Binyon. London: Methuen & Co., 1929

Brij Bhushan, Jamila. *Indian Jewellery, Ornaments and Decorative Designs.* Bombay:D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd., 1964

_____. *The World of Indian Miniatures.* Tokyo: Kodansha International, 1979

Brown, Percy. *Indian Painting Under the Mughals* (First published in Oxford, 1924), Reprint, Delhi: Cosmo Publications, 1981

Bussagli, Mario. *Indian Miniatures.* Translated by Raymond Rudorff. London: Paul-Hamlyn, 1969

Chaghatai, Abdulla. *Painting During the Sultanate Period.* Lahore: Kitab-Khana-i-Nauras, 1963

Chaitanya, Krishna. *A History of Indian Painting: Munuscript, Moghul and Deccani Traditions.* New Delhi: Abhinav Publications, 1979

Chandra, Moti. *Technique of Mughal Painting.* Lucknow: U. P. Historical Society, 1949

_____. *Costumes, Cosmetics and Coiffure in Ancient and Medieval India.* Delhi: Oriental Publishers, 1973

Clarke, Stanley C. *Twelve Paintings of the School of Humayun.* London: Victoria & Albert Museum, 1921

_____. *Thirty Mogul Paintings of the School of Jahangir in the Wantage Bequest.* London: Victoria & Albert Museum, 1922

Coomaraswamy, A.K. *Indian Drawings.* Vol. I, London: n.p., 1910-12

_____. *History of Indian and Indonesian Art.* (First published, London, Edeard Goldston, 1927). New Edition, New York: Dover Publications, Inc., 1965

_____. *Introduction to Indian Art.* Second Edition. Delhi: Munshiram Manoharlal Oriental Publishers, 1969

Craven, Roy C. *Indian Art: A Concise History.* London: Thames and Hudson, (First published, 1976), Reprint, London: Thames and Hudson, 1991

Creswell, KAC. *A Short Account of Early Muslim Architecture.* Harmondsworth: Penguin Books, 1958

Das, A.K. *Mughal Painting During Jahangir's Time.* Calcutta: The Asiatic Society, 1978

_____. *Dawn of Mughal Painting.* Bombay: Vikas Publishers, 1982

_____. *Splendour of Mughal Painting.* Bombay: Vakils Feffer & Simsons Ltd., 1986

Falk, Toby and Mildred Archer. *Indian Miniatures in the India Office Library.* London: Sotheby Parke Bernet, 1981

Farooqi, Anis. *Art of India and Persia.* New Delhi: B.R. Publishing Co., 1979

Gardner, Helen. *Art Through the Ages.* First Edition, 1926; Sixth Edition, New York: Harcourt Brace Jevanovich, Inc., 1975

Goetz, Hermann. *India: Five Thousand Years of Indian Art.* London: Methuen, 1959; Second edition, London: Methuen, 1964

Graber, Oleg. *The Formation of Islamic Art*. New Haven: Yale University Press, 1973

Hajek, Lubor. *Indian Miniatures of the Moghul School.* London: Artia Prague & Sons & Co., 1960

Havell, E.B. *The Art Heritage of India.* Bombay: B.D. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd., 1964

_____. *Indian Sculpture and Painting.* New Delhi: Cosmo Publications, 1980

Hill, Derek and Grabar, Oleg. *Islamic Architecture and Its Decorations.* London: Faber and Faber, 1964

Husain, A. B. M. *Fathpur-Sikri and Its Architecture.* Dacca: Bureau of National Reconstruction, 1970

Kuhnel, Ernst. *Islamic Art and Architecture.* English translation by Katherine Watson. London: G. Bell and Sons, 1966

Kuhnel, Ernst and Hermann Goetz. *Indian Book Painting from Jahangir's Album in the State Library, Berlin.* London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1926

Lal, K.S. *The Mughal Harem.* New Delhi: Aditya Prakashan, 1988

Losty, J.P. *Indian Book Painting.* London: The British Library, 1986

Marek, J. and H. Knizkova. *The Jengiz Khan Miniatures from the Court of Akbar the Great.* Translated by Olga Kuthanova. London: Spring Books, 1963

Marshal, H. M., An Analysis of 16th and 17th Century Mughal Painting with Reference to Persian and Political Influence", 2 vols. An unpublished thesis submitted to the University of London (SOAS), 1981

Martin, F. R. *Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey.* 2 vols. First published, London, 1912; reprint, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1985

Pal, P. *Court Paintings of India 16th-17th Centuries.* New York: Navin Kumar, 1983

Papadopoulo, Alexandre. *Islam and Muslim Art.* English translation by Robert Erich Wolf. London: Thames and Hudson, 1980

Randhawa, M. S. and J. K. Galbraith. *Indian Painting: The Scenes, Themes and Legend.* Calcutta: Oxford & IBH Publishing Co., 1968

Ray, Niharranjan. *An Approach to Indian Art.* First edition. Chandigarh: Publication Bureau Punjab University, 1974

_____. *Mughal Court Painting: A Study in Social and Formal Analysis.* Calcutta: Indian Museum, 1975

Robinson, B.W., Ernst J. Grube, G.M. Meredith Owenns and Robert Skelton (eds.) *Islamic Painting and the Arts of the Book.* London: Faber & Faber Ltd., 1976

Saraswati, S.K. *Eighteenth Century North Indian Paintings.* Calcutta: Pilgrim Publishers, 1969

Sen, Geeti. *Paintings from the Akbarnama.* Varanasi: Lusture Press Private Ltd. & Rupa & Co., 1984

Sivaramamurti, C. *Indian Painting.* New Delhi: National Book Trust India, 1970

Swarup, Shanti. *5000 Years of Arts and Crafts in India and Pakistan.* Bombay: D.B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd., 1968

_____. *Flora and Fauna in Mughal Art.* Bombay: Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd., 1983

Tandon, Rajkumar. *Indian Miniature Painting.* Bangalore: Natesan Publisher, 1982

Titley, Norah M. *Persian Miniature Painting: Its Influence on the Art of Turkey and India.* 2 Parts. London: The British Library, 1983

Topsfield, Andrew. *An Introduction to Indian Court Painting.* London: H.M.S.O., 1984

Tuylayev, S. *Miniatures of the Baburnamah.* Moscow: State Fine Arts Publishing House, 1960

Verma, S.P. *Art and Material Culture in the Paintings of Akbar's Court.* New Delhi: Vikas Publishing House Private Ltd., 1978

Welch, S.C. *The Art of Mughal India: Painting and Precious Objects.* New York: The Asistic Society, Inc., 1963

_____. *Imperial Mughal Painting.* New York: George Braziller, 1978

Wellesz, Emmy. *Akbar's Religious Thought Reflected in Mughal Painting.* London: Geoege Allen & Unwin Ltd., 1952

Wilkinson, J.V.S. and Laurence Binyon. *The Shah-Namah of Firdausi.* London: OUP, Humphrey Milford, 1931.

গেজেটিয়ার্স: ইংরেজি

Allen, B.C. *Eastern Bengal District Gazetteers: Dacca*, Vol V. Allahabad, Bengal Secretariat Press, 1912

Imperial Gazetteer of India – Eastern Bengal and Assam. Delhi: Government Printing, India, 1932

O'Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Dacca*. Kolkata: Bengal Secretariat Book Depot, 1912

Rizvi, S.N.H., *East Pakistan District Gazetteers: Dacca*. Dhaka: Pakistan Government press, 1959

_____ (ED.) *East Pakistan District Gazetteers*, Dacca, Dacca 1969.

সাময়িকী: ইংরেজি

Ahmed, Nazir. `Jahangir's Album of Art - Muraqqa-i-Gulshan and Its Two Adil Shahi Paintings', *Indo Iranica*, vol. XXX, no. 1 & 2, Calcutta, 1977-78

Ansari, M. A. 'Amusements and Games of the Great Mughals', *I.C.*, vol. 35 (No. 1), Hyderabad, 1961

_____. 'Dress of the Great Mughals', I.C., vol. 35 (No. 3), Hyderabad, 1961

Baquir, M. 'Muraqqa-i-Gulshan', *JPHS*, No.5, Karachi, 1957

Barrett, Douglas. 'Unveiling the Face of Persian Painting', *Marg*, vol. XXX (No. 1), Bombay, 1976

Beach, Milo C. 'The Gulshan Album and Its European Sources', *Bulletin of the Museum of Fine Arts*, Boston, No. 332, Boston, 1965

_____. 'A European Source for Early Mughal Painting', *Oriental Art*, vol. XXII, no. 2, London, 1976

Binyon, L. 'Relation Between Rajput and Moghal Painting: A New Document, *Rupam*, nos. 29-32, Calcutta, 1927

Bukhari, Y.K. 'Pigments', *Marg,* Supplement to vol. XVI, no. 2, Bombay, 1963

Dutta, Ajit Kumar. `Some Thoughts on Murshidabad Painting'. *Indian Studies* [Niharranjan Ray Felicitation Volume], Amita Ray *et al.* (ed.). Delhi: Sandeep Prakashan, 1984

Farooqi, Anis. 'Pigments and Materials', *I.C.* LI (No. 1), Hyderabad, 1977

Gangoly, A.N. `A Moghul Miniature from the Lahore Museum', *Rupam*, Nos. 38-39, Calcutta, 1929

Goetz, Hermann. 'The Early Muraqqas of the Mughal Emperor Jahangir', *East and West,* vol. VIII, No. 2, Rome, 1957

_____. 'Moghul School of Painting', *EWA,* vol. X, Col. 219, London, 1965

Husain, A.B.M. "The Age of the Mughals: Art and Architecture", *A Paper Read in the All Pakistan History Conference* at Rajshahi at Rajshahi, 1968

Khan, A. N. 'An Illustrated Akbarnama Manuscript in the Victoria and Albert Museum, London', *East and West,* nos. 3-4 (New Series), Rome, 1964

_____. 'The Heritage of Islamic Art in India', *Marg* (An Age of Splendour-Islamic Art in India). Bombay: Marg Publications, 1983

Khandalavala, Karl; Pramod Chandra; Moti Chandra and Parmeshwari Lal Gupta. 'A New Document of Indian Painting', *Lalit Kala,* No. 10, Delhi, 1961

Lee, Sharmann E. and Pramod Chandra. `A Newly Discovered Tutinama and the Continuity of the Indian Tradition in Manuscript Painting'. *The Burlington Magazine*, No. 105, London, December, 1963

Nath, Narindar and Karl Khandalavala. 'Illustrated Islamic Manuscripts', *Marg* (An Age of Splendour-Islamic Art in India), Bombay: Marg Publications, 1983

Serajuddin, Asma. 'A Few Remarks on a Painting by Khawaja Abd-al-Samad', *JASB*, vol. XXIII (No. 2), Dhaka, 1978

_____. `Murshidabad Painting', *Marg*, vol. V (No. 10), Bombay, 1986

Tarafdar, M. R. 'Illustrations of the Chandain in the Central Museum, Lahore', *JASP*, vol. VIII (No. 2), Dacca, 1963.

জাদুঘর ও গ্রন্থাগারসমূহের ক্যাটালগ, বুলেটিন ও বিবরণীসমূহঃ

Arnold, T.W. and J.V.S. Wilkinson. *A Catalogue of Indian Miniatures in the Library of A Chester Beatty*, London, n.p., 1936.

Art in Pakistan (An Exhibition Catalogue; no ed.) Karachi: Pakistan Publication, Government of Pakistan, n.d.

বাংলা গ্রন্থঃ

আলী তায়েশ, মুন্‌শী রহমান, *তাওয়ারিখে ঢাকা* (অনুবাদ ও সম্পা. এ এম এম শরফুদ্দীন), ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭

আলীম, এ কে এম আবদুল, *ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৬

_____, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৯

আলী, এ কে এম ইয়াকুব, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৩

আহমেদ, আবুজজোহানুর, *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজজীবন*, ঢাকা, ১৯৭৫

_____, *বাংলার ইতিহাস* (মোগল আমল), ১ম খণ্ড, রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২

আহমেদ, আশরাফউদ্দিন, *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস*, ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৩

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এণ্ড পাবলিশার্স, ২০০৬

ইসলাম, রফিকুল, *ঢাকার কথা*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২

ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো (১৭৫৭-১৮৫৭)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯

করিম, আবদুল, *মোগল রাজধানী ঢাকা* (অনুবাদ: মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

_____, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭)*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২

খান, করম আলি, *মোফাফ্ফরনামা* (ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ: আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া), ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫

খালেকুজ্জামান, মোঃ, *স্মৃতি-বিস্মৃতির লালবাগ*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০২

_____, *বিজন জনপদ থেকে রাজধানী ঢাকা*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০২

গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫

ঘোষ, নির্ম্মলকুমার, *ভারত শিল্প*, কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৩

ঘোষ, বিনয়, *বাদশাহী আমল* (ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত *Travels in the Mogul Empire: 1656-1668 A.D* অবলম্বনে), কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, *দরবারি শিল্পের স্বরূপ: মুঘল চিত্রকলা*, কলকাতা: থীমা, ১৯৯৯

চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*, কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪

চৌধুরী, সুশীল, *নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪

চন্দ্র, সতীশ, *মোগল দরবারে দল ও রাজনীতি* (১৭০৭-১৭৪০), কলকাতা: কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৭৮

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, *বাঙ্গালার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)*, কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন, *বাংলার ইতিহাস (নবাবী আমল)*, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৫

বরকতুল্লাহ, মোহম্মদ, *পারস্যপ্রতিভা*, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯৪

ভট্টাচার্য, অশোক, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪

মিত্র, অশোক, *ভারতের চিত্রকলা* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০

মণ্ডল, সুশীলা, *বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ* (১ম পর্ব), কলিকাতা: মন্দির প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকায় হারিয়ে যাওয়া ছবির খোঁজে*, ঢাকা: পার্ল পাবিলকেশন্স, ১৯৯৬

রফিক, রফিকুল ইসলাম, *যুগে যুগে ঢাকার ঈদমিছিল*, ঢাকা: রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৪

রহমান, মোঃ হাবিবুর, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩

রাহমান, হাকীম হাবীবুর, *ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে* (অনুবাদ: হাশেম সূফী), ঢাকা: ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৫

রহিম, মুহম্মদ আবদুল, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

রায়, অনিরুদ্ধ, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯

_____ , *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৫

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, কলকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

শরীফ, হাসান, *মোগল সাম্রাজ্যের খণ্ডচিত্র*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৫

শাহনাওয়াজ, এ কে এম, *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৪

_____ , *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ: মোগল পর্ব)*, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০২

শাহনাওয়াজ, এ কে এম এবং ইমরান মাসউদ, *মানচিত্রে বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১১

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, *মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪০০ বঙ্গাব্দ

হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৩

হাবিব, ইরফান, *মধ্যযুগের ভারত* (অনুবাদ: শৌভিক মুখোপাধ্যায়), নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১০

হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল, *মুসলিম চিত্রকলা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩

_____ , *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, ঢাকা: মজিদ পাবলিকেশন, ২০০৫

হোসেন, এ বি এম, *ইসলামী চিত্রকলা*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ২০০৪

হোসেন, নাজির, *কিংবদন্তির ঢাকা* (তৃতীয় সংস্করণ), ঢাকা: থ্রি-স্টার কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লি., ১৯৯৫

হায়াৎ, অনুপম, *পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১

বাংলা সম্পাদিত গ্রন্থ:

আউয়াল, ইফতিখার-উল (সম্পাদিত), *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন (প্রধান সম্পাদক), *ঢাকা কোষ*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২

_____, (প্রধান সম্পাদক), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল* (দ্বিতীয় খণ্ড: অর্থনীতি ও সংস্কৃতি), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (৩য় খণ্ড), ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩

মোহসীন, কে এম এবং আহমেদ, শরীফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *সাংস্কৃতিক ইতিহাস (বাংলাদেশ)*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

সেলিম, লাল রুখ (সম্পাদিত), *চারু ও কারুকলা*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

হাসান, পারভীন, "স্থাপত্য ও চিত্রকলা", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)* গ্রন্থে সংকলিত, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩

সাময়িকী: বাংলা প্রবন্ধ

আহমেদ, তোফায়েল, "ঢাকার কারুশিল্প", *অন্তর্ভুক্ত- ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, ইফতিখার-উল-আউয়াল সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, 'ঢাকা: একটি নগর গড়ে উঠার কাহিনী', *সুন্দরম*, ৩(৪), ১৯৮৯

আহসান, সাঈদ এ., শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩

খান, মুহাম্মদ সিদ্দিক, 'প্রাচীন ঢাকা নগরীর মুসলিম সমাজ', *মাহে নও*, ১৫(১২), ঢাকা, ১৯৬৪

চৌধুরী, আফসান, 'প্রাচীন ঢাকা', *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭৮

মজলিস, নাজমা খান, "মুঘল মিনিয়েচারে 'হাশিয়া' (১৫৫৬-১৬৫৮ খ্রি.)", মমতাজুর রহমান তরফদার ও অজয় রায় সম্পাদিত, *ইতিহাস* (ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা), দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ১৯৮৯

_____, "ঢাকার ঈদ ও মুহাররম মিছিল চিত্রকলার রূপরেখা", ওয়াকিল আহমদ ও সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সম্পাদিত, *ইতিহাস* (ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, চতুবিংশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা), ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ১৯৯১

দাশ, অশোক কুমার, 'আকবর বাদশার ফারসি মহাভারত রজমনামা', দেশ, শারদীয়, কলকাতা: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ/অক্টোবর ১৯৮৯

_____, হামজানামার কিস্‌সা, দেশ, কলকাতা: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভঃ

আলমগীর, মো., *বাংলার মুসলমানদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান*, (পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

সংবাদপত্রঃ

মাহমুদ, আদিত্য, আলিয়া মাদ্রাসায় শাহনামা, *প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০১১, ঢাকা।

স্মরণিকাঃ

সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬